দেবেশ রায়

উপন্যাস নিয়ে

উপন্যাস নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস নিয়ে

দেবেশ রায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

UPANYAS NIYE
A Treatise on Novels in Bengali
by DEBES RAY
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone 2241-2330/2219-7920 Fax (033) 2219-2041
e-mail deyspublishing@hotmail.com
www.deyspublishing.com
₹ 160.00

ISBN 978-81-295-2889-6

প্রথম প্রকাশ বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯১
দ্বিতীয় সংস্করণ কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৩
তৃতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৬

প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী

১৬০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা দিলীপ দে, লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্স
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শঙ্খ ঘোষ
শ্রদ্ধাস্পদেষু
তাঁর কবিতায় আকৈশোর আমৃত্যু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকের কিছু বই

উপন্যাস

মফস্বলি বৃত্তান্ত
তিস্তাপারের বৃত্তান্ত
সময় অসময়ের বৃত্তান্ত
আত্মীয় বৃত্তান্ত

শিল্পায়নের প্রতিবেদন
একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন
দাঙ্গার প্রতিবেদন
খরার প্রতিবেদন

তিস্তাপুরাণ
যযাতি
চেতাকে নিয়ে চীবর
মানুষ খুন করে কেন
আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে
জন্ম
লগন গান্ধার
স্বামী স্ত্রী
বেঁচে বততে থাকা
ইতিহাসের লোকজন

ছোটগল্প

দেবেশ রায়ের গল্পসমগ্র—৬ খণ্ড

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদি গদ্য
সময় সমকাল
উপন্যাস নিয়ে
শিল্পের প্রত্যহে
উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

কোনো একটি বইয়ের যুক্তি কাঠামো যে-ভাবে মনে আসে, সে-রকম করে এ বইটি গড়ে ওঠে নি। লেখাগুলি অনেক দিন ধরেই জমে উঠেছিল—লেখাগুলির মধ্যে সময়ের ব্যবধানও অসম। প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে-র ইচ্ছাপূরণ করতে গিয়ে লেখাগুলোর ভিতরকার ঐক্য আবিষ্কারের আনন্দ জুটল। সে আনন্দ পাঠক পর্যন্ত পৌঁছবে কীনা—দেবা ন জানন্তি।

উপন্যাসের তত্ত্ব নিয়ে কিছু ভাবনা কোনো কোনো লেখায় প্রকাশ করেছি। দু-একজন লেখক ও তাঁদের রচনা নিয়ে, কিছু কথা, কখনো-কখনো মন্তব্যও, আছে। সব মিলিয়ে যদি কোনো চিন্তার বিনিময়ের সুযোগ ঘটে যায় তা হলেই একমাত্র এমন বইয়ের কোনো প্রাসঙ্গিকতা।

প্রথম প্রবন্ধটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ১৯৮৮ সালের কল্যাণী সরকার বক্তৃতা হিশেবে দুই বৈঠকে পড়েছিলাম।

৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ দেবেশ রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম প্রকাশের বছর দশেক বাদে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ তৈরি করতে সঙ্গত সমস্যাই হয়েছে কিছু। সেটা একরকম করে মেটানো যেত, বইটি আর না ছেপে। আরো একরকম করে মেটানো যেত, যেমন ছিল তেমনি ছেপে। প্রথম উপায়টি হাতের নাগালে সম্পূর্ণত ছিল না কারণ আমার প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে-র অনেকটা অধিকারভুক্ত সে-উপায়। দ্বিতীয় সমাধান পছন্দ হচ্ছিল না—এই বিষয়গুলি নিয়ে বা এই সব কথাই আবার আর-এক প্রসঙ্গ ধরে উঠে পড়েছে এই বছর দশেকের পুরোটা জুড়েই। বছর কয়েকের ব্যবধানে আমার কথা, বলবার কথা, পালটেছে। আবার, এতটাই পালটায় নি যে পুরনো কথার সঙ্গে তার আর সম্পর্ক নেই। নতুন লেখাগুলো দিয়ে নতুন একটা বই করলে এই সম্পর্কটা ধরা যেত না। বা, হয়তো সবটাই পাঠকের ওপরই ছেড়ে দিতে হত। এখনো পাঠকের কাছেই ছাড়ছি—তবে আমার এই সব চিন্তার স্ববিরোধিতা, অসঙ্গতি, ও অবান্তরতা একেবারে প্রকাশ্য করে দিয়ে।

প্রথম সংস্করণে লেখাগুলি প্রকাশের সময় মেনে সাজানো ছিল না। এই সংস্করণেও থাকছে না। কিন্তু এই বইটি প্রথম বেরবার পর আমি এই সব কথা নিয়ে যে-নাড়াচাড়া করেই গেছি ও যাচ্ছি, সেগুলির ভিতর থেকে বেছে পাঁচটি নতুন লেখা এবার '২'-সংখ্যক গুচ্ছে থাকছে। তার ফলে গুচ্ছবিন্যাস একটু অগোছালো হয়ে গেল, হয়তো প্রেমচন্দ সম্পর্কিত লেখাটি '৩'-সংখ্যক গুচ্ছে গেলে মানাত বেশি বা বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যানতত্ত্ব নিয়ে লেখাটিকেও হয়তো আনা যেতে পারত প্রথম গুচ্ছে। প্রথম সংস্করণে লেখাগুলোর প্রথম প্রকাশের সময় দেয়া ছিল না। এবার সেটা দেয়া হল শুধু এইটুকু সান্ত্বনা পেতে যে নিজের কথার কাটান বা পুরনো-কাটান জোড়-দেয়া পাঠক যখন ধরে ফেলবেন, তখন তিনি ইচ্ছে করলে নজর করতেও পারেন, মাঝখানে কিছু সময় বয়ে গেছে। নিজেকে এদিক-ওদিক করে আসলে নিজের কথাটা নিজেই খুঁজছি। বাংলা উপন্যাসের ও গল্পের মাত্র কিছু-বেশি সোয়া শ বছরের ইতিহাস এত স্রোতস্বী, এত তরঙ্গশিখরচিহ্নিত, এত পতনসঙ্কুল, এত বাঁকচুরে দৃশ্য ও অদৃশ্য, আত্মবিস্মৃত, যে উপন্যাসের কোনো পাঠক যদি একটা ইতিহাসের আদল খোঁজেন, বাংলা উপন্যাসের ফর্মের ইতিহাসের আদল, তাহলে সম্ভবত তাঁকে নিজের পাকে নিজেই জড়িয়ে পড়তে হবে।

এমনটা হয়তো অন্য নানা ভাষাতেও ঘটে, ভারতের ভিতরের ও বাইরের অন্য নানা ভাষায়, নানা দেশে। আর বাংলা গল্প-উপন্যাসে আমরা তুলনায় অনেক বেশি নিমজ্জিত বলেই হয়তো বাংলা গল্প-উপন্যাসের ফর্মের ইতিহাসকে আমরা জটিল করে তুলি।

কথাটাকে উল্টে দিয়ে অবিশ্যি বলা যায়—আমরা যথেষ্ট জটিল করে তুলি না। ফলে গ্রহণ বর্জনের সরলতাই কখনো-বা আমাদের ইতিহাসের পাঠ হয়ে ওঠে। আমরা কেউ-কেউ কখনো-কখনো বর্জন করি। বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রত্যক্ষত মুসলমানদের বিরোধিতা করেছেন তাকে আমরা এমনকী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাও ভেবে নিই এই তথ্যটুকু এড়িয়ে যে 'আনন্দমঠ'-উদ্দীপিত বিপ্লবী আন্দোলনের ভিত্তি ছিল হিন্দু আচারপ্রধান ও সে-সংগ্রামের সংগঠনে মুসলমানদের কোনো জায়গা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকার সঙ্গে তাঁর ঔপন্যাসিক কীর্তিকে মিলিয়ে ঈপ্সিত জটিলতা আমাদের ব্যাখ্যানে তৈরি হয় না। বা, বাঙালি মননে ও সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে গ্রহণবর্জনের যে-সামাজিক মনস্তত্ত্ব ঐ গত একশ তিরিশ বছর ধরেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিয়াবান তার জড় ও জট হতে পারে জটিলতর এক ইতিহাস, এমন, যে সেখানে প্রশ্নগুলিমাত্র তৈরি হতে পারে, কোনো একমুখো উত্তর না মিলতেই পারে। এ কেমন এক ঔপন্যাসিক যাঁর প্রথম তিনটি উপন্যাসকে রোম্যান্স ও শেষ তিনটি উপন্যাসকে তত্ত্ব বলা হয় অথচ যাঁর রচনাসমগ্র ছাড়া আমরা আধুনিক বাঙালি-ভারতীয় জীবনও চিনে নিতে পারি না, প্রাগিংরেজ সমাজকেও বুঝে উঠতে পারি না? বা, যে-বাঙালি-ভারতীয় আত্মপরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কোনো নায়কে বা নায়িকায় খুঁজছিলেন, কখনো নবকুমারে, কখনো নগেন্দ্রনাথে, প্রতাপে, কখনো প্রফুল্লে, কখনো শ্রী-তে, কখনো-বা সত্যানন্দে ও এমনকী কমলাকান্তে, সেই আত্মপরিচয় অর্জনের অভিযানই হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা-ঘরে বাইরে-চতুরঙ্গ'-এর উপন্যাসপ্রকল্পের সংগঠন। বাংলায় উপন্যাস রচনার মৌলিক আবেগ ও তাড়না সব সময়ই মথিত, সেই ইতিহাস আবিষ্কারে, বঙ্কিমচন্দ্র যাকে বলেছিলেন, 'আত্মার ইতিহাস'। আবার সেই ইতিহাসের ভার বইবার ক্লান্তি থেকে, ভুল পাঠ থেকেও, হাঁফ ছাড়তেও-বা, বাংলা উপন্যাস পরিত্রাণ খুঁজেছে একই সঙ্গে বিলিতি প্রেমের গল্পে, ও বাঙালির পারিবারিক গল্পে। আবার এক পাল্টা ঘূর্ণিতে তিরিশের দশকে সেই প্রেমকাহিনী বা অপ্রেমকাহিনী আত্মার ইতিহাসের অংশ হয়ে ওঠে।

এই বইয়ে সেই ইতিহাসের ভিতরই ঢোকার নানা চেষ্টা ঘটেছে, সেই ইতিহাসের ভিতরে ঢোকার নানারকম ফাঁকফোকর খুঁজে। ফলে, নিশ্চয়ই পুনরুক্তি ছড়িয়ে আছে। আরো এই কারণে যে প্রত্যেকটি লেখাই লেখা হয়েছে আলাদা-লেখা হিশেবে ও তখন এই রকম একটি বই কল্পনাতেও ছিল না। দ্বিতীয় এই সংস্করণে এতগুলো নতুন লেখা যোগ করায় সেই পুনরুক্তি দোষ নিশ্চয়ই আরো বেশিই ঘটল। কিন্তু সেই পুনরুক্তিকে একরকম স্বগতোক্তিও ভাবা চলে। স্বগতোক্তিতে কোনো পুনরাবৃত্তি দোষ লাগে না। অথবা পুনরাবৃত্ত না হলে শেষ পর্যন্ত স্বগতোক্তি, স্বয়ম্ভর স্বগতোক্তি হয়ে ওঠে না। এই বইয়ের বিভিন্ন লেখায় আমরা বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসের ভিতর যে ঢুকে পড়েছি তার কারণ, আমরা বাংলা গল্প-উপন্যাসের আধুনিক চেষ্টা কী হতে পারে তার হদিশ পেতে খুঁজতে চেয়েছি এর অতীতকে। কোনো নির্বিকল্প অতীতকে নয়, বহুবিকল্পময় অতীতকে। আমাদের বর্তমানের সঙ্গতিপূর্ণ কোনো অতীতকে। সেই হদিশেই বাংলা ভাষার চৌহদ্দির বাইরে গিয়ে দুটো-তিনটে লেখা এই বইয়ে আছে। তাতে আমাদের লক্ষ ছিল—প্রেমচন্দের কিছু গল্প পড়া, বিভূতিভূষণের কথনভঙ্গির সঙ্গে প্রেমচন্দের কথনভঙ্গির অদ্ভুত সব মিলে—এঁরা দুজন পরস্পরকে না জেনেও এক সময়েই লিখছিলেন দুই ভাষায়। বাংলা ভাষার গল্প-উপন্যাসের একটা ভাষানিরপেক্ষ ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত আছে আর সে-পরিপ্রেক্ষিত বদলেও যায় অনেক সময়ই। বাংলা লেখালেখির আলোচনায় সে-প্রসঙ্গ খুব একটা আসে না। বরং বিদেশী প্রসঙ্গ কিছু বেশি আসে। সেটাও যে খুবই জরুরি কথা ও বিদেশ বলতে আমাদের ধারণাকে পৃথিবীর বিস্তারের সমতুল্য করে তোলাটাও যে জরুরি—তেমন একটা তাড়না থেকেই একটি লেখায় কিছু বিদেশী গল্প-উপন্যাসের কথা এসেছে। যদিও বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসঘটিতই হোক আর দুনিয়ার গল্প-উপন্যাসচর্চার বর্তমানঘটিতই হোক—এ লেখাগুলির শিকড়ে আছে বাংলায় গল্প-উপন্যাস লেখার মৃত্তিকাভেদী কোনো টান। সেই কথাটি হয়তো কোথাও স্পষ্ট করে বলা হয় নি। না-বলে বলবার কথা কিন্তু ছিল সেটাই। কেউ যদি তাত্ত্বিক বা তাথ্যিক সঙ্গতি ও সম্পূর্ণতা প্রত্যাশা করেন এমন একটা বইয়ে, তাহলে তাঁর কাছে ধরা পড়ে যাবে শুধু চিন্তাভাবনার অসঙ্গতি আর তথ্যের অসম্পূর্ণতা।

নববর্ষ, ১৪০৮

দেবেশ রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

১

বাংলা উপন্যাস ১৩
উপন্যাসের নন্দন ৪২
শিল্পের জনসংযোগ ৫৩

২

পুরাণ থেকে পুরাণ ৬৩
আত্মার ইতিহাস ৯৫
লুপ্ত দেশ, গোপন গল্প ১১৫
পুরাণ ভেঙে পুরাণ ১২৪
ছোঁয়া, শোঁকা, স্বাদ, শ্বাস ১৩৭

৩

বিপরীতের বাস্তব রবীন্দ্রনাথের গল্প ১৫৭
রূপান্তরের ভাবনা রবীন্দ্রনাথ ১৬৮
পর্বান্তরের সেতু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৬

৪

কথোপকথন ১৯১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা উপন্যাস

গত শতকে ইংরেজপ্রশ্রয়ে আমাদের যে-আধুনিকতার জন্ম—সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই মাত্র তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছরের ব্যবধানে তার দু-দুটো আরম্ভক্ষণ চিহ্নিত করা যায়। এই সময়ের ব্যবধানে আমরা ঈশ্বর গুপ্ত ও মাইকেলকে নতুন বাংলা কবিতার দুটো আরম্ভক্ষণ বলে চিনে নিতে পারি, আরো কম সময়ের ব্যবধানে 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) ও 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)-তে কাহিনীগদ্যের দুই আরম্ভক্ষণ।

ভাষার যে-ভঙ্গি গুপ্তকবির শৈলী হয়ে উঠেছিল তাতে তাঁর পক্ষে চেষ্টা করেও পুরনো কবিতা লেখা সম্ভব হচ্ছিল না। এমনকী তাঁর নীতিবিষয়ের কবিতাতেও ঢুকে যাচ্ছিল তাঁর শ্লেষ আর ব্যঙ্গের ভাষা। শঠ লোক একমাত্র ঘুমিয়ে পড়লেই লোকের উপকার, এ-কথা বলতে গিয়ে তাঁকে লিখতে হয় 'মিছে আঁখি মুদে থাকে ঘুম যায় চড়ে। ছটফট করে রেতে বিছানায় পড়ে।' আমরা এ-রকম যদি শিরোনাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেই, তাঁর অনেক কবিতার অনেক চরণকেই মনে হবে বেশ স্বাধীন কবিতা—তাঁর কবিতায় কবিতা হয়ে ওঠার জন্যে তাঁর মন্তব্য এমনি প্রয়োজনীয় ছিল। শিখযুদ্ধে, মারাঠাযুদ্ধে ইংরেজদের বীরত্ব ব্যাখ্যানেও সেই মন্তব্য আমরা শুনি আবার বাঙালিদের শাহেব হয়ে ওঠার বিবরণেও আমাদের কান তৈরি থাকে সেই মন্তব্যের জন্যেই।

সাহিত্যের ইতিহাসে যা যা দিয়ে নতুন পর্বের সূচনা চিহ্নিত করা হয়, তার সবই তো ঈশ্বরগুপ্তে ছিল। নতুন শৈলী, নতুন বিষয়, নতুন পাঠক। আর নতুন কবিগোষ্ঠী। যেন, গুপ্তকবির এই আধুনিকতাই সেই সময় হয়ে উঠেছিল বাংলা কবিতার পক্ষে অবলম্বনীয় একটিমাত্র ধরণ। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮), 'কর্মদেবী' (১৮৬২)—গুপ্তকবির আধুনিকতারই সম্প্রসারণ। অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে গুপ্তকাব্যীয় কাব্যচর্চার যে-বেশ লম্বা তালিকা দিয়েছেন তাতে আমরা এখন হয়তো দেখতে পাব যে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হওয়ার পরও গুপ্তকবীয় ধরণটা অনেক দিন পর্যন্তই ছিল অনেক কবিরই কাব্যচর্চার মডেল, তবু তো এ-কথা সত্য যে ১৮৫৯-এ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'টিকে যদি নাও ধরি, ১৮৬২-তে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ আমরা কাব্যের আধুনিকতার আর-এক আরম্ভ পাই। গুপ্তকবির কবিতা আর মাইকেলের কবিতা একই আধুনিকতার স্তরান্তর নয়। হয়তো একই আধুনিকতার দুই বিপরীত টান—আর, হয়তো এই টানের বৈপরীত্যেই বাংলা কবিতার আধুনিকতা বুনে উঠল। বা, হয়তো তাও নয়, এ ছিল সম্পূর্ণই এক নতুন আরম্ভ। গুপ্তকবি যাকে কবিতা ভাবতেন মাইকেল তাকে কবিতা ভাবতেন না, আর মাইকেল যাকে কবিতা ভাবতেন গুপ্তকবির পক্ষে তা কল্পনা করাও অসাধ্য ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬১-৬২)-কে আমরা এখন তো উপন্যাসই বলতে পারি কারণ এই দুটি রচনায় লেখক একটা গদ্যবিবরণ দিয়েছেন আর সে-বিবরণের ভিতরে আখ্যানের অসঙ্গতি নেই। কিন্তু এই দুটি লেখাকে আমরা কাহিনীগদ্যের এক আরম্ভ না ধরে পরিণতিও ধরতে পারি। সেই 'সমাচার দর্পণ' থেকেই বাংলা কাগজে এই ধরণের কাহিনীগদ্য লেখা হয়ে আসছিল যাকে অনেক সময় সাহিত্যের ইতিহাসে নকশাজাতীয় কৌতুক রচনা বলে বর্ণনা দেয়া হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড থেকেই দর্পণের প্রথম কয়েক বছরে কাহিনীগদ্যের এই হদিশ দেয়া যায়। ১৮২১-এর ২১ ফেব্রুয়ারি ও ৯ জুন 'বাবুর উপাখ্যান', ২৬ মে 'চৈতন্যমঙ্গল গান শ্রবণের ফল অতি সুমধুর কথা', ২৩ জুন 'শৌকীন বাবু', ৩০ জুন 'বৃদ্ধের বিবাহ'। এই কাহিনীগদ্যের ধরণটি এতই গ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল যে চিঠিপত্রেও এ-রকম লেখা আসত ও কাগজে বেরত। ১৮২১-এর ৭ জুলাই, ১ সেপ্টেম্বর, ১৮২২-এর ২ মার্চ, ১৮২৫-এর ৫ মার্চ প্রকাশিত এমন কিছু লেখা 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'-র প্রথমখণ্ডে সংকলিত হয়েছে। এই প্রত্যেকটি কাহিনী গদ্যই একটা গদ্যবিবরণ—বেশির ভাগ সময়ই শ্লেষব্যঙ্গে ভরা। কিন্তু কাহিনী লিখে বিবরণ দেয়ার এই রীতি এমনই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল যে ১৮৪২-এ 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এ তিন সংখ্যা জুড়ে মিয়া জান নামে এক গরিব কৃষকের ওপর অত্যাচারের কাহিনীও লেখা হয়েছিল এ-রকম গদ্যবিবরণেই। তখনকার কাগজেপত্রে খবর জানাবার ভাষার সঙ্গে এই গদ্যবিবরণের ভাষার পার্থক্য খুব স্পষ্ট। শুধু কাহিনীর একটা আভাসে মাত্র নয়, এই গদ্যবিবরণে কী বিবরণ দেয়া হচ্ছে তার নির্বাচন-উপস্থাপনে লেখক প্রবলভাবে উপস্থিত। তেমনি লেখক উপস্থিত থেকেই বিবরণ দিয়েছেন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' ও 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ। এই ধরণের বিবরণের অভ্যাস গড়ে উঠেছিল প্রায় চল্লিশ বছর ধরে, লেখার অভ্যাসও তৈরি হয়েছে এই সময় জুড়ে অথচ যখন সেই গদ্য-বিবরণে একটি আখ্যান বেশ সম্পূর্ণ ও বড় আকারে উপন্যাস বা গল্প হয়ে উঠতে শুরু করল হুতোমে ও আলালে, তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) প্রথম লাইনের অশ্বারোহীর পদাঘাতে এই ধরণের গদ্যকাহিনীর সেই নানা চেষ্টা অবান্তর উপকরণের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল উপন্যাসের ইতিহাসেরও প্রায় বাইরে। 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' আর 'দুর্গেশনন্দিনী' এক আধুনিকতার স্তরান্তর নয়। হয়তো, একই আধুনিকতার দুই বিপরীত টান। কিন্তু এ-কথা অন্তত উপন্যাসের বেলায় বলা যাবে না যে সেই টানের বৈপরীত্যেই বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতা বোনা হয়েছে। গদ্যকাহিনীর আলালি আর হুতোমি ঢং বাংলা উপন্যাসের ফর্মের উপকরণ হিশেবে পরের সোয়া শ বছরে গৃহীত হয় নি। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে হয়তো ছিল উপন্যাসের সম্পূর্ণ নতুন আর-এক আরম্ভ। উপন্যাসের পরবর্তী বিকাশ 'দুর্গেশনন্দিনী'র আরম্ভটাকেই প্রামাণিক করে তুলেছে। প্যারীচাঁদ বা হুতোম যাকে গদ্যবিবরণ ভাবতেন বঙ্কিমচন্দ্র তাকে বড় জোর একটা ভঙ্গিমাত্র ভেবেছিলেন আর বঙ্কিম যাকে উপন্যাস ভাবতেন প্যারীচাঁদ বা হুতোমের পক্ষে তা কল্পনা করাও অসাধ্য ছিল।

শিল্পসাহিত্য শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিরই সৃষ্টি। ব্যক্তিপ্রতিভাই সেখানে অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা দেখায়, অসম্ভবকে সম্ভব করে, মানুষের সৃষ্টিক্ষমতার অপরিমেয়তা বারবার প্রমাণ করে। প্রতিভার এই সৃষ্টিক্ষমতার অনেকটাই অজ্ঞাত, আরো অনেকটা বোধহয় অজ্ঞেয়। কিন্তু মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার সেই ব্যক্তিগতটুকু মেনে নিলেই তো আর আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই প্রশ্নের জবাব মিলবে না যে কেন বাংলা কবিতায় ও উপন্যাসে এই এমন দুই আরম্ভবিন্দু—যে-দুই বিন্দুর মধ্যে কোনো সংযোগরেখা টানা সম্ভব নয়, কেন এমন দুই আরম্ভ যে-দুই আরম্ভের মধ্যে কোনো কার্যকারণও আরোপ করা যায় না?

হয়তো এই কথাটিতে কেউ-কেউ মনে-মনে আপত্তি করবেন। সমগ্রতার একটা ধারণা দিয়ে আমরা ইতিহাসকে বুঝতে চাই, সেই ধারাবাহিকতার বোধের সঙ্গে নিজেদের আজকের বর্তমানকে গ্রথিত করতে চাই। সেটাই আমাদের দুর্মর সংস্কার। ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা জৈবিক। সেই জৈব-সংগঠনে কোনো শূন্যতাকে আমরা প্রশ্রয় দিতে চাই না বা এমন কোনো ফাঁকের সামনে দাঁড়াতে চাই না যার ওপর দিয়ে কল্পনাতেও সেতুবন্ধন সম্ভব নয়।

সেই কারণেই আমাদের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাকে ধ্বংস করে দিয়ে সম্পূর্ণ বিদেশী একটি ইতিহাসের কার্যকারণের শৃঙ্খলা সেই ধারাবাহিকতার ওপর অস্ত্রের জোরে চাপিয়ে দেয়া হলে আমরা তাকেও সাহিত্যের ইতিহাসে ও অন্যান্য ইতিহাসে আমাদের নিজস্ব সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যকারণের সঙ্গেই মানিয়ে নেই। যেন-বা ইংরেজের ভারতজয়টাও ঘটেছে সেই মহেঞ্জদড়ীয় ও আর্য বৌদ্ধ মৌর্য ভারতের ইতিহাসেরই নিজস্ব গতিতত্ত্বে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চৈতন্য-উদ্দীপিত বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসের পর ইংরেজ প্ররোচিত সাহিত্যের নানা ধরণের ইতিহাসের মধ্যে যেন কোনো বিচ্ছেদ নেই ; যেন চৈতন্য যে-মানবীয় সাহিত্যের বাস্তব অবলম্বন তাই বিকশিত হয়ে উঠল উনিশ শতকে কবিতা, নাটক, উপন্যাসের নানা নতুনত্বে। ইতিহাসের ভিতর ধারাবাহিকতা আবিষ্কারের ঝোঁকে আমরা এ-কথা ভুলে যেতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে যত বিদেশী শক্তি সামরিক দাপটে এসেছে সেগুলির অব্যবহিত সাংস্কৃতিক উপাদান ভারতীয় উপাদানে পরিণত হয়েছে কয়েক শ বছর ধরে আত্তীকরণের এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে তার হয়তো কিছুটা তুলনা চলে। কিন্তু ইংরেজের কাছে সংস্কৃতি কোনো আলাদা উপকরণ ছিল না। ইংরেজের সংস্কৃতি ছিল তার সাম্রাজ্যনীতিরই অপরিহার্য অংশ আর সে-কারণেই ইংরেজের পক্ষে সম্ভব ছিল না শতাব্দীব্যাপী গর্ভাধান। ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর ইংরেজ সংস্কৃতির সেই আরোপকে তুলনা করা যায় ধর্ষণের সঙ্গেই মাত্র—সে-ধর্ষণের ফলেও গর্ভাধান হতে পারে বটে কিন্তু সে ভ্রূণ মানবিক শারীরিক নিয়মেই কেবল বড় হয়ে ওঠে না, শরীরের বিকারের নিয়মেও বেড়ে ওঠে।

তাই ঈশ্বরগুপ্ত আর মাইকেল, প্যারীচাঁদ আর বঙ্কিমচন্দ্র নতুন কবিতার বা নতুন উপন্যাসের দুই বিচ্ছিন্ন আরম্ভবিন্দু এ-কথা মেনে নিতে মনে-মনে আপত্তি উঠতে পারে। বিষ্ণু দে আমাদের তেমনই এক কবি, পরাধীনতার ফলে আমাদের ইতিহাসের কার্যকারণের বিপর্যয় সম্পর্কে যিনি ছিলেন নিয়তজাগর। কিন্তু তিনিও আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে ধারাবাহিকতাই খুঁজতে চেয়েছেন, আমাদের সাহিত্যে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্র আত্মপ্রক্ষেপকে ভেবেছেন অখণ্ডক বিভেদক নয়। তাই ঈশ্বর গুপ্ত আর মাইকেলের অন্তর্সম্পর্ক খুঁজতে গিয়ে তিনিও বলেছিলেন, 'আমরা কবিত্ব বলতে যা বুঝি, রোমান্টিক কাব্যের সে-সংজ্ঞা গুপ্তকাব্যে প্রযোজ্য না হলেও তার নিজস্ব মর্যাদা আছে। অনেকেরই ধারণা যে এ মেজাজ বা মননরীতিতে মহৎকাব্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। কিন্তু সামাজিক পরিবেশে এ প্রাকৃত মনোবৃত্তিও যে রোমান্টিক আবেগে দানা বাঁধতে পারে, তার প্রমাণ ইংরেজি কাব্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চসর এবং আরো মহৎ প্রমাণ দাস্তে।' ...'দেশজরীতি বা কনভেনশনেই তাঁর [ঈশ্বর গুপ্তের] কবিত্বের শক্তি...সে রীতির লৌকিক স্বভাব এবং রোমান্টিক জ্ঞান-গরিমার সমন্বয় তাঁর আয়ত্তে ছিল না।' '...মাইকেলের প্রচণ্ড প্রতিভা এ সমন্বয় প্রায় সম্ভব করে তুলেছিল।' (ঈশ্বর গুপ্ত, 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ')

যেন আমাদের একজন চসর বা একজন দান্তে ছিলেন না বলে একজন ঈশ্বর গুপ্তে ও একজন মাইকেলে ঐ বাংলা সাহিত্যের উনিশ শতকি আধুনিকতা কবিতায় আলাদা-আলাদা ভাবে একই কাজ করেছে। যেন আমাদের একজন সারভেন্তেস বা একজন স্কট ছিলেন না বলে প্যারীচাঁদ-হুতোমে আর বঙ্কিমচন্দ্রে ঐ বাংলা সাহিত্যের উনিশ শতকি আধুনিকতা কাহিনীগদ্যে আলাদা-আলাদা ভাবে একই কাজ করেছে।

কিন্তু যদি আমরা ঐ ইংরেজ-আরোপিত আধুনিকতাকে অখণ্ডক না ভাবি, যদি ধরে নিই ঐ আধুনিকতা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে ধ্বস্ত করেছে আর তার ফলে বিশেষত উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ-ষাট বছরে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে কতকগুলি অনুত্তীর্য গভীর খাদ তৈরি হয়ে গেছে তা হলে সেই নানা ধরণের পরিণতিহীন আরম্ভের ভিতর আমরা হয়তো আমাদের সৃষ্টিশীলতার ভিন্ন এক অসম্পূর্ণতা নতুন করে চিনে নিতে পারব।

গুপ্তকবির কবিতা অনেক বেশি লোক পড়ত, অনেক দিন পর্যন্ত তা অনুকরণ করা হত। মাইকেলের কবিতা খুব বেশি লোকের পক্ষে তখন পড়া সম্ভবই ছিল না আর তা অনুকরণের ব্যর্থতা ভয়াবহ। প্যারীচাঁদ-হুতোমের রচনাও অনেক বেশি পড়া হত, অনেক আগে থেকে ও-রকম সব লেখা চলে আসছিল, পরেও লেখা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসও খুব বেশি লোকের পক্ষে তখন পড়া সম্ভবই ছিল না আর তার অনুকরণের নজির হয়ে আছেন দামোদর মুখোপাধ্যায়—তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী'র উপসংহার 'নবাবনন্দিনী বা আয়েষা' ও 'কপালকুণ্ডলা'-র উপসংহার 'মৃন্ময়ী'-র জনপ্রিয়তা মূল বইয়ের চাইতেও বেশি ছিল বলে অনুমান হয় (সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.২৫৩)। কিন্তু মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র তবুও বাংলা আধুনিক কবিতার ও উপন্যাসের প্রথম পুরুষ।

এর প্রধানতম কারণ নিশ্চয়ই মাইকেল ও বঙ্কিমের রোমান্টিকতা। কিন্তু সেই রোমান্টিকতাকেই বাংলা কাব্য ও উপন্যাসের আধুনিকতা বলে মেনে নেয়ার প্রক্রিয়ায় বর্জন করতে হয়েছে গুপ্তকবির ও প্যারীচাঁদ-হুতোমের রোমান্টিকতাহীন শ্লেষ ও ব্যঙ্গ। সেই রোমান্টিকতাহীন শ্লেষ ও ব্যঙ্গে একটা নিখাদ স্বদেশী বাঙালি প্রতিক্রিয়াই তাঁরা জানাচ্ছিলেন। গুপ্তকবির পদ্যে কোন বিবরণ লেখা হচ্ছিল আর লেখা হচ্ছিল কোন ভাষায়? তিনি যে ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে বাংলা পদ্যের চরণ তৈরি করছিলেন তাতে তো কলকাতার বাঙালি মধ্যবিত্তের এক গোপন আত্মজীবনী পড়া যেতে পারত। এই আত্মবিবরণই ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রাহ্য করে তুলেছিল আবার এই আত্মবিবরণের ভারই ঈশ্বরচন্দ্রের দায় হয়ে উঠেছিল। রোমান্টিকতার অলঙ্কারহীন এ-কবিতা আসলে ছিল গদ্যবিবরণেরই বিকল্পমাত্র, তাই এ-বিবরণে বাঙালি পাঠকের নিজের কাছ থেকে কোনো পরিত্রাণ ছিল না। সদ্য ইংরেজি-শিক্ষিত যে-বাঙালি ঈশ্বরচন্দ্রর বিষয়, যে-বাঙালির মুখের ভাষা ঈশ্বরচন্দ্রের পদ্যের অবলম্বন সে-বাঙালি কোম্পানির চার্টারের সংশোধনের ফলে সরকারে নানা চাকরির সুবিধে সবে পেতে শুরু করেছে। 'এ-বি পড়া ছেলে' তত দিনে লায়েক—সে আর ঈশ্বরগুপ্তের ঠাট্টার বিষয় হয়ে থাকতে চায় না। তাই গুপ্তকবিতে যে-আধুনিকতার সূত্রপাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-আধুনিকতার বিবরণটিই বাঙালি সমাজের কাছে অগ্রহণীয় হয়ে পড়ে। সে-বিবরণের ভাষা থেকে বাঙালি সমাজ দ্রুততম বেগে সরে আসছিল। গুপ্তকবির বিবরণের প্রধান ভঙ্গি ছিল 'প্যারডি'। সেই 'প্যারডি'তে বহু স্বরের বিকৃত নকল নাটকীয় ভাবে শোনা যাচ্ছিল। 'মম সুখোদয় হবে গো উদয় যে দিনে জননী জানি সমুদয়' এমন বাউল গানের সুর ঈশ্বরগুপ্তে হয়ে ওঠে,

'ঐ কল্ রামী, ধোপা শামী, হাসতেছে কেমন্
এক বাপের পেটেতে এরা জন্মেছে ক-জন।'

বা হাপু গানের ঢঙে লেখা

'ও কথা আর বোলো না, আর বোলো না, বলছো
বঁধু কিসের ঝোঁকে।'

কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের 'প্যারডি' শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠিত সুরের অনুকরণে নতুন লাইন লেখা নয়—তাঁর সমস্ত কবিতাতে এই 'প্যারডি'র আধারেই বিবরণ লেখা হয়ে যাচ্ছিল। অথচ এই 'প্যারডি'ই তখন অতি দ্রুত কলকাতার বাঙালি সমাজের বাস্তবতা হয়ে উঠেছে। 'প্যারডি'ই যখন বাস্তবতা হয়, তখন সে-'প্যারডি' আর সে-সমাজ গ্রহণ করে না। গুপ্তকবির আধুনিকতার 'প্যারডি'ই তখন বাস্তবতা বা 'রিয়ালিজম' হয়ে উঠছে। তখন সে-'রিয়ালিজম' বা বাস্তবতার কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে পরাবাস্তবের এক বিবরণ। সে-বিবরণের নাটকীয় উচ্ছ্বাসে সেই বাস্তবতা এক নাটকীয়, বা এমনকী ট্র্যাজিক পটভূমিতে স্থাপিত হতে পারে। সে বিবরণের লিরিক উৎসারে সেই বাস্তবতা অশ্রুধারায় স্নাত হতে পারে। এই আকাঙ্ক্ষায় গুপ্তকবির প্যারডির বাঙালি, তার অতি সংক্ষিপ্ত এক 'এপিক' ভূমিকার সন্নিহিত হয়ে পড়ে। মাইকেলের মত পরাক্রান্ত কবি সেই ছদ্ম এপিকের আধুনিক মর্যাদা বাঙালিকে দিতে পারলেন। নেহাত কবিত্বশক্তির প্রাবল্যে 'মেঘনাদবধ কাব্য' পরাধীনতার ট্র্যাজিক আর লিরিক হয়ে উঠতে পারে প্রায় এক দৈবী সংগঠনে। আর সেই সংগঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় টেকনিক আয়ত্ত করার সমুদ্রমন্থনতুল্য লড়াইয়ে বাংলা কবিতারও মুক্তি ঘটে যায়। কিন্তু কবিত্বের সেই পরিণতি প্রাপ্তির সঙ্গে যখন আজ তুলনা করে দেখি কাব্যটি লিখতে-লিখতে বন্ধুবান্ধবের কাছে লেখা মধুসূদনের চিঠিগুলি, সেগুলি যেন কাব্যরচনাকালের দৈনন্দিন ডায়রিই প্রায়, তখন কেমন বিহ্বল বোধ হয় যে কবি কেন একটি চিঠিও বাংলাতে লেখেন না, ইন্দ্রজিতের হত্যা ঘটানোর পর তাঁর চোখের জলের বিবরণও তিনি দেন ইংরেজিতে আর তাঁর কবিত্বকল্পনার পরম মুহূর্তগুলির সাক্ষ্যও থাকে ইংরেজিতেই, যেন, বাংলায় 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনাটিই এক বিদেশী কর্মসূচি আর তাই সেই কর্মসূচির বিবরণ কবিকে জানাতে হচ্ছে তাঁর মাতৃভাষা ইংরেজিতে। সেখানেও অনেকবারই তিনি তাঁর কাব্যের পাশ্চাত্য আদর্শের কথা বন্ধুদের বোঝান, অনেকবারই সেই আদর্শের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংস্কৃত সাহিত্যে আছে বলে তিনি ভরসা দেন ('I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry'), আশ্বস্ত করেন যে তিনি হিন্দুবিরোধী হবেন না ('You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the poem')।

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও কবি হিশেবে তিনি চান 'try to write as a Greek would have done !' —মধুসূদন বাংলা আধুনিকতার সেই প্রয়োজনীয় গ্রিক, অথবা ইংরেজের ভূমিকায়, নিজেকে দেখেন। ভারতীয় সংস্কৃত কবিতা তাঁকে বিষয় দেবে কিন্তু তিনি লিখবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশীর মত। আর সেই অভারতীয়তার জন্যেই তিনি আমাদের প্রথম আধুনিক কবি।

প্রায় একই পর্যায়ক্রম ঘটে আলাল-হুতোম আর বঙ্কিমচন্দ্রে। আলালে কলকাতার বাস্তবতা যে-শুধু বর্ণনায় নথিভুক্ত হয়েছে তাই নয়, এমনকী চরিত্রদের সংলাপেরও সেই প্রামাণিকতা লেখক যে রাখতে পেরেছিলেন, তার কারণ, উপন্যাসটির গদ্যবিবরণে লেখকের নিজের ভূমিকা ছিল স্পষ্ট। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ বক্তা বা বিবরণকার হিশেবে লেখকের কোনো আড়াল নেই। একেই মিখাইল বাখতিন তাঁর 'ডায়ালজিক ইমাজিনেশন'-এ উপন্যাসের বিবরণ বলেছেন। লেখকের উপস্থিতি এমন প্রত্যক্ষ হওয়ায় আমরা 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ বহু স্বরশুনতে পাই। কারণ লেখক এখানে তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে তাঁর বিবরণ তৈরি করছেন বহু চরিত্রের এই স্বরের অভিঘাতগুলো দিয়েই। যেমন, আমরা কারো কাছে কোনো একটা ঘটনার বর্ণনা দেয়ার সময় সেই ঘটনার সূত্রে আসা নানা চরিত্রের কথার সুর, ভঙ্গি, ভাষা প্রায় নকল করে দেখাই অথচ সেই আপাত যথাযথ নকলের মধ্যেই শ্রোতা বক্তার কণ্ঠস্বরেই বুঝতে পারেন বক্তা কোন চরিত্র সম্পর্কে কোন মনোভাব প্রকাশ করতে চান, তেমনি একটি উপন্যাসে ঔপন্যাসিক স্বয়ং যখন নানা ঘটনার বর্ণনা দিয়ে যান, তখন সেই বর্ণনায় সেই চরিত্র ও ঘটনাগুলির আপাত-যথাযথ বর্ণনা থেকেই পাঠক বুঝে নিতে পারেন ঔপন্যাসিক কোন বিবরণটি তৈরি করে তুলছেন। এটাই উপন্যাসের বহুস্বর-বিবরণ (Polyphonic discourse)। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ এই বহুস্বর-বিবরণের বেগেই এমনকী প্রামাণিক কথ্যভাষা পর্যন্ত সংলাপে চলে আসতে পেরেছে।

> ঠকচাচী মোড়ার উপর বসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি হররোজ এখানে-ওখানে ফিরে বেড়াও—তাতে মোর আর লেড়কাবালার কী ফয়দা? ...রোপেয়া-কড়ি কিছুই দেখি না...
> ঠকচাচা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আমি যে কোশেস করি তা কী বলব, মোর কেতনা ফিকির, কেতনা পেঁচ...শিকার দস্তে এল-এল হয়, আবার পেলিয়ে যায়।
>
> অথবা
>
> বৈদ্যবাটীর বাজারের পশ্চিমে কয়েক ঘর নাপিত বাস করিত। তাহাদিগের মধ্যে একজন বৃষ্টির জন্যে আপন দাওয়াতে বসিয়া আছে। ...তাহার স্ত্রী কোলের ছেলেটি আনিয়া বলিল,...
> ছেলেটাকে একবার কাঁকে কর, এদিকে বাসন মাজা হয় নি, ওদিকে ঘর নিকন হয় নি, তারপর রাঁদা-বাড়া আছে—আমি একলা মেয়ে-মানুষ...আমার কি চাট্টে হাত, চাট্টে পা?

এই উদাহরণগুলি শুধু এইটুকু মনে আনার জন্যেই দেয়া যে প্যারীচাঁদ তাঁর গদ্যবিবরণের বহুস্বর সংগ্রহ করেছিলেন সমাজের কোন আনুভূমিক বিস্তার থেকে আর সেই গদ্যবিবরণের জন্যে তিনি তখনো অসংগঠিত ভাষাকে কতটা সংগঠিত করতে পেরেছিলেন যাতে ঠকচাচীর আধা-উর্দু আধা-বাংলা বুলি আর নাপতেনির পুরোপুরি বাংলা লব্জ তাঁর উপন্যাসে এমন অনায়াসে মিশে যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু যে-ঠকচাচা, এটর্নি বাটলার, বাঞ্ছারাম মাস্টার, বক্রেশ্বরবাবুকে নিয়ে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ প্যারীচাঁদের গদ্যবিবরণ তৈরি হয়ে উঠছিল তাদের ওপর ভিত্তি করেই কলকাতা ও শহুরে বাঙলির অন্য দুলালরা নিজেদের জন্যে অন্য এক আত্মজীবনী রচনায় তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সে-আত্মজীবনীতে বঙ্গসন্তান ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী। তখনকার কাগজপত্রে বাঙালিদের সরকারি, বিশেষত 'কভেনেন্টেড', পদে নিয়োগের বাধা দূর করে দেয়ার জন্যে অনবরত লেখা বেরচ্ছে। কোম্পানির চার্টারের সংশোধনের ফলে পঞ্চাশের দশকেই সরকারি চাকরিতে শিক্ষিত বাঙালির প্রবেশ কিছুটা অবারিত হয়েছে। বাঙালি যুবক তখন ঠকচাচা বা বাঞ্ছারামের সমাজে নিজেকে আটকে রাখতে পারছে না। ভিক্টোরিয়ার শাসনে সে প্রায় ইংরেজ প্রজার সমতুল্যতা দাবি তুলতে শুরু করেছে। তখনকার কাগজপত্র দেখলে এখন বোঝা যায় সেই অবুঝ আব্দার—কেন ভিক্টোরিয়া বাঙালিকে ইংরেজপ্রজার মতনই মনে করছেন না ; সিপাহি বিদ্রোহে তো কলকাতার বাঙালি তাদের রাজানুগত্যের নির্দ্বিধ প্রমাণ দিয়েছে।

যে-সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, সেই সাম্রাজ্যের একজন গর্বিত ও অধিকার-বোধসচেতন প্রজা হিশেবে বাঙালি তখন তার অন্য এক আত্মজীবনী পাঠ করতে চায়। সে-আত্মজীবনীতে সে নিজেকে আবিষ্কার করতে চায় এক বিস্তৃত ইতিহাসের পটভূমিতে, আগামী ইতিহাসের বিস্তারের পুরোভূমিতে। 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' সেই পটভূমি বা পরিপ্রেক্ষিতের কথা বিন্দুমাত্র বলে না—এ-রচনা দুটি বড় বেশি সেই বর্তমানে গ্রথিত। সে-বর্তমানের সবটুকু তখন বাঙালি স্বীকার করতেও চায় না। চায় না বলেই বাঙালি বা কলকাত্তাই কণ্ঠের যে বহুস্বর 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'কে আধুনিক উপন্যাসের মর্যাদা দেয়—সেই বহুস্বরও আর শোনা যাচ্ছিল না। তার বদলে কান অপেক্ষা করছিল একস্বরের, মহৎ কোনো একস্বরের। সে-স্বর লেখকের এবং কেবল লেখকেরই। সে-স্বর তার সমমাত্রিকতার সুযোগে কাহিনীবিবরণের ভিতর এনে দেবে বর্ণনার ঐক্য, সে-লেখক ঘটনার বা চরিত্রের বিবরণ যখন দেন তখন ঘটনা বা চরিত্র অনুযায়ী তাঁর কণ্ঠস্বর সবটুকু বদলায় না বরং লেখকের প্রায় কণ্ঠস্বরের সঙ্গেই চরিত্র বা ঘটনাগুলি তাদের স্বর মিলিয়ে নেন, সে-লেখক কোনো সময়েই ভুলতে দেন না তিনিই লেখক এবং পাঠক তাঁর নির্দেশ অনুসারেই পড়ছেন। ঠিক সেই সময়ই 'নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন।'

বত্রিশ সিংহাসন বা গোলেবকাওলির গদ্য-আখ্যান থেকে উপন্যাসকে অন্তত ঘটনাকালগতভাবে প্যারীচাঁদ ও হুতোম সরিয়ে এনেছিলেন একেবারে উনিশ শতকের মধ্যপর্বে, বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু সে-গদ্য-আখ্যানকে ঘটনাকালগতভাবে ৯৯৭ বঙ্গাব্দে ('দুর্গেশনন্দিনী') আকবরের শাসনকালে ('কপালকুণ্ডলা'), লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় ('মৃণালিনী'), পেছিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। রোমান্স আর উপন্যাসের ভিতরে পার্থক্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রর এ-চেষ্টার ব্যাখ্যা মিলবে না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে একটা বিবরণ দিচ্ছিলেন—একটাই বিবরণ। সে-বিবরণের তিনিই প্রধান কর্তা, সে-বিবরণের তিনিই প্রধান লেখক। পরবর্তীকালে যখন তিনি উপন্যাসের মধ্যে এই বিবরণকে সম্পূর্ণ করতে পারছেন না বলে তাঁর মনে হয়েছে, তিনি গদ্যবিবরণের অন্য ধরণ বেছে নিয়েছেন। সেই কারণেই উপন্যাসেও তার কাহিনী-বিবরণ এমন একস্বর-প্রধান। সেই বিবরণে বাঙালির জন্যে একটি আত্মজীবনীর প্রত্যাশাই প্রধান ছিল। আর সেই প্রত্যাশা পূরণের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মত এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক কল্পনাশক্তিমান পুরুষ উপন্যাসের কাহিনীর সুযোগে বাঙালিকে তার ঐতিহাসিক পশ্চাদপ্রেক্ষিত ও পুরোপ্রেক্ষিত দুটোই দিতে চাইছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এই অক্ষ-ও-দ্রাঘিমা রেখা ছাড়া গড়ে উঠতে চায় না। সেই বিন্যাসে বাঙালি নিজেকে শুধু ভিক্টোরিয়ার ইংরেজপ্রজার সমতুল্য ভাবার সমর্থনই পায় না, এমনকী সেই ইংরেজপ্রজার পশ্চাদ গৌরবের সমতুল্যতাও যেন অনেকখানি অর্জন করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ইংরেজিশিক্ষিত নতুন যুবকদের ভাল লেগেছিল কাহিনীর গুণে, সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষিত প্রবীণ পাঠকদের ভাল লেগেছিল ভাষার সংস্কৃত নির্ভরতার গুণে। কাহিনীবিবরণের গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আর-সমস্ত চেষ্টাকে এই ভাবেই অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক করে দিলেন। বাংলা উপন্যাসের আরম্ভকাল বঙ্কিমচন্দ্রেই চিহ্নিত হয়ে গেল।

মধুসূদন কবিতায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আধুনিকতার বিপরীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যেমন, তেমনি, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আধুনিকতার বিপরীতে নিজেকে স্থাপন করলেন। মধুসূদনের কাছে ভারতচন্দ্র-ঈশ্বরগুপ্ত ধারাই ছিল কবিতার আধুনিকতার প্রতিপক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে আলালহুতোমই ছিল উপন্যাসের আধুনিকতার প্রতিপক্ষ।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই কবিতার আধুনিকতার ক্ষেত্রে ঈশ্বরগুপ্তের কীর্তিকে ইতিহাসে চিহ্নিত করলেন তাঁর 'ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের জীবনী'তে। আর মধুসূদন উপন্যাসের আধুনিকতার ক্ষেত্রে আলাল-হুতোমের, বিশেষত আলালের কীর্তিকে ইতিহাসে চিহ্নিত করলেন তাঁর দুটি নাটকে—'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'য়। বঙ্কিমচন্দ্র তখনই জানিয়েছিলেন যে গুপ্তকবি বাঙালি-ভারতীয় আধুনিক এক জীবনের কথা কবিতায় এনেছিলেন—'মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালির কবি, ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙালি কবি জন্মে না, জন্মিবার যো নাই, জন্মিয়া কাজ নাই।'

প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পর্কে ও তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত বয়সে বলেছিলেন, ''আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে'র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ'। এতটা বলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কথাটি আর-একটু বেঁধে দিতে চান, 'বাঙ্গালা ভাষার এর সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর-এক সীমানা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়' ('বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান', বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, সাক্ষরতা প্রকাশন, প্রবন্ধ খণ্ড, শেষ অংশ)। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর বিষয়সম্ভাবনা বঙ্কিমচন্দ্রের মত ফর্মসচেতন শিল্পী জানাতে চেয়েছিলেন, কোথাও তিনি প্যারীচাঁদের এই শক্তি সম্পর্কে সশ্রদ্ধও ছিলেন কিন্তু যে-স্বীকৃতিকে এতগুলো 'না' দিয়ে চিহ্নিত করতে হয়—তার নিহিত প্রত্যাখ্যান খুব আর গোপন থাকে না। আর এই ছোট লেখাটি যখন লেখা তখন বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা ভাষার একমাত্র ঔপন্যাসিক হিশেবে অবিসংবাদী। তেমনি, মদুসূদন তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—এই দুটি প্রহসনে বিশেষত 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর সংলাপের ভাষায় বোধহয় একটা মডেল পেয়েছিলেন। সেটা অন্তত 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় আরো নির্দিষ্ট হয়েছিল প্যারীচাঁদেরই 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' গদ্যরচনাটি থেকে। তখনকার এই ধরণের প্রহসন জাতীয় আরো অনেক রচনায় বা নকশাজাতীয় লেখায় কলকাত্তাই কথ্য বাংলার একটা ভঙ্গি সাহিত্যে এসেছিল। আলালকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবলম্বন করে মধুসূদন সেই গদ্যভঙ্গিকে তাঁর প্রহসনে নিয়ে আসতে পারলেন এমনই অনায়াসে যে তাতে ভাষার ওপর তাঁর কবিত্বের কর্তৃত্বের দুই কোটি চিহ্নিত হয়ে যায়। সংস্কৃত ভাষার আত্মীয়তা আর লোকের দৈনন্দিন কথাবার্তার অংশ হয়ে যাওয়ার মধ্যে বাংলা ভাষার যে-বিস্তার, মাইকেল 'একেই কি বলে সভ্যতা' থেকে 'মেঘনাদবধ কাব্য' পর্যন্ত সেই বিস্তারকেই সাহিত্যে রূপ দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু আলালিবাচনের সেই ধরণকে তিনি যখন প্রহসনে ব্যবহার করেন তখন তাঁর খেয়ালও থাকে না—ঈশ্বরগুপ্তের প্যারডিগুলিও ঐ নাগরিকবাচনেরই প্রমাণ। সেগুলো মাত্র অন্ত্যমিলের আর পয়ারের যদৃচ্ছ শোষণক্ষমতার ছুতোতেই পদ্য। বরং গদ্যে কথকের কণ্ঠস্বর যে-স্পষ্টতায় শোনা যায়, আলালের চাইতে ঈশ্বরগুপ্তে তা অনেক সময়ই প্রত্যক্ষতর। কিন্তু আমাদের কবিতায় আধুনিকতার এই প্রথম স্রষ্টা কবিতার আধুনিকতার আর-এক স্রষ্টার এই বৈশিষ্ট্যের দিকে অপাঙ্গেও তাকান না—ভারতচন্দ্র-ঈশ্বরচন্দ্র ধারা তাঁর পক্ষে এমনই বর্জনীয়, গুপ্তকবি তাঁর পক্ষে এমনই অপ্রাসঙ্গিক। ইংরেজ সংস্কৃতির প্রক্ষেপের ফলে উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ-ষাট বছরের আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে কতকগুলি অনুত্তীর্য গভীর খাদের কথা এর আগে আমরা বলেছি। বলেছি যে তারই ফলে নানা ধরণের পরিণতিহীন আরম্ভের ভিতর আমাদের এই সময়ের সাহিত্য আটকে গেছে। ঈশ্বরগুপ্ত আর মাইকেলের মাঝখানে কবিতায়, প্যারীচাঁদ আর বঙ্কিমচন্দ্রের মাঝখানে উপন্যাসে—সে-রকমই এক খাদ যার ওপর দিয়ে সেতুবন্ধন সম্ভব নয়, কার্যকারণের সেতুও নয়, ধারাবাহিকতার সেতুও নয়।

আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের ভিতরে ধারাবাহিকতার এই ছিন্ন মুহূর্তগুলি সম্পর্কে, ইতিহাসের এই নীরবতাগুলি নিয়ে আমাদের ভাবনাচিন্তা এখনো শুরু হয় নি। সেই কারণেই কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক—সাহিত্যের এই বিভিন্নরূপের একটা ধারাবাহিকতা যেন আমরা আমাদের এই বাংলা সাহিত্যেও পেয়ে যাই কিন্তু সে-ধারাবাহিকতা কার্যত হয়ে দাঁড়ায় কবি-ঔপন্যাসিক-গল্পকার-নাট্যকারদের নামপঞ্জির কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা। তাতে সাহিত্যের এই সব বিভিন্ন রূপের, ফর্মের, নিজস্ব ইতিহাসের ধারাবাহিকতা মেলে না।

সাহিত্যের ইতিহাসে এই এক কালানুক্রমের ধারাবাহিকতা দিয়ে বিষয়ের ধারাবাহিকতা আমরা বুঝে আসছি বলে আমাদের কাছে গল্প-উপন্যাস, কবিতা বা নাটকের ফর্মের ইতিহাসটি গ্রাহ্য হয়ে ওঠে নি। যেন, ঈশ্বরগুপ্তও আধুনিক, মাইকেলও আধুনিক, প্যারীচাঁদও আধুনিক, বঙ্কিমচন্দ্রও আধুনিক, যেন, আধুনিকতা, আমাদের জীবনকে ও আমাদের সাহিত্যকে সেই উনিশ শতকের মধ্যপর্বেই চারদিক থেকে এমন বদলে দিয়েছিল যে ইয়োরোপীয় রিনাসান্সের তুলনীয় পরিবর্তনই ঘটে যাচ্ছিল সাহিত্যের এই শাখায়। ফলে, আধুনিকতাকে, উনিশ শতকের আধুনিকতাকে তো বটেই, এমনকী বিশ শতকের আধুনিকতাকেও, আমরা বারবার বুঝে নিতে চেয়েছি ইয়োরোপীয় আধুনিকতার নানা উদাহরণের সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে। তিরিশের দশকে আমাদের কবিতার আধুনিকতা বুঝতে হয়েছে এলিয়ট থেকে মালার্মে পর্যন্ত বিভিন্ন কবির কাব্যাদর্শে। এমনকী পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে আমাদের বাংলা কবিতার এক ধরণের আধুনিকতা বুঝতেও মার্কিন দেশের বিট-বংশের কবিদের উদাহরণ আমাদের সংগ্রহ করতে হয়েছে। এক রবীন্দ্রনাথকেই ইয়োরোপ দিয়ে সম্পূর্ণ বুঝে নেয়া যায় না বলেই, কবি হিশেবে রবীন্দ্রনাথই এখনো পর্যন্ত আমাদের দুর্বোধ্যতম ব্যক্তিত্ব—বড় বেশি ভারতীয় ও বাঙালি বলেই বড় বেশি দুর্বোধ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের আধুনিকতাচর্চার এই বিচ্ছিন্নতার মুহূর্তগুলি, এই বিচ্ছেদের খাদগুলি বুঝে নেয়াব জন্যে আমরা এতক্ষণ সাহিত্যের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত ছোটপর্বের সীমায় আমাদের কথাগুলিকে সাজিয়েছি। সেই জন্যেই উনিশ শতকের কবিতার আধুনিকতা ও উপন্যাসের আধুনিকতার প্রসঙ্গ প্রায় সমপরিমাণে এসেছে। নাটকের প্রসঙ্গও আসতে পারত আর নাটকের সেই প্রসঙ্গে হয়তো বিচ্ছেদের খাদগুলি আরো প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারত। সে-কারণেই তাতে দীর্ঘতর কালপর্বকে আমাদের আলোচনার ভিতরে আনতে হত। আমরা চেয়েছিলাম একটি ছোট কালপর্ব নিয়ে একটু নাটকীয় প্রতিন্যাসে আমরা এই বিচ্ছিন্নতার মুহূর্তগুলিকে চিনে নিই—সেজন্যই গুপ্তকবি আর মাইকেল, প্যারীচাঁদ আর বঙ্কিমকে নিয়েই আমরা কথাগুলি বলেছি।

কিন্তু এখন আমরা দেখতে চাই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে যে-আধুনিকতাকে প্রামাণিক করে তুললেন তার ফলে উপন্যাসের শাখাটিই কেমন হয়ে উঠল বাংলা সাহিত্যে। উপন্যাস পড়তে-পড়তেই তো আমাদের ভিতরে উপন্যাসের সংজ্ঞা তৈরি হয়ে ওঠার কথা। এমনকী যে-ঔপন্যাসিকরা উপন্যাস বা গল্প লেখেন তাঁরাও তো লিখতে-লিখতেই উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞাটি নিজের কাছে তৈরি করে নেন। সংজ্ঞা সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান বা স্থির ধারণা থাকে না বলেই উপন্যাস বা গল্প, বা যাকে আমরা গদ্যকাহিনী বা কথাসাহিত্য বলি, তার বিকাশের প্রক্রিয়াটি হয়ে ওঠে অভাবিত ও অনিশ্চিত অথচ তার চরিত্র বা সংজ্ঞা তারই মধ্যে এক ধরণের স্পষ্টতা পেতে থাকে।

বাংলা গল্প-উপন্যাসকেও সেই অভাবিত ও অনিশ্চিত পথে বিকশিত হতে হচ্ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের বা কাহিনীগদ্যের যে-ধরণটি, যে-ফর্মটি প্রতিষ্ঠিত করলেন তার ভিতর কোনো অনিশ্চয়তা ছিল না, কোনো দ্বিধা বা সঙ্কোচ ছিল না। কারণ, তাঁর কাছে ইয়োরোপীয় উপন্যাসের মডেলটিই ছিল একমাত্র মডেল। সে-রকম ভাবে উপন্যাস লিখলেই বাংলায় উপন্যাস হবে, নইলে হবে না—বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের ফর্ম সম্পর্কে ছিলেন এমনই স্থিরজ্ঞান ও স্থিতসিদ্ধান্ত। তাই তাঁর প্রথম উপন্যাসই পুরো উপন্যাস। তাই বছরের পর বছর তিনি যে-উপন্যাসের পর উপন্যাস লিখে যান—তাতে উপন্যাসের সংজ্ঞাসম্পর্কিত কোনো অনিশ্চয়তা বা অনির্দিষ্টতা সচেতনভাবে কাজ করে না।

তাঁর শেষের দিকে হয়তো এই দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল অচেতনেই। তিনি যাঁকে উপন্যাস বলে জানতেন ও যে-উপন্যাস তিনি তৈরি করলেন তার অবয়বে 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরানী' ও 'সীতারাম'-এর বিবরণকে আর আকার দেয়া যাচ্ছিল না হয়তো। উপন্যাসের জন্যে যে-বিবরণ তাঁর মধ্যে জমা হচ্ছিল অথচ যে-বিবরণকে আধেয় করার ফর্ম তাঁর আয়ত্তে ছিল না, তা-ই হয়তো 'কমলাকান্তের দপ্তর' হয়ে ওঠে।

কিন্তু আমরা এখন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসচর্চার স্তরান্তর বা তাঁর সেই চর্চার ভিতরকার বিচ্ছেদ মুহূর্তটি খুঁজব না। আমরা বাংলা উপন্যাসের ধরণটিকেই একটু বুঝে নিতে চাই—যে-ধরণের শুরু বঙ্কিমচন্দ্রেই। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে উপন্যাস মনে করতেন সেই ধরণটিই বাংলা উপন্যাসের একমাত্র ধরণ হিশেবে গত প্রায় সোয়া শ বছর চর্চিত হয়ে আসছে, মাঝখানে হয়তো কিছু ব্যতিক্রমসহই। বাংলায় উপন্যাস-সাহিত্যের প্রধান সঞ্চয় তারই ফল। কিন্তু সব সঞ্চয়েরই তো একটি ক্ষতির দিক আছে—ঐ একটি মাত্র ধরণেরই ফলে বাংলা উপন্যাস কি আধুনিকতার অন্য কোনো উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

'সাহিত্য সংসদ' প্রকাশিত 'বঙ্কিমরচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস প্রথম বেরবার পর যে-প্রতিক্রিয়ার কথা জানিয়ে দেন মাত্র সেই সংক্ষিপ্ত সমাচারেই আমরা দেখি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকের মধ্যে কোনো দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব ছিল না—তাঁরা সকলেই যেন এর জন্যে অপেক্ষায় ছিলেন, তাই প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই অভিনন্দিত করতে পেরেছেন। এই পাঠকদের মধ্যে ইংরেজিশিক্ষিত যুবকরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন ভাটপাড়ার প্রবীণ পণ্ডিতরাও। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভাই পূর্ণচন্দ্র পাণ্ডুলিপি আকারে 'দুর্গেশনন্দিনী' পাঠের অভিজ্ঞতা বলেছেন,

> 'এক সময়, বড়দিনের কি মহরমের ছুটিতে আমার মনে, নাই, অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। ভাটপাড়ায় পণ্ডিতগণও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্বহস্তলিখিত 'দুর্গেশনন্দিনী' তাঁহাদের নিকট পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ...একজন প্রাচীন ভদ্রলোক মধ্যে-মধ্যে চিৎকার করিয়া বলিতেছেন 'আ মরি, আ মরি ; কী বক্তৃতাই করিতেছেন' ; এই রূপে দুই দিনে গল্প পাঠ শেষ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম হইতে ধারণা ছিল যে 'দুর্গেশনন্দিনী'-র ভাষা ব্যাকরণ দোষে দূষিত। সেজন্য তিনি গল্প পাঠ শেষ হইলে উপস্থিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাষার ব্যাকরণদোষ আছে, উহা কি লক্ষ্য করিয়াছেন?' মধুসূদন স্মৃতিরত্ন বলিলেন, 'গল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, আমাদের সাধ্য কি যে অন্যদিকে মন নিবিষ্ট করি।' বিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বলিলেন যে, 'আমি স্থানে-স্থানে ব্যাকরণদোষ লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই স্থানে ভাষা আরো মধুর হইয়াছে।'

'দুর্গেশনন্দিনী'র কোন গুণে একই সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষিত তরুণ ও প্রবীণ সংস্কৃত পণ্ডিত মুগ্ধ হতে পারেন? এই মুগ্ধতার দুটি কারণের কথা প্রায় প্রত্যেকেই স্পষ্টভাবে বা অস্পষ্টভাবে বলেছেন : ভাষা ও কাহিনী। 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' আর এই ধরণের আরো নানা লেখায় তখনকার কলকাতার যে-দৈনন্দিন ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হিশেবে ব্যবহার করা হয়েছিল—সেই ভাষাতে সাহিত্য শোনার বা পড়ার কোনো অভিজ্ঞতা বাংলা পাঠকের বা শ্রোতার ছিল না। তাঁরা সাহিত্যের একটু অলঙ্কৃত ও সংস্কৃত আশ্রয়ী রূপে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই দৈনন্দিনের ভাষায় রচিত হলেও আলাল বা হুতোম বাঙালি সাহিত্যপাঠকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলছিল না। ততদিনে ইংরেজি শিক্ষিত নতুন পাঠকশ্রেণীও কিছুটা তৈরি হয়ে গেছে। সেই শ্রেণী ইংরেজি ভাষার সমস্ত কিছুকেই বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত দেখতে চাইছিলেন। সেই প্রত্যাশাও আলালে বা হুতোমে মিটছিল না। অপরদিকে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ শিক্ষিত শ্রেণী আলালি ও হুতোমি ভাষাকে অপভাষা মনে করতেন।

'দুর্গেশনন্দিনী'র তৎসমশব্দ, সমাসবদ্ধ পদ, বিশেষণ বাহুল্য ও প্রত্যয়নিষ্পন্ন পদে যে-সংস্কৃত আশ্রয়ী গদ্য তৈরি হল তা আমাদের সাহিত্যপাঠক বা শ্রোতাদের অভিজ্ঞতায় দুরন্বয়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না। সংস্কৃতচর্চা বা সংস্কৃতনির্ভর শিক্ষা না থাকলে 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা পড়ে ভাল লাগা ইংরেজি শিক্ষিতদের পক্ষে সম্ভব ছিল না হয়তো, কিন্তু, ইংরেজিতে ভিক্টোরীয় বা তার আগের যে-গদ্যভঙ্গি বা কাব্য এই পাঠক সমাজের শিক্ষার ভিত ছিল সেই গদ্যভঙ্গি ও কাব্যের ঘনিষ্ঠ স্বর তাঁরা 'দুর্গেশনন্দিনী'তে শুনতে পেয়েছিলেন।

আর-একটি অনুমান আমি জানাতে চাই। এ-কথা বারবার বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, যে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের কাহিনীসাহিত্যে 'গোলেবকাওলি' 'আরব্যরজনী'র পর্বের অবসান ঘটিয়েছিলেন। উপন্যাসের শিল্পতত্ত্বের দিক থেকে এ-কথা নিশ্চয়ই সত্য, কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কাহিনীগদ্য গল্পের নির্ভরতা কাটিয়ে চরিত্রের নির্ভরতায় এল। কিন্তু কাহিনীর দিক থেকে যদি দেখা যায় তা হলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনটি উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'র অবয়ব তৈরি হয়েছিল আমাদের সেই কাহিনীস্মৃতি থেকেই—'গোলেবকাওলি' ও 'আরব্যরজনী' যে-কাহিনীর স্মৃতির অংশ। একটি তুলনা দিলে হয়তো আমার এই অনুমানটি আর-একটু স্পষ্ট করা যাবে। দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসে ইয়োরোপীয় অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে—এ-কথা অনেক দিন আগেই আলোচকরা আমাদের জানিয়েছেন। মিখাইল বাখতিন তাঁর 'দস্তয়েভ্স্কি ও তাঁর উপন্যাসের নন্দনতত্ত্ব' বইটিতে আমাদের দেখিয়েছেন কী ভাবে এই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর উপাদান দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসে মেনিপ্পিয়ান কমেডির উপাদানের সঙ্গে মিশে একটা কার্নিভালের পরিস্থিতি তৈরি করে তুলেছে। এই তুলনাটিকে আমরা শুধু এইটুকু বুঝতেই ব্যবহার করতে চাই যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনটি উপন্যাসে 'গোলেবকাওলি' ও 'আরব্যরজনী'র কাহিনীপরিপাটি (স্টোরিপ্যাটার্ন) ছিল বলেই সেদিন তাঁর উপন্যাসগুলো বাঙালি সমাজের সব স্তরেই একই রকম আগ্রহে গৃহীত হয়েছিল। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর বিবরণ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্-এর 'বঙ্কিমরচনাবলী'তে আচার্য যদুনাথ সরকারের ভূমিকায় আমরা অন্তত এই তিনটি উপন্যাসের কাহিনীউৎস ও সেই কাহিনীর অলঙ্করণ প্রক্রিয়া জানতে পারি। পূর্ণচন্দ্র আমাদের জানান তাঁদের এক দীর্ঘজীবী ঠাকুরদাদার মুখে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁরা গড় মান্দারণের কাহিনী শুনেছিলেন, 'আমাদের মেজঠাকুরদাদার মধ্যে-মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিম্বদন্তী রূপে চলিয়া আসিতেছিল।' আচার্য যদুনাথ আমাদের জানান, 'জগৎ সিংহের আহত হওয়া, কুৎলুর দুর্গে আবদ্ধ থাকা, এবং তাঁহার দ্বারা কুৎলুর মরণকালে সন্ধিভিক্ষা করা, এই শাখাপল্লবগুলি ইতিহাসের বাহিরে হইলেও বঙ্কিমের নিজ কল্পনার সৃষ্টি নহে। এগুলি আসিয়াছে ঐতিহাসিক নামজাদা একজন ঘোর কাল্পনিক শাহেবের লেখা হইতে, তিনি কাপ্তান এলেকজান্ডার ডাও। এই শাহেবটি ফিরিস্তার রচিত হিন্দুস্তানের ইতিহাস ইংরাজীতে প্রায়শঃ অনুবাদ করিয়া দিতেছেন বলিয়া এবং নিজ গ্রন্থের নামপত্র ফিরিস্তার নাম সংযোগ করিয়া দিয়া অপর্যাপ্ত মেকি কথা চালাইয়াছেন যাহা ফিরিস্তাতেও লেখেন নাই এমন-কি কোনো পারসিক লেখকের পক্ষে সেরূপ লেখাও সম্ভব ছিল না।'

'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'তেও বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীপরিপাটিতে এই মিশ্রণ দেখা যেতে পারে—উপন্যাসের পক্ষে গ্রহণযোগ্য লোককথার একটা আনুষ্ঠানিক চেহারা আর শাহেবের লেখা হিন্দুস্তান সংক্রান্ত গালগল্প। শাহেবের সে-গালগল্পের উৎস কিন্তু একটু প্রামাণিক ইতিহাসের মোড়কে 'গোলেবকাওলি' ও 'আরব্যরজনী'র কাহিনীরচনার ইচ্ছা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সব কথা থেকে আমরা এ-রকম একটা প্রশ্নের কাছাকাছি আসতে চাইছি—এমন কিছু ইশারার ওপর ভর করে যদি ধরে নেয়া যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বাঙালি পাঠকের নানা ধরণের প্রত্যাশা ও প্রস্তুতিকে নতুন একটা ভঙ্গিতে মিটিয়ে দিতে পেরেছিলেন বলে তাঁর উপন্যাসেই উপন্যাস তৈরি হল, তা হলে এটাও কি আমাদের মেনে নিতে হয় যে 'দুর্গেশনন্দিনী'র জন্যে বাঙালি সমাজের সেই প্রত্যাশা ও প্রস্তুতিও তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতীয় প্রজা হিশেবে ইংরেজ সংস্কৃতিরও অংশভাক্ হওয়ার লোভ থেকেই? ঐতিহাসিক হিশেবে নিন্দিত শাহেবের গালগল্প বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিকের প্রথম উপন্যাসের স্মরণীয় উপাদান হয়ে উঠতে পারে, আরব্য কাহিনীরও আধুনিক আত্তীকরণ ঘটে যেতে পারে, আর, এত পরিচিত বিষয়গুলি, এমন অপরিচিত এক ভঙ্গিতে আসে বলেই কি পাঠকসমাজের কোথাও কোনো অনিশ্চয়তা নেই, সংকোচ নেই, অপরিচয়ের কুণ্ঠা নেই—আছে প্রত্যাশিতের জন্যে অভিনন্দন, আমাদের ইতিপূর্বের কাহিনীগদ্যের ভঙ্গি থেকে বিচ্ছিন্নতার এক গৌরববোধ, অথচ সেই প্রচলিত কাহিনীগদ্যের অভিজ্ঞতা দিয়েই 'দুর্গেশনন্দিনী'কে চিনে নেয়ার নিশ্চয়তা?

কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় শুধু যে 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র দৈনন্দিন জীবন ও ভাষা, যে-জীবন আমরা যাপন করছি সেই জীবন সম্পর্কে কৌতুক মেশানো মানবিকবোধ, ও উপন্যাসের এক নতুন দেশীয় বিবরণই উপন্যাসের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল তাই নয়—আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলিতে, চৈতন্যজীবনীতে ও চৈতন্যের পরবর্তী পালাগানে কাহিনী বলার যে একটি বা নানা ধরণ তৈরি ছিল, তার সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের ফর্মের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা ঘটে গেল। সেই কাহিনীগুলির কোনো-কোনোটির বাঁধাধরা চেহারা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যেমন, মঙ্গলকাব্যে দেবখণ্ড নরখণ্ড থাকে, দেবখণ্ডের কাহিনীর সঙ্গে নরখণ্ডের একটা সংযোগ রাখতে হয়, দেবখণ্ডে সৃষ্টিতত্ত্বের মত একটু-আধটু পৌরাণিক জিজ্ঞাসার মিশেল থাকে, নরখণ্ডেও গ্রন্থোৎপত্তির কারণ থেকে গ্রন্থশেষ পর্যন্ত কাহিনীর বাঁধাধরা ভাগ থাকে। কিন্তু এই বাঁধাধরা চেহারা সত্ত্বেও কী দেবখণ্ডে কী নরখণ্ডে, কাহিনী ও চরিত্রের ভিতর ঘটে যেতে পারে নানা নতুন অভিঘাত, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। চৈতন্যজীবনীরও তো এ-রকমই বাঁধাধরা ভঙ্গি আছে—পালাগানের সঙ্গে চৈতন্যজীবনীকে যুক্ত করে কাহিনীর যে-অবয়ব তৈরি করা হত তাকেও প্রায় ঐ দেবখণ্ড-নরখণ্ডই বলা যায়। সেখানে পালারচয়িতা পদকর্তা ছাড়াও গায়ক বা কথকেরও একটা মুখ্য ভূমিকা ছিল। আর এমন দুজন বা তিনজন রচয়িতার মধ্যে দিয়ে আসত বলে পালাকীর্তনে কাহিনীর অনেকগুলি ধারা সামান্তরিক থাকতে পারত।

লোকায়ত ছৌ বা ধ্রুপদী কথাকলিতে মুখোশের অপরিবর্তনীয় স্থিরতার জন্যেই নৃত্যভঙ্গিগুলিকেও টুকরো-টুকরো করে নিয়ে অর্থের নির্দিষ্টতার সঙ্গে ভঙ্গির নির্দিষ্টতা তৈরি হয়ে উঠেছে লোক-অভিজ্ঞতায় বা শাস্ত্রে। ভরতনাট্যমে মুখোশ থাকে না বলে নৃত্যশিল্পী তাঁর সম্পূর্ণ শরীর দিয়ে ভঙ্গির ভিতর অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চারিত করে দিতে পারেন যদিও সেখানেও ভঙ্গির নির্দিষ্টতা অর্থের নির্দিষ্টতার সঙ্গে বাঁধা। 'ছৌ' বা 'কথাকলি'তে স্টেরিওটাইপকেই ফর্ম হিশেবে ব্যবহার করা হয় যেমন, তেমনি মঙ্গলকাব্যে, চৈতন্যজীবনীতে ও বৈষ্ণব পালাগানে কাহিনীর স্টেরিওটাইপকেই ফর্ম হিশেবে ব্যবহার করা হত। আর, স্টেরিওটাইপের সেই সুযোগেই কাহিনীটি সম্পর্কে কবি তাঁর নিজস্ব বিবরণ দিতে পারতেন। মঙ্গলকাব্য থেকে চৈতন্যজীবনী ও তা থেকে পালাগানে এই স্টেরিওটাইপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীরে-ধীরে শিথিল হয়েছে, কাহিনীর ভিতরে কবির ও গায়ক-কথকের নিজস্ব বিবরণ ঢোকানোর পদ্ধতিও তার সঙ্গে-সঙ্গে বদলে গেছে। কিন্তু এই পরিবর্তন স্টেরিওটাইপের ক্রম শিথিলতার সঙ্গে যুক্ত নয়—ব্যাপারটা এ-রকম নয় যে কবি বা গায়ক-কথক ধীরে-ধীরে বেশি-বেশি স্বাধীনতা পেয়ে যাচ্ছেন। আসলে, মঙ্গলকাব্যের বিষয়ের সঙ্গে কবির যা সম্পর্ক, চৈতন্যজীবনীর বিষয়ের সঙ্গে কবির সে-সম্পর্ক নেই। সম্পর্কটাই এমন আলাদা যে মঙ্গলকাব্যের কবি মঙ্গলকাহিনীর স্টেরিওটাইপে কাহিনী সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বিবরণ যে-কারণে যে-ধরণে দিতেন, চৈতন্যজীবনীকারের কাছে সেই কারণ ও ধরণটাই ছিল অবান্তর, অন্তত প্রথম দিকের চৈতন্যজীবনীকাররা তো আলাদা একটি স্টেরিওটাইপ তৈরির কাজেই নিজেদের নিরত রেখেছিলেন, ফলে তাঁরা সেই স্টেরিওটাইপের প্রতি একটা স্বেচ্ছা-আনুগত্য প্রকাশ করতেন। মঙ্গলকাব্যের আনুগত্যের স্বাধীনতা—কাহিনীর ভিতরে কাহিনীকারের বিবরণকেও বদলে দিচ্ছিল। পালাকীর্তনের গায়ক-কথক সুরের ও আখরের সুযোগে কাহিনীর ভিতরে তাঁর নিজস্ব বিবরণকে ফর্মের দিক থেকেই গ্রাহ্য করে নিয়েছিলেন। পালাকীর্তনের আখর তো গায়কের স্বাধীন বিবরণ। বৈষ্ণব পদাবলী চৈতন্যের পরেই বাঙালি সাধারণের চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে—এ-কথা অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। আর, চৈতন্যজীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে কৃষ্ণকাহিনী বাল্যলীলা, গোষ্ঠ, নৌকাবিলাস, দানখণ্ড, বংশীশিক্ষা, মানভঞ্জন, অক্রূর সংবাদ, দূতীসংবাদ, মাথুর ইত্যাদি বিভিন্ন আখ্যানে ভাগ হয়ে পালাকীর্তনের বিষয় হয়ে ওঠে। সেখানে পালাকারের ওপর ও কথক-গায়কের ওপর একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল। প্রচলিত পদগুলির ভিতর তাঁদের গ্রন্থনার কাজ করতে হত। সেই গ্রন্থনার সূত্র তাঁদের সংগ্রহ করতে হত চৈতন্যজীবনের দার্শনিক ব্যাখ্যা থেকে, ভাগবতের বিভিন্ন তত্ত্ব থেকে ও পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ থেকে। এই উৎসগুলি থেকে পালাকার ও বিশেষত কথক-গায়ক তাঁর বক্তব্যটিকে তৈরি করে তুলতেন। এই বক্তব্য ছাড়া পালাকীর্তন তৈরি হয়ে উঠতে পারত না। এখানেই আমরা ঔপন্যাসিক বিবরণের এক আদি উদাহরণ পাই—যেখানে কাহিনীর স্টেরিওটাইপের মধ্যে, পদের অপরিবর্তনীয় বাঁধা গতের মধ্যে গায়ক-কথক তাঁর বক্তব্যকে গ্রথিত করে দিতে পারছেন আর সেই গ্রন্থনার ফলে কাহিনীর অবয়ব বদলে যাচ্ছে, চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্ক বদলে যাচ্ছে ও এক ধারাবাহিকতার অংশ হয়েও কাহিনী এক ধরণের স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারছে। গোষ্ঠলীলাই যে কৃষ্ণের একমাত্র লীলা নয় বা নৌকাবিলাসেই যে কৃষ্ণ-রাধার সম্পর্ক শেষ নয়—এ কথা কথক-গায়ক যেমন জানেন, তেমনি শ্রোতাও জানেন। অথচ গোষ্ঠলীলার বলরামসহ অন্যান্য রাখালবালকরা কৃষ্ণের পরবর্তী লীলায় আর ফিরে আসবেন না—এই বোধ একই সঙ্গে পালাটিকে সম্পূর্ণতা দিচ্ছে অথচ কৃষ্ণের পরবর্তী লীলার পালার সঙ্গে যুক্ত করছে। নৌকাবিলাসে রাধাসহ গোপনারীরাও সেই ধারাবাহিকতারই একটি অসম্পূর্ণ অংশ। পালাকীর্তনের এই বিপরীত রীতি সম্ভব হয় একমাত্র কথক-গায়কের বিবরণের ফলে। সেই ব্যাখ্যায় কাহিনী তার পৌরাণিক বা এপিক পারম্পর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ও এক-একটি পৃথক পদের লিরিক সম্পূর্ণতা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়। আবার একই সঙ্গে পৌরাণিক বা এপিক পারম্পর্যের ছায়া সেই লিরিকগুলির ওপর ছড়িয়ে যায় ও লিরিকের পদসুষমা এপিকের সেই ছায়ার মধ্যেও আলাদাভাবে ধরা পড়ে।

শুধুমাত্র রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর মধ্যেই পালাকীর্তন সীমাবদ্ধ ছিল না, তাকে গ্রথিত করতে হত চৈতন্যজীবনের প্রাসঙ্গিক অংশের সঙ্গে। কথক-গায়কের এই বিবরণেই সেই গ্রন্থনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভব হত। সেখানে চৈতন্যজীবনের পরিচিত কাহিনীগুলিকে মিথে রূপান্তরিত করতে হত আর সেই মিথের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত মিথকে যুক্ত করতে হত। এই প্রয়োজন থেকেই উপন্যাস তৈরি হয়ে ওঠে ও একটি প্রতিষ্ঠিত ফর্মের মধ্যে অন্তর্ঘাত ঘটায়। উপন্যাসের ফর্ম তাই কোনো সময়ই নির্দিষ্ট করে দেয়া যায় না কারণ কোন প্রতিষ্ঠিত ফর্মে কী ধরণের অন্তর্ঘাত ঘটানো হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে সেই উপন্যাসের বিশেষ গড়ন। বৈষ্ণব পালাকীর্তনের এই আখরগুলিতে আমরা এই ঔপন্যাসিক অন্তর্ঘাতের প্রথম উদাহরণ পাই। পালাকীর্তনের বাইরেও এই পদগুলির আলাদা জীবন ছিল, বস্তুত আলাদা লিরিক হিশেবেই এই পদগুলি রচিত হত। পালাকীর্তনের বাইরে রাধাকৃষ্ণ মিথের আলাদা ফর্মও সক্রিয় ছিল। সে-রকমই চৈতন্যজীবনের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণকাহিনীর সম্পর্কেরও আলাদা বিবরণ ছিল, বস্তুত সেই দার্শনিক বিবরণগুলিই ছিল ধর্মের দিক থেকে অধিকতর প্রামাণিক। কিন্তু এতগুলি বাইরের ফর্মের ভিতর পালাকীর্তনের কথক-গায়ক তাঁর নিজস্ব বিবরণের জোরে একটা নতুন অন্তর্ঘাত ঘটাতেন। সেই অন্তর্ঘাতের ফলে পদাবলি আর পদাবলি থাকত না, রাধাকৃষ্ণ মিথ আর রাধাকৃষ্ণ মিথই মাত্র থাকত না, চৈতন্যমিথও শুধু চৈতন্যমিথ থাকত না।

পালাকীর্তনের আখরের এই বিবরণশক্তি কিন্তু একটা ঐতিহাসিক বিবর্তনও পেয়েছিল। আমরা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কবিগান, তরজা, হাফ-আখড়াই গান, লাচারি ইত্যাদির কথা শুনেছি, যদিও তার খুব একটা বিশদ নিদর্শন পাই না। কিন্তু এইটুকু আমরা জানতে পারি যে এইসব গানে বা বিশেষত কবি ও তরজায় 'খেউড়' বলে একটি অংশ থাকত। খেউড় কখনো-কখনো আলাদা গান হিশেবেও গাওয়া হত। আর, এ-সবই ছিল পালাকীর্তনেরই নানা ভগ্নাংশ। তাতে হরপার্বতীর কাহিনীর প্রক্ষেপ যদিও ঘটত তবু তার প্রধান আধেয় ছিল রাধাকৃষ্ণের কাহিনী। অর্থাৎ পালাকীর্তন ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কবিগান-তরজা-আখড়াই-খেউড়ে এসে পৌঁছেছিল। 'খেউড়' শব্দটিকেই তো অনেকে পালাকীর্তনের প্রধান কেন্দ্র 'খেতুর' বা 'খেতরী' শব্দটির রূপান্তর বলে মনে করেন।

কবিগান-তরজা আমাদের শিষ্টসাহিত্যের ইতিহাসে বহুনিন্দিত আর 'খেউড়' শব্দটির অর্থান্তরেই বোঝা যায় আমাদের শিষ্ট সমাজে সেটা কতটাই বর্জিত। সে-বর্জন এতই সম্পূর্ণ যে 'খেউড়' গানের কোনো অবশেষও আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। একটু-আধটু যে-নিদর্শন পাওয়া যায় ও খেউড় গানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যে-দুটি-একটি রচনায় দেখা যায়—তাতেই এইটুকু বলতে লোভ হয় যে এই খেউড়েই বোধহয় আধেয় হিশেবে পৌরাণিকতার ভাঙন সম্পূর্ণ হচ্ছিল আর সেই ভাঙনের প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত ছিল এক মানবিক বিবরণ। এমনকী মাত্র শ-তিনেক বছর আগে তৈরি চৈতন্যের পৌরাণিকতাও এই খেউড়ে ভেঙে পড়ছিল। খেউড়ের এই পদটি যে চৈতন্যবিষয়ক তা না-বলে দিলে খেয়াল রাখা কষ্টকর

আলো সই, নাগর দেখিয়া বাসর ঘরে।
মন উচাটন, প্রাণ ছলছল—চিত যে কেমন করে।।
অঙ্গের সৌরভ আকুল করিল কি তার পুণ্যের জোর।
জনম সফল হইবে যখন নাগর করিবে কোর।।

চৈতন্যবিষয়ের সেই অবান্তরতার মধ্যেই বা পৌরাণিক বিবরণের সেই ভাঙনের মধ্যেই বেরিয়ে আসছে এক বিপরীত বিবরণ। সে-বিবরণে কাহিনীর কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাচনে চরিত্রের একটি ইঙ্গিত তৈরি হয়ে উঠছে। একটি মেয়ের বাচনে গাওয়া হয়।

প্রাণ, আর এক শুনো বচনে তোমার
দাঁড়ালাম কুলের বাইরে।
প্রাণ, তুমি জেনেশুনে বিরহ তুফানে
ভাসালে এ জনে ছলনা করে।।
প্রাণ, তুমি হে লম্পটো নিতান্ত কপটো
প্রকাশিলে শঠো খল আচারে।
নহে কেবা কোথা এত নিষ্ঠুরতা
করেছে সর্বথা নিজ জনারে।।

সেই মেয়েটির এই কথাগুলিতে পৌরাণিক ধাঁচ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, বাস্তব পরিস্থিতি প্রায় নিজের জোরেই ওপরে উঠে আসছে।

আমরা শুধু এইটুকু প্রমাণহীন অনুমানের দুঃসাহস করতে চাই—পালাকীর্তনের আখরের মধ্যে কথক-গায়কের বিবরণের যে-অন্তর্ঘাত ঘটেছিল, খেউড়ে হয়তো তারই একটা বিবর্তন পাওয়া যেতে পারত, হয়তো আরো একটু নির্দিষ্ট করে তা হলে দেখা যেতে পারত যে ঐ বিবরণ কালক্রমে কীভাবে ধ্বসিয়ে দিয়েছে পৌরাণিক ও মিথিক বিবরণের সব পৌরাণিকতা ও মিথিকতা আর সেই ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন এক বিবরণ কী করে তৈরি হয়ে উঠছিল। প্রমাণের অভাবে খেউড় নিয়ে মাত্র অনুমানই করা চলে কিন্তু সে-অনুমানের লোভ দুর্নিবার হয়ে ওঠে যখন দেখি বাংলা পত্রপত্রিকায় যে-সব নকশাজাতীয় রচনাকে হুতোম-আলালের পূর্বলক্ষণ বলে চেনা যায়, এই খেউড়ের মধ্যে পৌরাণিক বিবরণের ধ্বংস অনেকটাই তার সমকালীন ও তার শেষের দিকের সময়সীমা থেকে 'দুর্গেশনন্দিনী'র দূরত্ব হয়তো মাত্র বছর পঁচিশ-তিরিশ।

পালাকীর্তনের আখরের ভিতরে কাহিনীকারের বিবরণ কীভাবে তৈরি হচ্ছিল সেই অনুমানটি আগে বলে নিয়ে আমরা এখন মঙ্গলকাব্যের কিছু উদাহরণ দেখব। এতে কালানুক্রমিকতা ব্যাহত হল আর সেই কালানুক্রমিকতায় হয়তো আরো স্পষ্ট দেখা যেতে পারত যে বাংলাভাষায় প্রাক-উপন্যাস কাহিনীবিবরণ কী প্রক্রিয়ায় মঙ্গলকাব্য থেকে পালাকীর্তন হয়ে আখরে পৌঁছুল। সেই ইতিহাসটি খুব ভিতর থেকে দেখবার মত ইতিহাস নিশ্চয়ই। কিন্তু আমরা এখানে ইতিহাসের কালানুক্রমিকতার চাইতেও প্রাক-উপন্যাস কাহিনীবিবরণের লক্ষণটি চিনে নিতে চাই। পালাকীর্তন ও আখরের উদাহরণে গায়ক-কথকের নিজস্ব বিবরণের প্রক্রিয়া কীভাবে প্রতিষ্ঠিত কাহিনীতে বদল ঘটাচ্ছিল তা আগে দেখে নিয়ে সেই অভিজ্ঞতাকে আমরা মঙ্গলকাব্যে যাচাই করে নিতে পারব। মঙ্গলকাব্যে গায়ক-কথকের বিবরণের মত রচনাকারের প্রত্যক্ষ বিবরণ সহজদৃশ্য হবে না।

মঙ্গলকাব্যে প্রাক-উপন্যাস কাহিনীবিবরণের সূত্র খোঁজার শুরুতেই একটি বিষয়ে সাবধান হওয়া ভাল। এই কাহিনীবিবরণ কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলির নরখণ্ডের প্রধান কাহিনীতে খুঁজলে আমরা মঙ্গলকাব্যগুলির ওপর ভুল ভাবে ঔপন্যাসিক কাহিনীর অবয়ব আরোপ করে ফেলব। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে মুকুন্দরামকে অনেক সময়ই মধ্যযুগের ঔপন্যাসিক হিশেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে আর সেখানে বাস্তবতার উদাহরণ হিশেবে ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা ফুল্লরার বারোমাস্যার কথাও আসে। উপন্যাসের চরিত্র হিশেবে চাঁদ সদাগরও লোভনীয়। আধুনিক কালে শম্ভু মিত্র চাঁদকে নিয়ে নাটক লিখেছেন। কিন্তু সে-সবই, আমরা যা খুঁজছি তার বিপরীত সক্রিয়তা। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে আমরা উপন্যাসের আধুনিকতার যে-ধারণা পেয়েছি, পরবর্তী বাংলা উপন্যাস সেই ধারণারই পোষকতা করে গেছে। উপন্যাসের বাস্তবতা, চরিত্রগঠন, কাহিনীনির্মাণের সেই আধুনিক অভিজ্ঞতাকেই যদি মঙ্গলকাব্যের ওপর আরোপ করা যায় তা হলে মঙ্গলকাব্যের ভিতর থেকেই কোনো নাট্যকার আধুনিক নাটকের উপাদান খুঁজে পেতে পারেন, কোনো ঔপন্যাসিক আধুনিক উপন্যাসের উপাদান আবিষ্কার করতে পারেন। কিন্তু আমরা তো খুঁজছি মঙ্গলকাব্যের ভিতরই কাহিনীকারের বিবরণ কোথায় সঞ্চারিত হয়ে যেত সেই জায়গাটি, কাহিনীকারের বিবরণ প্রক্ষেপের সেই জায়গাটি থেকে উপন্যাসের আলাদা কোনো ধরণ তৈরি হয়ে উঠতে পারত কী না তার সম্ভাবনা।

মঙ্গলকাব্যের বাঁধাছকে কাহিনীকারের বিবরণের জায়গা বাইরে থেকে নির্দিষ্ট ছিল না। সে-ছক এমনই বাঁধা যে শতকের পর শতকেও তার কোনো বদল ঘটে নি, এমনকী কবিদের স্থানগত পার্থক্যও সে ছককে ততটা প্রভাবিত করতে পারে নি। এমনকী কবির আত্মজীবনী বা গ্রন্থোৎপত্তির কারণ হিশেবে যে-ব্যক্তিগতের আপাত সুযোগ ছিল—তাও ছকে বাঁধা।

আমাদের অনুমান—মঙ্গলকাব্যগুলির দেবখণ্ডেই কাহিনীকারের বিবরণের একটা গোপন পাঠ আবিষ্কার করা যায় মূল দেবকাহিনীর অন্তরালে। সেখানে পৌরাণিক কাহিনীর একটি অচেতন প্যারডির সঙ্গে মিশে যেত পৌরাণিকতার এক সমালোচনা। কাহিনীকারের বিবরণে পৌরাণিকতার বিবরণ ভেঙে যেতে থাকে আর সেই ভাঙনের ভিতর থেকেই সমালোচনার বিবরণটি বেরিয়ে আসে। তাতে হিন্দু পুরাণের দ্বারা সমর্থিত দেবদেবীর বংশপরিচয় লোপ পায়, লোপ পেতে-পেতে শেষে বিপর্যস্ত হয়ে যায় আর সেই বিপর্যয়ের ভিতর কে যে কার বাবা আর কে যে কার স্বামী, কে যে কার স্ত্রী আর কে যে কার মা—সেই সম্পর্ক খুঁজে বের করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। এমনকী দেবদেবীদের অপ্রাকৃত ক্ষমতাও প্রায় সব সময় ব্যবহৃত হয় তুচ্ছ সব কারণে।

আমরা মনসামঙ্গলের প্রাচীন সম্পূর্ণ পুঁথি বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়'-এর দেবখণ্ডের কাহিনীটিকে উদাহরণ হিশেবে নিতে পারি।

সেখানে শুরুতেই গঙ্গার সঙ্গে শিবের পৌরাণিক সম্পর্কটি ভেঙে দেয়া হয়েছে। শান্তনুর আশ্রয় থেকে তাঁর স্ত্রী গঙ্গাকে শিব নিয়ে আসেন দেবতাদের অসুরবিজয় যজ্ঞে রান্না করার জন্যে। শান্তনু অনুমতি দেন এই শর্তে যে দেবতাদের সঙ্গে রাতে থাকা চলবে না। দেবতাদের কাছে রাতে স্ত্রী রাখা নিরাপদ নয়। যজ্ঞে রান্নার কাজ সেরে গঙ্গা রাতে ফিরতে পারলেন না, শান্তনুও গঙ্গাকে বাড়িতে ঢুকতে দিলেন না, অগত্যা গঙ্গাকে শিব নিজের ঘরেই রেখে দিলেন। শিবের ঘরে গঙ্গা একদিন ধর্মের দেখা পান নেহাতই হঠাৎ। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের চাইতেও ধর্ম বড়। ফলে সবাই এসে গঙ্গার স্তব করতে লাগলেন। আর গঙ্গার এত আদরে ও সম্মানে পুলকিত শিব গঙ্গাকে মাথায় তুলে নিলেন। এর পর আর গঙ্গার দেখা পাওয়া গেল না। কাহিনীকার সম্পূর্ণ নিজস্ব এক বিবরণে শিবের জটা দিয়ে গঙ্গার মর্তাবতরণের পৌরাণিক কাহিনীকে ভেঙে দিলেন।

এরপর শিবের সঙ্গে গৌরীর সম্পর্কের পৌরাণিক কাহিনী। শিব রোজ কোথায় যান দেখতে গৌরী জেকা নদীতে ডোমনি সেজে নৌকো নিয়ে থাকলেন। যুবতী ডোমনিকে দেখে শিবের মাথা ঘুরে গেল—ডোমনিকে খুব তোশামোদ করে সহবাসে রাজি করালেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের স্ত্রীকে পরকীয়া ভেবে রতিক্রিয়া করে শিব খুব আনন্দ পেলেন কিন্তু তারপরই তাঁকে নিজের পরিচয় দিয়ে গৌরী শিবকে বামাল ধরে ফেললেন শিবের এমন কাণ্ডকারখানা হয়তো লৌকিক ধারার সঙ্গে পৌরাণিক ধারার মিশ্রণে খানিকটা গ্রাহ্যও ছিল। বিপ্রদাস শিবগৌরীর কাহিনীকে আর-এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। গৌরীকে জব্দ করার জন্যে শিব একদিন ইঁদুর হয়ে গৌরীর কাঁচুলি কেটে দিলেন তারপর সেটা রিপু করার জন্যে নিজেই কারিগর হয়ে দরজায় হাঁক দিলেন। গৌরী তাঁকে কাঁচুলি সারিয়ে দিতে বললে, কারিগর মূল্য হিসেবে রতিক্রিয়া দাবি করলেন। গৌরীকে রাজি হতে হল ও রিপুকর্মের পরে রতিকর্ম করতে হল। গৌরীর পাতিব্রত্যের পৌরাণিকতা বিপ্রদাস অনায়াসে ধ্বসিয়ে দিলেন।

এরপর মনসার সঙ্গে শিবের সম্পর্ক। শিবের কামোদ্রেকের স্থানকালভেদ ছিল না। পদ্মবনে পদ্ম তুলতে-তুলতে এ-রকম এক কামোদ্রেকে তার শুক্রবিন্দু প্রথমে পদ্মপাতায় পড়ল, সেটা একটা কাক খেল, সে হজম করতে না পেরে উগরে দিল, সেই ওগরানো শুক্র পাতালে গেল—সেখানে 'নির্মাণি' সেই ক্ষীরতুল্য শুক্র দিয়ে এক পুতুল বানিয়ে তাতে প্রাণ দিলেন। পরদিন সেই বানানো মেয়েটিকেই পদ্মবনে দেখে শিবের আবার কামোদ্রেক। মনসা তাড়াতাড়ি তাকে বাপ ডেকে বসে সেই বাপকেই শোনালেন—বাপ কী করে তার বাপ হয়েছে। শিব অন্তত এই একবার লজ্জা পেলেন। মনসা মেয়ে হয়ে শিবের সঙ্গে বাপের বাড়ি দেখতে গেল।

চণ্ডী কিন্তু কোনো সময়ই মনসাকে শিবের মেয়ে হিশেবে মেনে নেয় না—বরাবরই মনসাকে সে গোপন-সতীন ভাবে। শিবের সঙ্গে মনসাকে দেখে সে তার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার তো করলই, কুশের খোঁচায় তার একটি চোখ অন্ধ করে দিল। পরে, তৃতীয় পালায় শিব যখন সমুদ্রমন্থনের বিষ খেয়ে অজ্ঞান তখন মনসাকে ডাকা হল বিষ ঝেড়ে দেয়ার জন্যে। চণ্ডী তাকে পাঁচহাতি এক শাড়ি পাঠালেন। এমনকী মনসার যখন জরৎকারুর সঙ্গে বিয়ে তখনো চণ্ডী তাকে সাপখোপ দিয়ে এমন সাজে সাজালেন যে স্ত্রীর রূপ দেখে স্বামী ফুলশয্যাতেই সন্ন্যাস নিলেন।

আমরা দেবখণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পালার কাহিনী আর ধারাবাহিক বলছি না। কিন্তু সেখানেও অনবরত এ-রকম কাণ্ডই ঘটে যেতে থাকে। ব্রহ্মার ঔরসে দেবতাদের গাভী গর্ভবতী হয়ে যায়। সেই স্বর্গীয় গাভী কপিলা অন্য গরুদের সঙ্গে মিশে এক বামুনের ধান খেয়ে আসে। ব্রহ্মা আর কপিলার পুত্র মনুরথের খিদে পেলে মাকে না পেয়ে ক্ষীরোদসাগর শুষে খেয়ে ফেলে। কপিলা আবার নিজের বাঁটের ক্ষীরে শুকনো সমুদ্র ভরে দেয়। এক টিয়াপাখি ব্রহ্মার জন্যে তেঁতুল আনছিল। তার ঠোঁট থেকে পড়ে যাওয়ায় সেই তেঁতুলের টকে ক্ষীর সাগরের ক্ষীর জমে ক্ষীরোদ হয়ে গেল। ক্ষীরোদ দিয়ে তো জলের কাজ চলে না। তখন দেবতারা সমুদ্রমন্থন করলেন—একা-একাই, অসুরদের সাহায্য ছাড়াই। লক্ষ্মী, ধন্বন্তরী এই সব উঠল কিন্তু শিব অমৃতের ভাগ না পাওয়ায় অসুরদের ডেকে দ্বিতীয়বার সমুদ্রমন্থন করলেন ও তা থেকে যে-বিষ উঠল তা খেয়ে আসলে মরে গেলেন। শিবকে বাঁচানোর জন্যে ধন্বন্তরীর ডাক পড়ল না—পড়ল মনসার ডাক। সমুদ্রমন্থনের কারণ ক্ষীরসাগরে তেঁতুল পড়ে ক্ষীর জমে যাওয়া, দু-দুবার সমুদ্র মন্থন আর সমুদ্রের বিষ খেয়ে শিবের মরণদশা—মনসামঙ্গলের দেবখণ্ডে পৌরাণিক বীরকাহিনী এ-রকমই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে থাকল।

মনসামঙ্গলের কবি নিশ্চয়ই সচেতনভাবে পৌরাণিক বিবরণকে ধ্বসিয়ে দেন নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসামঙ্গলের এই নিজস্ব পৌরাণিক বিবরণের ভিতরে শাস্ত্র ও লোককথার এক মিশ্রণও ঘটেছে আর মহৎ ও তুচ্ছের ভিতর আধুনিক পার্থক্যের বদলে বরং একটু মাখামাখিই ছিল যেন। কিন্তু আমরা তো এমনটি ঘটার ফল কী হল তাই খুঁজছি। এখানে মনসামঙ্গলের দেবখণ্ডে কেন এমন ঘটল তার কারণ খুঁজছি না। আমরা খুঁজতে চাইছি, এমন যে-ঘটল তার ফলে দেবখণ্ডের এই রকম কাহিনীর ভিতর কাহিনীকারের কোনো বিবরণ ঢুকে পড়ল কী করে? আমরা তো দেবখণ্ডের এই কাহিনীর ভিতর থেকে, এই কাহিনীর আড়ালে-আড়ালে কাহিনীকারের সেই বিবরণ পড়ে নিতে পারি। দেবখণ্ডের এই কাহিনীবিন্যাসের ফলে শাস্ত্রীয় মহৎ আর লোকায়তিক তুচ্ছ মিশে যায়।

মনসামঙ্গলের এই বিপ্রদাসপুঁথির উদাহরণের মতই অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবির রচনায় আমরা খুঁজতে পারি—কী ভাবে 'নরখণ্ড'-এর অন্তর্গত 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ', কবির আত্মজীবনী, বেহুলার নৌকাযাত্রা, লহনা-খুলনার সাধভক্ষণ, ফুল্লরার জীবনযাপন, কালকেতুর যুদ্ধজয়—মঙ্গলকাব্যের স্টেরিওটাইপের, বাঁধাছকের অন্তর্গত হয়ে গেছে আর 'দেবখণ্ড'-এ শিবগৌরী ইত্যাদি দেবদেবীর কাহিনীর পৌরাণিক স্টেরিওটাইপ, বাঁধাছক, ভেঙে গেছে। এই মঙ্গলকাব্যগুলি তো লেখা হয় নি, গাওয়া হত। গাওয়ার রীতিপদ্ধতি স্থির ছিল। তাতে শ্রোতার একটা বিশিষ্ট ভূমিকা থাকত। শ্রোতাগায়কে মেশানো এ-গান ছিল সমষ্টির এক সমবেত উৎসব। সে-উৎসবের ফুর্তিতে 'দেবখণ্ড'-এর প্রথানুগত্যের মধ্যে, এমনকী চিরন্তন দাম্পত্যের হরগৌরী প্রতীকও ভেঙে যায়, এমনকী গৌরী-পার্বতীও শ্রোতাদের সমর্থনে খুচরো অসতীপনা করে নিতে পারে ও নীলকণ্ঠ শিব বিষের ধাক্কায় চিত হয়ে পড়ে যেতে পারে। পুরাণ যাকে সনাতন ও অপরিবর্তনীয় করে রেখেছে—গ্রাম্য মঙ্গলগানের আসরের গায়ক ও শ্রোতা তাকে নিয়েই ফুর্তিফার্তা লুটে নিতে পারে, মঙ্গলকাব্যের পালাকার সেই ফুর্তির মেজাজেই পুরাণকে ভেঙে ফেলেন আর ফলে, আমরা পেয়ে যাই মঙ্গলকবির এক মৌলিক বিবরণ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আমাদের ইংরেজপুরাণ তৈরি হয়ে গেছে, তার পৌরাণিক স্বতঃসিদ্ধ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। তাই বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস লেখেন তিনি সেই পুরাণকেই পৌরাণিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। সেখানে সমবেত উৎসবের মেজাজে পুরাণকে ভাঙা হয় না, ব্যক্তিগত অভিনিবেশে সমবেত ইচ্ছার সেই পুরাণকে গড়ে তোলা হয়। তাতে মহৎ মহত্তর হয়, তুচ্ছ তুচ্ছতর হয়—উভয়ের অন্তর্বর্তী পার্থক্য আরো নির্দিষ্ট হয়। মঙ্গলকাব্যের আসরে, কীর্তনের আখরে, এমনকী খেউড়ের রাতজাগা বাসরে—কাহিনীর অন্য এক বিবরণ তৈরি হয়ে ছিল সেই পনের শতকের বরিশাল-চট্টগ্রাম-এর বঙ্গালে, রংপুর-কোচবিহারের পৌণ্ড্রবর্ধনে, মেদিনীপুরের সমতটে, রাঢ়ে, ষোল-সতের শতকের শান্তিপুর-নদীয়ায়, আঠার-উনিশ শতকের নতুন কলকাতায়। কিন্তু আমাদের আধুনিকতা সেই সব বিবরণের মধ্যে উপন্যাসের কোনো উপকরণ খোঁজে নি। ফলে, ইংরেজি উপন্যাসের একটি বাঁধাছক আমাদের উপন্যাসের বাঁধাছক হয়ে উঠল এবং আজও পর্যন্ত তাইই একমাত্র ছক। ইংরেজি উপন্যাসের কিন্তু কোনো বাঁধাছক ছিল না—সেখানে উপন্যাস তৈরি হয়ে উঠছিল প্রাক-উপন্যাস কাহিনীর বিবরণ থেকেই, সেই প্রাক-উপন্যাস কাহিনীর বিবরণকে গ্রহণ করে, ছাপিয়ে, বাড়িয়ে, বদলিয়ে। আমাদের পক্ষে তো ইংরেজি উপন্যাসের সেই উৎসকে বাংলায় নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না, পরিবর্তে ইংরেজি উপন্যাসের একটিমাত্র ছককেই মাত্র আনা গেল। কিন্তু তাতেই জানা হয়ে গেল—এটাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস, একমাত্র এটাই উপন্যাস। বাংলায় 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত হওয়ার আগেই আমরা জানতাম উপন্যাস কী, উপন্যাস কী রকম হওয়া উচিত। কারণ, 'দুর্গেশনন্দিনী' পড়ার আগেই ইংরেজি উপন্যাস থেকে আমরা জেনেছি উপন্যাস কী, উপন্যাস কী রকম হওয়া উচিত। আমাদের শুধু অপেক্ষা ছিল এমন একটি উপন্যাসের যা পড়লে ইংরেজি উপন্যাসের মতই ভাল লাগবে। আমাদের কাহিনী ভাল-লাগার আধুনিকতা আমাদের কাহিনীবিবরণের ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ, একেবারে সম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

প্রায় শোয়া শ বছর আগের সেই বিচ্ছিন্নতা পরবর্তী সোয়া শ বছরে কাটল না। কথাসাহিত্যে যখনই আধুনিক জিজ্ঞাসার তাড়া এসেছে তখনই আবার পাশ্চাত্য উপন্যাসের অন্য কোনো মডেলের খোঁজে গিয়েছি আমরা, অথবা, যখনই পাশ্চাত্যের উপন্যাসের অন্য কোনো মডেল পেয়েছি তখন তারও একটা বাংলা সংস্করণ দেখতে চেয়েছি। 'দুর্গেশনন্দিনী'র সেই ১৮৬৫ থেকে আজকের এই ১৯৮৮ পর্যন্ত আমরা তো ইংরেজি ছাড়াও ইয়োরোপের অন্যান্য ভাষার গল্প-উপন্যাসের কিছু-কিছু পড়েছি, যদিও তাও পড়েছি ইংরেজিতেই। ইংরেজরা আমাদের যতটুকু ইয়োরোপ জানিয়েছে আমরা ততটুকু ইয়োরোপ অন্তত জেনেছি। তাই ইংরেজি গল্প-উপন্যাসের বাইরেরও কোনো-কোনো মডেল কখনো-কখনো আমরা বাংলায় নিয়ে নিতে পেরেছি। বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতা সেদিক থেকে এক দিগন্তের দিকে প্রসারিত হয়ে যাওয়ার মায়া জাগিয়েছে। কিন্তু সে-দিগন্ত কোনো কেন্দ্র থেকে পরিধির, বা পরিধি ছাড়ানো, কোনো দিগন্ত নয়, কারণ গল্প-উপন্যাসে আমাদের বাঙালি জীবনের কোনো কেন্দ্র নির্দিষ্ট ছিল না, নির্দিষ্ট হয় নি। তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে, নবীন-নবীন আধুনিকতার সঙ্গে-সঙ্গে, বাংলা গল্প-উপন্যাস বাঙালির লোকজীবন থেকে সরে গেছে। তার ভাষা থেকে ঝরে গেছে লোকবাচনের রহস্যময়তা অথচ স্পষ্টতা, লোককৌতুকের প্রবল পৌরুষ, পৌরাণিককে ভেঙে ফেলার অদম্য লোকায়ত সাহস আর কাহিনীকারের নিজস্ব বিবরণের স্পষ্টতা।

তিন

এতটা বলে ফেলার পর এখন ভয় করছে যে আমাকে ভুল বুঝবার সুযোগ আমারই দোষে হয়তো থেকে গেল। সেই জন্যে আমার কথাগুলি এক, দুই করে বলে নিতে চাই।

এক। বাংলা উপন্যাসের শুরু যে-ভাবে ঘটল তাতে বেশ কয়েকশ বছর ধরে চলে আসা বাংলা সাহিত্যের কাহিনীবিবরণের ধারার সঙ্গে বাংলার উপন্যাস-বিবরণের বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

দুই। ইংরেজি উপন্যাসের একটি বিশেষ ধরণই বাংলা উপন্যাসের মডেল হয়ে উঠেছিল।

তিন। আমার জিজ্ঞাসা প্রধানত ছিল প্রাক-উপন্যাস বাংলা কাহিনীবিবরণের সঙ্গে বাংলার উপন্যাসবিবরণের যে-বিচ্ছেদ ঘটে গেল সেই বিচ্ছেদের ঘটনাটি নিয়েই। এর বিপরীতে ইংরেজি উপন্যাসবিবরণের সঙ্গে বাংলার উপন্যাসবিবরণের যে-সংযোগ ঘটে গেল, সেই সংযোগের কাহিনীই বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস হিশেবে পরিচিত। আমি সেই সংযোগের ইতিহাস নিয়ে কোনো কথা বলি নি। সেই সংযোগের ইতিহাসও জটিল ও জঙ্গম আর নানা বিপরীত টানে সৃষ্টিশীল।

এখন আমরা এই সংযোগের টানাপোড়েনের ইতিহাসটা একটু দেখব। বঙ্কিমচন্দ্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসের ভিতর দিয়ে প্রমাণিত ঐ অপ্রামাণিক আধুনিকতা গত প্রায় সোয়া শ বছরে যে ভাবে বাংলা উপন্যাসের ভিতর দিয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে তার মাত্র কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আমরা কিছু কথা বলব।

বাংলা উপন্যাসের এই একমাত্র মডেলের বিকল্পহীন উপস্থিতির ফলে যেমন এমনকী ইংরেজি সেন্টিমেন্টাল উপন্যাসেরও বাঙালি সংস্করণ আমরা একসময় পেয়েছি, তেমনি আবার সেই মডেলের ভিতর থেকেও সেই মডেলের বিরুদ্ধে এক আপাত বিদ্রোহ কোনো-কোনো সময় দেখা গেছে।

সেই বিদ্রোহের বৈপরীত্যটি খুব স্পষ্ট। এই ধরণের বিদ্রোহে সেই মডেলের মধ্যেই, তার চরিত্র-প্রাধান্য ও কাহিনী-প্রাধান্য মেনে নিয়েই তার ভিতর এক ঘরোয়া বাঙালিয়ানা সঞ্চার করে দেয়া হল। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি উপন্যাসের মডেলে যে-জমজমাট ও দীপ্যমান বাঙালি ইতিহাস তৈরি করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' সেই মডেলের মধ্যেই তৈরি। ইচ্ছে করলে আমরা তাকে 'এপিক' মডেলও বলতে পারি। কিন্তু শরৎচন্দ্র সেই ইংরেজি-উপন্যাসের মডেলের মধ্যেই ঘরোয়া বাঙালিয়ানার এক স্বাতন্ত্র্য যেন তৈরি করতে পেরেছিলেন। কলোনির ইতিহাস গ্রহণবর্জনের কৌতুকে ঠাসা। যে-বাঙালি শাহেব হতে চেয়ে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর আত্মজীবনীকে আধুনিক মনে করল না, কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী'র সংস্কৃতনির্ভর ভাষায় ইংরেজিনির্ভর কাহিনীকে আধুনিক মনে করল, সেই বাঙালিই 'চোখের বালি', 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে', 'যোগাযোগ'-এ সেই ইয়োরোপীয় মডেলের শাণিত, প্রাসঙ্গিক ও সমকালীন প্রয়োগকে অগ্রাহ্য করল অথচ শরৎচন্দ্রের ভিতর সেই মডেলের বিরুদ্ধে যেন একটা বাঙালি বিদ্রোহের আধুনিকতা আবিষ্কার করে বসল।

১৯১৪ থেকে ১৯২৮ এই চোদ্দটি বছর বাংলা উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের রাজত্বকাল। এর ভিতর বারটি বছর রবীন্দ্রনাথ কোনো উপন্যাস লেখেন নি। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে কোনো-একটি সাহিত্যরূপে এমন দীর্ঘ ছেদ সচরাচর দেখা যায় না।.

বাংলা উপন্যাসের ফর্মের ইতিহাসের পক্ষেও এই বারটি বছর গভীর অর্থে ভরা। এই বার বছরের ঔপন্যাসিক নীরবতার অব্যবহিত আগে বঙ্কিমচন্দ্র-অবলম্বিত উপন্যাসের আধুনিক ফর্মকে রবীন্দ্রনাথ এক ভাবে বদলে নিচ্ছিলেন আর বার বছর জুড়ে শরৎচন্দ্র আর-এক ভাবে বদলে নিচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস—গোরা-চতুরঙ্গ-ঘরে বাইরে—তাঁর আত্মপরিচয় সন্ধানের অভিযান হয়ে ওঠে। এর ফলে, উপন্যাসের মডেল আর মডেল থাকে না। হয়ে ওঠে আত্মবিবরণ। রবীন্দ্রনাথ সেই মডেলকে বাঙালি ভারতীয় ইতিহাসের সন্নিহিত করতে চাইছিলেন আর শরৎচন্দ্র সেই মডেলকে বাঙালি ভারতীয় পারিবারিক জীবনের সন্নিহিত করতে চাইছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ইতিহাস ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পরিবারের মধ্যে আধার-আধেয়র সম্পর্ক নেই, কার্যকারণের সম্পর্ক নেই, ধারাবাহিকতার সম্পর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজকে আমাদের সমকালীন জীবনের কার্যকারণের সূত্রে বুঝতে চাইছিলেন ইয়োরোপীয় উপন্যাসের ফর্মেই। আর শরৎচন্দ্র ইতিহাসহীন, ইংরেজহীন সেই পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন উপাদানের ভিতর—যেমন একান্নবর্তী পরিবার, বড়ভাই-ছোটভাই সম্পর্ক, বড় পরিবারের জ্ঞাতিদের ভিতর সম্পর্ক—শাহেবিয়ানার এক বিভ্রান্ত বিপরীতে বাঙালিয়ানার বাস্তব আছে, এমন একটা মোহ তৈরি করেছিলেন। এমনকী শরৎচন্দ্র যেখানে 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন', 'বিপ্রদাস'-এর মত উপন্যাসে তত্ত্ব নিয়ে কথা বলেছেন, সে-তত্ত্বও সাবেকি বাঙালিয়ানারই পোষকতা করেছে। তার চরম উদাহরণ হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শ্রীকান্ত'। সেখানে পিয়ারী বাইজি থেকে কমললতা পর্যন্ত সেই কাল্পনিক শাহেবিয়ানার বিরুদ্ধে কাল্পনিক সাবেকি বাঙালিয়ানারই উপস্থাপন।

অথচ বঙ্কিম যে-মডেল নিয়েছিলেন, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ফর্মেই তা সবচেয়ে প্রকট। কারণ, বঙ্কিমের ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসা ছিল। তাঁর চরিত্র ও কাহিনীকে তার অনুকৃত মডেলের চৌহদ্দির মধ্যেও সেই জিজ্ঞাসারই সংলগ্ন থাকতে হয়েছে। শরৎচন্দ্রের কোনো ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসা নেই—তিনি ইতিহাসের বিরুদ্ধে আপাতবিদ্রোহে এক বাস্তব গড়ে তুলতে চান কিন্তু সে-বাস্তবকে গড়ে তোলেন ঐ মডেলের অন্ধ অনুকরণেই। তাই তাঁর উপন্যাসের পরিমণ্ডলে ইয়োরোপীয় বা ইংরেজি উপন্যাসের মডেলে কোনো তত্ত্ব বা ইতিহাস থাকে না, থাকে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের আবেগ আর সে-আবেগ বেরিয়ে আসে ব্যক্তিসম্পর্কহীন সংলাপের পর সংলাপে। কাহিনীকারের যে-বিবরণ ছাড়া উপন্যাস, উপন্যাস হয়ে ওঠে না—শরৎচন্দ্রে সেই বিবরণ আসে মন্তব্য হিশেবে। সে-মন্তব্যের সঙ্গে পাঠকের দ্রুততম মতের মিল ঘটে যায়। শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান সংলাপ। অথচ সে-সংলাপ চরিত্রের ব্যক্তিত্বে তৈরি নয়, চরিত্রের শ্রেণী দ্বারা তৈরি। বড়বৌয়ের যেমন কথা বলা উচিত সব উপন্যাসের বড়বৌরাই তা বলে, কখনো-বা সেই বড়বৌ মেজদিদি, কখনো বড়দিদি, কখনো বৌদিদি। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক সেখানে কখনো কোনো ইতিহাসের পটভূমিতে স্থির হয় না, স্থির হয় সেন্টিমেন্টাল নাটকীয়তায়। সেই নাটকীয়তার প্রশ্রয় ঐ মডেলের মধ্যেই ছিল, শরৎচন্দ্র ঐ নাটকীয়তার সবটুকু সুযোগ নেন কিন্তু তা যেন আপাতত হয়ে যায় ঐ মডেলেরই বিরুদ্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির শ্যাহেব হওয়ার তাড়নায় বাংলা উপন্যাসকে ইংরেজি উপন্যাসের ছাঁচে ঢালেন আর শরৎচন্দ্র বাঙালির বাঙালি হওয়ার তাড়নায় ইংরেজি উপন্যাসের সেই ছাঁচটিকে বাঙালির পারিবারিক জীবনেরই ছাঁচ করে তোলেন।

বাংলা উপন্যাস চর্চায় কখনোই কিন্তু পূর্বতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় নি। কেউ এ-কথা কখনো বলেন নি যে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে যে-সীমাবদ্ধতা তৈরি করে ফেলেছেন, তাঁরা তা থেকে উপন্যাসকে বের করে আনতে চান। আসলে, তেমন কোনো বিদ্রোহের উপাদানই ছিল না—ঔপন্যাসিকরা প্রত্যেকেই তো কাজ করছেন একটিমাত্র ইংরেজি-ইয়োরোপীয় মডেলে। তাই প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব যখন কথাসাহিত্যে আধুনিকতার কথা ভাবেন তখন তাঁরা তাঁদের পূর্বগ ঔপন্যাসিকদের অনাধুনিক বলে ঘোষণা করেন না। তাঁরা ঘোষণা করেন যে হামসুন, গোর্কি ও লরেন্সকে তাঁরা বাংলা উপন্যাসে আনবেন। বা, যখন আমাদের কোনো-কোনো ঔপন্যাসিকের মনে হয়েছে যে বাইরের ঘটনা নয়—মনের ভিতরের ঘটনাস্রোতের বিবরণ দিয়েই উপন্যাস লেখা উচিত, তখনো তাঁরা কিন্তু এটা বলেন না যে বাংলা ভাষার ঔপন্যাসিকরা এতকাল তা করেন নি, বরং তাঁরা বলে বা না-বলে ভার্জিনিয়া উলফ, জেমস জয়েসকে বাংলায় আনতে চান। সেই প্রক্রিয়ায় 'একদা'র অমিত বা 'অন্তঃশীলা'র খগেনবাবু বাংলা উপন্যাসের বৈচিত্র্য বাড়ায় বটে কিন্তু তাঁদের চৈতন্যবিবরণের সেই অনুশীলনও তো বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশিত পথেই ঘটছে। বা, আরো অনেক পরে কমিউনিস্ট লেখকরা বাস্তবতার আরো এক আলাদা নিরিখের প্রয়োজন যখন বোধ করেছিলেন তখনো তাঁরা কিন্তু বলেন নি যে বাংলা উপন্যাসের বাস্তবতাচর্চার অভাব কোথায় ছিল। তাঁরা সেই বাস্তবতার অন্য নিরিখ খুঁজেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহীত 'সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা'র দার্শনিক সূত্রের মোড়কে রাজনৈতিক সূত্র দিয়ে। সেখানেও বাংলা উপন্যাসের গতিতত্ত্বের প্রবণতা ও যুক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে উপন্যাসের আকৃতি-প্রকৃতি স্থির হয় নি।

তাই বাংলা উপন্যাসের ফর্ম বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বাঙালি ঔপন্যাসিক কোন ধরণের পাশ্চাত্য উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন তার ওপর। বাস্তবতার স্তরান্তর খোঁজার তাড়না, সে-তাড়নায় কখনো-বা যান্ত্রিক কৃত্রিম উপায় খোঁজা, তার প্রতিক্রিয়ায় ফ্যান্টাসিতে পরিত্রাণ, সেখান থেকে আবার বাস্তবতার আর-এক নকশার সন্ধান—এমন কার্যকারণের পরম্পরা বাংলা উপন্যাসে নেই।

আমি জানি, বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার যে-চেহারাটিকে আমি বুঝে নিতে চাইছি, তার পক্ষে সবেচেয়ে বিপজ্জনক প্রশ্নটির সম্মুখীন আমি এখনো হই নি। আধুনিকতার এই নকশায় আমরা কী ভাবে বুঝে নেব তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ ও আরো পরবর্তী সতীনাথকে?

একটি কথা পরিষ্কার করে নেয়ার জন্যে এই বিপজ্জনক মুহূর্তটি পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করছি। আমরা বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার যে-চেহারাটি দেখছি তা একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া আর লেখকের ব্যক্তিগত সিদ্ধি এক কথা নয়। যাকে আমরা উপন্যাসে আধুনিকতার ভ্রান্তচেতনা বলেছি, সেই ভ্রান্তচেতনা সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাসের বেশ ক-জন ঔপন্যাসিক জবরদস্ত হাতে টেকনিক আয়ত্ত করতে পারেন ও বাংলায় বেশ কয়েকটি ভাল উপন্যাস লেখা হয়ে যেতে পারে। আবার বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক ও সতীনাথের ব্যক্তিগত সিদ্ধি সত্ত্বেও উপন্যাসের আধুনিকতার জন্মবিভ্রান্তি মিথ্যা হয়ে যায় না। আবার উপন্যাসের আধুনিকতার জন্মবিভ্রান্তি সত্ত্বেও এঁরা কখনো-কখনো সৃষ্টির বেগে ও বিষয়ের চাপে এক বিকল্পকে প্রায় গ্রাহ্য করে তোলেন।

এই শেষোক্ত চারজনের রচনাবলিতেও যখন আমরা এই ব্যক্তিনিরপেক্ষ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া লক্ষ করতে চাই তখন কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কীর্তিকে আমরা ইয়োরোপীয় উপন্যাসের পরিধির বাইরে বিচার করতে পারব? এই প্রবল শক্তিমান ঔপন্যাসিকের জন্যে কোনো ইয়োরোপীয় মডেল প্রয়োজন হয় নি—তিনি সেই মডেলকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন তাঁর ঔপন্যাসিক কল্পনার তুঙ্গ গতিতে কিন্তু মানিকের উপন্যাসের মানুষজন তাদের সম্পর্ক গড়ে তোলে ইয়োরোপীয় উপন্যাসের তৎপরতার নিয়মেই।

মানিকের 'পদ্মানদীর মাঝি'তে বাংলা কথ্যবাচনের এমন এক গতিময়তা আবিষ্কৃত হয়েছিল যা উপন্যাসের এক ভিন্নতর আধুনিক নিরিখকে প্রায় আকার দিয়ে ফেলেছিল। পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক ভাষা সেখানে উচ্চারিত হয়েছিল বাংলার এক নিজস্ব ল্যান্ডস্কেপে। মানিকের পদ্মা ঠিক কোন জেলার পাশ দিয়ে গেছে তা খুব নির্দিষ্ট করা যায় না, এই উপন্যাসটির বাচনেও ঠিক অতটা নির্দিষ্টতা নেই যাকে বলা যায় দলিলি তথ্য। কিন্তু নেই বলেই, বা না-থাকা সত্ত্বেও মানিক বাংলাদেশের ঐ নিজস্ব ল্যান্ডস্কেপ ও নিজস্ব উপভাষার এক এমন ভূমি রচনা করেন যে সেই ভূমিতে হোসেন মিয়া আর পাশ্চাত্য উপন্যাসের তুলনীয় প্রসপেক্টর থাকে না—বাধ্যতই হয়ে পড়ে কুবের-কপিলার স্বস্থানবাসী।

মানিক, বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করে বাংলা উপন্যাস অন্তত বারকয়েক বিষয়ের চাপে আধুনিকতার স্থিরীকৃত মডেল থেকে প্রায় বেরিয়ে আসছিল। তিনজনের ক্ষেত্রেই ল্যান্ডস্কেপে বিচরণশীল মানুষ এই ভাঙনটি প্রায় ঘটাতে পারছিল। মানিকে একবার 'পদ্মা নদীর মাঝি'তে ও তারাশঙ্করে প্রায় তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনেই এই ল্যান্ডস্কেপ অতিনির্দিষ্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিক তাঁর সারা সাহিত্যজীবনে আর-কখনো ল্যান্ডস্কেপের ঐ নির্দিষ্টতার দিকে ফিরে যান নি। ফলে, 'পদ্মানদীর মাঝি'তে পূর্ববঙ্গীয় ভাষা, ল্যান্ডস্কেপ আর সেই ভাষা ও ল্যান্ডস্কেপ ব্যবহারকারী মানুষ বিকল্প এক আধুনিকতার আভাস দিয়েই ঐতিহাসিক স্মারক হয়ে থাকে, সেই আধুনিকতার বিকল্প ধারা তৈরি করে তুলতে পারে না। মাত্র একটি উপন্যাসে সে-আধুনিকতার প্রামাণিকতা আমরা পেতে পারি মাত্র—'পুতুলনাচের ইতিকথা' বা তাঁর ঐ সময়ের লেখা ছোটগল্পগুলিতে। কিন্তু ফর্মের দিক থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ ছিল বিপরীত। উপন্যাস যত এগিয়েছে গাওদিয়া তত বেশি করে অনির্দিষ্ট হয়ে গেছে আর প্রধান হয়ে উঠেছে গাওদিয়ার এক রূপকার্থ, সেখানকার নরনারীর অন্তর্গত সম্পর্ক। ছোটগল্পগুলিতে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের জনশ্রুতিমাত্র নেহাত লেখকের কলমের পেশিশক্তিতে শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পেরেছে। সেখানে মানিক অনেক বেশি পশ্চিমি। উপন্যাস হিশেবে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' আমাদের সাহিত্যে ঔপন্যাসিক প্রয়াসের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তো বটেই বরং এর ঔপন্যাসিক সক্রিয়তায় কাহিনীকারের ভূমিকা যে-পাশ্চাত্য উপন্যাসের কাহিনীকারের ভূমিকার মডেলেই নিয়ন্ত্রিত সেই পাশ্চাত্য উপন্যাসেও এ-উপন্যাসের শিল্প-সমতুল খুঁজে পাওয়া বেশ দুর্ঘট। উপভাষা আর ল্যান্ডস্কেপের যে-নির্দিষ্টতা 'পদ্মানদীর মাঝি'তে আধুনিকতার নতুন বিকল্পকে প্রায় গ্রাহ্য করে তুলেছিল, 'পুতুল নাচের ইতিকথা' সেই নির্দিষ্টতার অভাবেই উপন্যাসে আধুনিকতার স্বীকৃত মডেলেরই স্তরান্তর ঘটাল মাত্র, নতুন আধুনিকতাকে সম্প্রসারিত করতে পারল না। মানিকের বিপরীতে তারাশঙ্কর কিন্তু তাঁর বাঙালি ল্যান্ডস্কেপে এতই অবিচ্ছেদ্য রকম বাঁধা যে এমনকী তাঁর শেষ জীবনের 'সপ্তপদী' 'বিচারক' এ-সব বড় গল্পগুলিতেও তিনি একবার সেই ল্যান্ডস্কেপ ছুঁয়ে না-গেলে যেন স্বস্তি পান না। তারাশঙ্করের ছোটগল্পে তো নিশ্চয়ই, উপন্যাসেও, তাঁর চরিত্রগুলি রাঢ়ের ভাষা ছাড়া কথা বলতে পারে না যেন। সেখানে, এই প্রথম দিকের গল্পগুলিতে, বিশেষত 'কবি'-তে, এমনকী 'রাইকমল'-এর মত কাঁচালেখাতেও বিষয়ের অন্তর্চাপে উপন্যাসের প্রচলিত আধুনিকতার আধার ফেটে যাচ্ছিল। পাশ্চাত্য উপন্যাসের মডেলে 'রাইকমল', 'কবি', 'অগ্রদানী', 'তারিণী মাঝি', 'কালাপাহাড়', 'কামধেনু', 'কান্না' আঁটছিল না! সেখানে প্রায় ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকেই যেন গরুমোষ উঠে আসে, সেখানে নদীনালা প্রায় যেন মঙ্গলকাব্যের মতই হঠাৎ-হঠাৎ দৈবী হয়ে ওঠে, আর কাহিনীকারের গলায় আমরা প্রায় যেন শুনে ফেলি সেই প্রাচীন গায়ক-কথকের কণ্ঠস্বর।। তারাশঙ্কর এই বিকল্প আধুনিকতাকে সবচেয়ে বেশি গ্রাহ্য করে তুলেছিলেন।

কিন্তু তাঁর প্রধান সাহিত্যকর্মগুলিতে যখনই তিনি এই বিকল্প-আধুনিকতাকে একটা আকার দিতে চান তখনই তিনি উপন্যাসের স্থিরীকৃত মডেলের ভিতর ঢুকে যান। 'গণদেবতা'য় তারাশঙ্কর শুরু করেন এক আধুনিক ঐতিহাসিকতায়—গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ভেঙে যাচ্ছে, গ্রামের কামার-কুমোর শহরে চলে যাচ্ছে, স্বাধীনতা-আন্দোলনের নিজস্ব নিয়মে গাঁয়ের দেবু মাস্টার নতুন নেতা হয়ে ওঠেন। কিন্তু গ্রাম, অর্থনীতি, স্বাধীনতা আন্দোলন ও নতুন নেতৃত্ব থাকা সত্ত্বেও তারাশঙ্কর সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের যে-দ্বন্দ্ব তাঁর এই ও অন্যান্য গল্প-উপন্যাসের কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিত হিশেবে ব্যবহার করেন—সেই দ্বন্দ্বের মধ্যে কোথাও সাম্রাজ্যবাদ থাকে না। বাংলার রাঢ়ের সামন্ততন্ত্র যেন হয়ে উঠতে চায় ইয়োরোপীয় সামন্ততন্ত্রেরই এক দেশীয় সংস্করণ—তার ওপর আরোপিত হয় এক কৃত্রিম গৌরববোধ, তার পরিপ্রেক্ষিত হয়ে ওঠে যেন অতীতের কোনো ঐতিহাসিক ভূমিকা। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারাশঙ্করের জমিদাররা তো বড় জোর চিরস্থায়ী বন্দবস্তের অনুপস্থিত জমিদার, যারা নিলামে ওঠা জমিদারি কিনে জমিদার হয়েছে আর জমিদারিতে শাহেব কনট্রাক্টার লাগিয়ে শাহেবদের কাস্‌ল, ম্যানশন ইত্যাদির ছবি দেখে বাড়ি বানিয়েছে। এমনকী, সে-জমিদারদের কারো-কারো যদি মোগলাই অতীত থেকেও থাকে ও তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের চারিত্র যদি কিছু অর্জিত হয়েই থাকে—সে-অতীত ও চারিত্রও তো উপে গেছে প্রায় পৌনে দুশ বৎসরের ইংরেজশাসনে। তারাশঙ্করের সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বের ভিতর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ নেই যারা আমাদের সামন্ত্রতন্ত্রকে ধ্বংস করেও নতুন এক সামন্ততন্ত্র তৈরি করে দেয়, যারা আমাদের ধনতন্ত্র তৈরি করে দিয়েও সে-ধনতন্ত্রকে ব্যাহতবিকাশ করে রাখে। তাই, প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রতিনিধিচরিত্র তারাশঙ্করের 'গণদেবতা'তে এক নতুন পৌরাণিকতা পায় যদিও সে-প্রতিনিধি কার্যত ফৌত হয়ে গেছে কয়েক শ বছর আগে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মত উপন্যাসেও এই ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতার দ্বন্দ্ব উপন্যাসের কাহিনীর প্রধান আধার হয়ে ওঠে। অন্তেবাসী জীবনকে তারাশঙ্কর নথিভুক্ত করেন যে-তথ্যনিষ্ঠায় তা আমাদের উপন্যাসকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে কিন্তু যে-কল্পনার আধারে তিনি এই তথ্যকে সাজান তা বড় বেশি সেই প্রতিষ্ঠিত মডেলনির্ভর। নসুবালা বা বিপ্রদাসের মত চরিত্রও, আমরা তো এখন জানতে পেরেছি, তাঁর কল্পনার সৃষ্টি নয়, সংগৃহীত তথ্য। অথচ সুচাঁদ, বনোয়ারি আর করালী তাঁর প্রধানত বানানো চরিত্র। এখন ভাবলে কী রকম বিচুল লাগে যে দুর্ভিক্ষ-যুদ্ধ পার হয়ে ১৯৪৮ সালে লেখা উপন্যাসে তারাশঙ্করকে করালী-বনোয়ারীর ভিতরের ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতার সংঘাতের কাহিনীগত প্রমাণ জোগাড় করতে হল—রেলওয়ে কারখানার কাজ দিয়ে আর রেলওয়ে শেডে কাহার মেয়ের কাজে যাওয়ার ঘটনা দিয়ে? রাঢ়ের আদিবাসী তো যুদ্ধে-দুর্ভিক্ষে আরো অনেক বাস্তব অর্থে ততদিনে ইতিহাসকে চিনেছে।

তারাশঙ্কর সবচেয়ে স্পষ্টতায় উপন্যাসের এক বিকল্প বিবরণ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। তারাশঙ্করই সেই বিকল্প বিবরণকে বিভ্রান্ত ইতিহাসের আধারে আবার প্রথায় ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন। ভবিষ্যতে কোনোদিন যদি সৃষ্টিঅভিযানের যুক্তিহীন নিজস্বতায় বাংলা উপন্যাসের স্বাবলম্বী এক আধুনিকতা তৈরি হয়ে ওঠে তা হলে সে-আধুনিকতা সবচেয়ে নিকট আত্মীয়তা বোধ করবে তারাশঙ্করেরই সঙ্গে।

তারাশঙ্করে ল্যান্ডস্কেপ অত নির্দিষ্ট, ভাষা এত আঞ্চলিক, ঐ ল্যান্ডস্কেপ ও ভাষা ব্যবহারকারী মানুষ অত বেশি স্থানিক অথচ যে-ইতিহাসে তিনি ঐ ল্যান্ডস্কেপ, ঐ ভাষা আর ঐ মানুষকে স্থাপন করেন, তা দেশকালনিরপেক্ষ এক ইতিহাস। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি তেমনি দেশকালনিরপেক্ষ হয়ে যায়—আর তাতে তিনি স্থাপন করেন ল্যান্ডস্কেপকে যা খুব বেশি নির্দিষ্ট নয়, ভাষাকে যা খুব বেশি আঞ্চলিক নয়, আর মানুষকে যাঁরা খুব বেশি স্থানিক নন। তারাশঙ্করের লেখায় 'ইতিহাস' তাঁর বিকল্প আধুনিকতাকে মডেলের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। বিভূতিভূষণে 'প্রকৃতি' তাঁর বিকল্প আধুনিকতাকে মডেলের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে, অন্তত সেখানে, যেখানে তিনি মডেল থেকে বেরিয়ে এসেছেনই প্রায়। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'তে জীবন-উপন্যাসের পাশ্চাত্যমডেলকে প্রায় স্পষ্ট চিনে নেয়া যায়, যেমন বিভূতিভূষণের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'অনুবর্তন'—এই ধরণের উপন্যাসে সামাজিক নথিভুক্তির কাহিনীকে।

কিন্তু বিভূতিভূষণে এই 'প্রকৃতি' তাঁর মানবিক বিবরণের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে—প্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেন এক বিরোধিতাই ব্যাপ্ত হয়ে যায় তাঁর উপন্যাসগুলির শরীরে, শরীরের অঙ্গসংস্থানে। বিভূতিভূষণ ডিটেলসের প্রতি একই নিষ্ঠায় আমাদের বাঙালি জীবনের আটপৌরে নিসর্গকে ও আমাদের আটপৌরে বাঙালি জীবনকে তাঁর উপন্যাসে আনেন—ঔপন্যাসিকের বিবরণের সূত্রে। বিভূতিভূষণে ঔপন্যাসিকের বিবরণ প্রায় সবচেয়ে স্পষ্ট, সে-বিবরণকে কখনো তিনি চাপতে চান না, বরং, তাঁর ডিটেলস প্রামাণিক হয়ে ওঠে এই বিবরণেরই জোরে। এইখানেই বিভূতিভূষণের ফর্ম বা টেকনিক বাংলা উপন্যাসের স্থিরীকৃত মডেলকে প্রায় ভেঙে দেয়। তাঁর ডিটেলস-এ স্থানিক প্রামাণিকতা তুলনায় কম। কিন্তু যে-কোনো স্থান, যে-কোনো মানুষ, যে-কোনো স্থানের সঙ্গে যে-কোনো স্থানের সম্পর্ক, যে-কোনো মানুষের সঙ্গে যে-কোনো মানুষের সম্পর্ক এমন ডিটেলস-এ তিনি তৈরি করে তোলেন যে সেই বেঁচে-থাকাটাই হয়ে ওঠে এক আরোপিত গল্পের প্রতিস্পর্ধী। তাঁর উপন্যাসগুলোতে, বিশেষ করে ছোটগল্পে, আমরা প্রায়ই দেখি কাহিনী এগয় কখনো সন্নিহিত নিসর্গকে ধরে, কখনো সন্নিহিত মানুষকে ধরে। তাঁর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মুহূর্তে এই নিসর্গ আর মানুষ অন্বিত হয়ে ওঠে—'পুঁইমাচা' গল্পটির নৈসর্গিক-মানবিক এক হয়ে যায়। আবার তাঁর দুর্বলতার চিহ্নও হয়তো নিসর্গ আর মানুষের ভিতরে এক দোটানায়।

আমি বিভূতিভূষণের 'প্রকৃতি' আর 'নিসর্গ' কথাটিকে ইতিমধ্যেই দুই আলাদা অর্থে ব্যবহার করে ফেলেছি। 'নিসর্গ' আর 'জীবন' বিভূতিভূষণের উপন্যাসের প্রত্যক্ষ উপকরণ। 'প্রকৃতি' তার ওপর এক আরোপিত তত্ত্ব বা ধারণা। কারণ বিভূতিভূষণের একটা আধার প্রয়োজন ছিল। তিনি 'প্রকৃতি' সম্পর্কিত নানা বোধ-উপলব্ধির কথায় সেই একটা আধারকে মাঝেমধ্যে তৈরি করে ফেলতেন। যে-আটপৌরে নিসর্গ ছিল বিভূতিভূষণের উপন্যাসের বিষয় তা ঐ উপন্যাসের আটপৌরে জীবনকে অনিবার্য ফ্রেম দিতে পারে বটে কিন্তু বিভূতিভূষণের প্রকৃতিতত্ত্বের দার্শনিকতাকে ভিত্তি দিতে পারে না। তাই বিভূতিভূষণের নিসর্গের প্রাত্যহিকতার সঙ্গে তাঁর প্রকৃতিতত্ত্বের দার্শনিকতার একটা সংঘাত তাঁর উপন্যাসগুলিতে পড়া যেতে পারে।

প্রায় সমতুল্য সংঘাতই পড়া যায় উপন্যাস-ছোটগল্পে মানবিক ডিটেলসের সঙ্গে অনুপস্থিত বৃহত্তর ইতিহাসের। বিভূতিভূষণে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বা ইতিহাস প্রায় নেইই বলা যায়। যা আছে তা শুধু কাহিনীর অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ খানিকটা ছকে দেয় মাত্র। কিন্তু তাঁর চরিত্রগুলির জীবনযাপন হয়ে ওঠে ইতিহাসের মতই তথ্যনির্ভর, ইতিহাসের মতই কালানুক্রমিক। সেখানে জীবনযাপনের দৈনন্দিন হয়ে ওঠে জীবনযাপনের নিয়ন্ত্রক ইতিহাসের প্রতিস্পর্ধী।

সে-কারণেই প্রকৃতিমুগ্ধ বলে নন্দিত আমাদের এই লেখকের উপন্যাসগুলিতে সবচেয়ে বেশি পেশার মানুষ ও সবচেয়ে বেশি পেশাহীন মানুষ জায়গা পেয়েছে—পরাধীন দেশে যতটা পেশার বৈচিত্র্য সম্ভব ও যে-পেশাহীনতা স্বাভাবিক। তার একটা তালিকা তৈরি করলে হয়তো দেখা যায় সামন্ততন্ত্রের আরোপিত গৌরবরিক্ত, ধনতন্ত্রের আরোপিত ভূমিকারিক্ত, এমনকী শ্রেণীসমাজের আরোপিত বিভাগরিক্ত মানুষের এক আনুভূমিক সমাবেশ। সাম্রাজ্যবাদ এ-রকম আনুভূমিক সমাবেশ ঘটায়—এমন কোনো সচেতন সিদ্ধান্ত ছাড়াই বিভূতিভূষণে এই সমাবেশ ঘটে যায়।

আবার, এই সঙ্গে মিলেমিশেই এ-লেখকের গল্প-উপন্যাসের অজস্রতায় ছড়িয়ে থাকে বাঙালি পারিবারিক নিসর্গের অসংখ্য গাছগাছালি, লতাপাতা, পাখ-পাখালি। তারা বৈচিত্র্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব জটিল নয়, সংখ্যায়ও খুব বেশি নয়—একই বাঙালির গ্রামীণ, অর্ধ-গ্রামীণ নিসর্গে আর কত বৈচিত্র্যই-বা থাকতে পারে? কিন্তু সেগুলির একটি তালিকা তৈরি করলে ও একটি বিষয় কতবার কত প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে তারও গণনা থাকলে দেখা যেত কৃষিপণ্যের বাজারের বাইরে বা কৃষির পণ্যনির্ভরতা সত্ত্বেও অন্নাভাবক্লিষ্ট বাঙালি মানুষ শুধু খিদে মেটাবার প্রয়োজনে কতটাই নির্ভর করে থাকে এই নিসর্গের ওপর। 'পরাধীনতা' এখানে কার্যকারণে উপন্যাসের সঙ্গে গ্রথিত নয়—জীবনযাপনের একেবারে ওতপ্রোত। কোনো 'ইতিহাস' বা কোনো 'চরিত্র' এখানে আরোপিত নয় বলেই বাঙালি মানুষের জীবনের এমন স্বচ্ছ বিবরণ সম্ভব।

অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার একটা আবিষ্কার সঞ্চিত আছে বিভূতিভূষণের এই বিপুল তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতিতে, বিভূতিভূষণের এই ডিটেলসভিত্তিতে, বিভূতিভূষণের এই পরোক্ষ উপস্থাপনে যেখানে প্রতিপক্ষ উল্লেখিত নয়, কিন্তু প্রতিপক্ষের কথা বাদ দিয়ে যে-উপস্থাপনাকে বোঝা যায় না। বিভূতিভূষণ বোধহয় তাঁর বিবরণে সবচেয়ে নির্মমভাবে পুরাণ ভাঙেন আর সবচেয়ে মমতায় নতুন পুরাণ গড়ার রশদ সাজান।

বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার সংজ্ঞাবিভ্রাট নিয়ে আমার যুক্তিকে সমকালীন পর্যন্ত টেনে আনার প্রয়োজনে আমি আর তিনজন মাত্র ঔপন্যাসিকের উল্লেখ করছি; যাঁরা প্রধানত স্বাধীনতা-উত্তর কালে লিখেছেন ও যাঁরা সচেতনভাবে চেষ্টা করেছেন আমাদের উপন্যাসের প্রধান মডেলকে ভাঙতে। তাঁদের মধ্যে প্রধানতম সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসকল্পনা গড়ে উঠেছিল আমাদের পরাধীনতার বিষয়ে প্রখর সচেতনতার ভিত্তিতে। তাঁর প্রধান দুটি উপন্যাসে, 'জাগরী' ও 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ তাই ঔপন্যাসিকের বিবরণ কোনো কাহিনীবিবরণের আওতার মধ্যে থাকে নি, বরং ঔপন্যাসিকের বিবরণই কাহিনীবিবরণকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। 'জাগরী'র ফর্ম বলতে যে-উত্তমপুরুষের আত্মসংলাপ বোঝায়—তা ঔপন্যাসিকের এই বিবরণের জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' ও রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'র আত্মজীবনকথার পর্বভাগ থেকে আলাদা। 'ঘরে বাইরে'তে নিখিলেশ, সন্দীপ ও বিমলা আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনটি আলাদা বিবরণের স্বাতন্ত্র্যে এক বহুস্বর তৈরি করে তুলতে পারত, কিন্তু তা করে নি, কারণ সেখানে লেখকের বিবরণ অন্যান্য সব স্বরকে নিয়ন্ত্রণ করে। সন্দীপ সেখানে তার নিজস্ব বিবরণের প্রতিনিধি নয়, ঐ বিবরণ সম্পর্কে লেখকের সমালোচনার প্রতিনিধি। তাই 'ঘরেবাইরে'র আত্মোক্তি উপন্যাসের কাহিনীর প্রয়োজননির্ভর মাত্র। 'জাগরী'তে প্রতিটি চরিত্রের নিজস্ব বিবরণ নিজস্ব এমন যুক্তিতে লেখা হচ্ছে যে-যুক্তি ঐ বিবরণকে এক স্বাবলম্বন দেয়। 'জাগরী' তাই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু মত বহু পথের দলিল হয়ে উঠতে পারে একটি পরিবারের রক্তের সম্পর্কের মানুষজনের অন্তর্সম্পর্কের কাহিনীর আধারে। দেশ এমন করে ব্যক্তিগত চেহারা কি আর-কোনো বাংলা উপন্যাসে নিয়েছে? বাঙালির যে-ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র খুঁজছিলেন ইংরেজি উপন্যাসের বৈভব আর গৌরবের কৃত্রিম মডেলে, সেই ইতিহাস সতীনাথ খুঁজে পেলেন তাঁর সমকালীনের রাজনীতি আর মানুষজনের ইতিহাসে আর ব্যক্তিগতের এক সমুদ্রমন্থনতুল্য আবর্তে। আবার, একই সঙ্গে শরৎচন্দ্র যে-বাঙালি পারিবারিক কাহিনীকে ইংরেজি উপন্যাসের আধুনিকতার মডেলেই ইতিহাসের প্যারডি করে তুলেছিলেন, সতীনাথের 'জাগরী' সেই বাঙালি মধ্যবিত্তের পারিবারিক কাহিনীরই সত্যিকারের আধার হয়ে উঠল।

'জাগরী'তে বিষয়ই ফর্মকে নতুন আধুনিকতার সম্পূর্ণতা দিয়েছে, 'ঢোঁড়াই চরিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানস'-এ ফর্মই বিষয়কে নতুন আধুনিকতার আকার দিয়েছে। 'রামচরিতমানস'-এর কাহিনীর আদলে অন্ত্যজ শ্রেণীর একটি পথের ছেলেকে নিয়ে যে-ঔপন্যাসিক বিবরণ সতীনাথ তৈরি করলেন তাতে আমাদের বাংলা উপন্যাসের স্বীকৃত ফর্ম প্রত্যাখ্যাত হল আর প্রস্তাবিত হল কাহিনীর এক নতুন বিন্যাস। সে-বিন্যাস সম্ভব হল এই কারণে—সতীনাথের যে-ঔপন্যাসিক বিবরণ তৈরি হয়ে উঠেছিল তা 'রামচরিতমানস'-এর লোকায়ত কাহিনী বিস্তার ছাড়া আধেয় পেত না। আজ যেন মনে হয়, 'রামচরিতমানস'-এর চেহারাটার ছাপ আরো একটু কম থাকলে ক্ষতি ছিল না, ঢোঁড়াই তার নিজের জোরেই রামচরিতের প্রতিস্পর্ধী হতে পারত। এ-উপন্যাসের মহত্ত্বের কথা আবার বলা বাহুল্যমাত্র যদিও সে বাহুল্যও আনন্দেরই অভিজ্ঞতা। কিন্তু আমি ঢোঁড়াই পাঠ করে যে-অভিজ্ঞতার স্বাদ বারবার পেতে চাই তা হল সতীনাথের ঔপন্যাসিক কল্পনার স্ববিরোধিতাহীন স্বাবলম্বন ও সম্পূর্ণতা। সেই ঔপন্যাসিক কল্পনার স্বাবলম্বন ও স্বায়ত্তশাসনের জোরেই তাঁর নিজের ঔপন্যাসিক বিবরণ এমন প্রামাণিক হয়ে উঠতে পেরেছে। ঘটনাটা এ-রকম নয় যে 'রামচরিতমানস'-এর মডেলটা তিনি গ্রহণ করেছেন মাত্র—তা হলে সেটাও হত একটা কুশলতামাত্র। ঢোঁড়াইয়ের চরিত্রের ভারতীয় এপিকতা রামচরিতের আধারে ছাড়া ধরে না—এই আবিষ্কারের মধ্যেই আছে ভারতীয়তা সম্পর্কে এক নতুন আধুনিকবোধ, ঢোঁড়াই সম্পর্কে এক নতুন আধুনিকবোধ ও উপন্যাস সম্পর্কে এক নতুন আধুনিকবোধ।

আমি আর-দুজন লেখকের কথা উল্লেখ করতে চাই, তাঁরা হলেন কমলকুমার মজুমদার ও জীবনানন্দ দাশ। যদিও জীবনানন্দ কিছু উপন্যাস ১৯৩৬-নাগাদও লিখেছিলেন, কিন্তু ঔপন্যাসিক হিশেবে তাঁর প্রধান কাজ ১৯৪৮-এর পর আর কমলকুমার তো আমাদের এখনকারই লেখক।

এই দুই লেখকই উপন্যাসের স্বীকৃত আধুনিকতাকে অস্বীকার করেছেন কিন্তু অস্বীকার করেছেন অনেকটা নিজেদের মত করে। তাঁদের প্রধান জোর তাঁদের নিজস্ব বিবরণ। সেই বিবরণের প্রয়োজনে জীবনানন্দ পরাধীনতা, দেশভাগ ও স্বাধীনতার যে-কাহিনী লেখেন সে-কাহিনী বোনা হয় অনুভব আর উপলব্ধির ইতিহাস দিয়ে। আর কমলকুমারে আমাদের সামাজিক জীবনের অস্তিত্বের সংকট তৈরি হয় এক পৌরাণিক কৃত্রিমতার সচেতন ব্যবহার দিয়ে। এই দুই লেখকের মধ্যে কোনো মিল নেই। কিন্তু দুজনই অসংখ্য তথ্য ব্যবহার করেন তাঁদের অনুভবের সত্যটাকে গড়ে তুলতে কিংবা তাঁদের পৌরাণিকতাকে আকার দিতে। জীবনানন্দ তাঁর উপন্যাসের যে-বিষয় বাছেন তার একটা আলগা কাহিনী থাকে বটে কিন্তু সে-কাহিনীটা মুছতে মুছতে তিনি এগন সেই কাহিনী থেকে নিষ্কাশিত অনুভবের জগতের দিকে আবার সেই অনুভব ঘিরে তৈরি হয় নতুন তথ্যপুঞ্জ। কমলকুমারের পৌরাণিকতাও তৈরি হয় অসংখ্য বস্তু দিয়ে, তথ্য দিয়ে—যেন ঐ পৌরাণিকতাটা গড়ে তুলেই তিনি তাঁর সমকালীন সম্পর্কে বিবরণটাকে সম্পূর্ণ করতে পারবেন।

কিন্তু এই পর্যন্তই থাক। জীবনানন্দ ও কমলকুমার তাঁদের সমস্ত শক্তি দিয়েও উপন্যাসের প্রধান ধারার লেখক নন। আর বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত উপন্যাসিক সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাস তার উনিশ শতকীয় জন্মলগ্নের আধুনিকতার বিভ্রম কাটিয়ে উঠতে পারে নি, পারে না, পারার কোনো উদ্যম দেখায় না। 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত হওয়ার আগেই আমরা জানতাম উপন্যাস কী, উপন্যাস কী-রকম হওয়া উচিত। আমাদের শুধু অপেক্ষা ছিল এমন একটি উপন্যাসের যা পড়লে ইংরেজি উপন্যাসের মতই লাগবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজও আমরা জানি উপন্যাস কী-রকম হওয়া উচিত। আজও আমাদের শুধু অপেক্ষা তেমন উপন্যাসেরই জন্যে যা পড়তে হয়তো এখন মার্কিন দেশের উপন্যাসের মত লাগবে।

আপনারা দয়া করে ভাববেন না যে আমি খুব বেশি বিক্রি হয় যে-সব উপন্যাস, বা যে-সব লেখকদের উপন্যাস, তাদের সম্পর্কেই শুধু বলছি। কারণ, সত্য এই যে বাংলা ভাষায় কোনো দিনই উপন্যাসের আলাদা এমন ধারা তৈরি হয়ে ওঠে নি যেখানে জনপ্রিয় আর বিশিষ্টের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যায়। এই পার্থক্য শিল্পের দিক থেকে অর্থহীন। এবং আমি কোনো সামাজিক সমস্যার আলোচনা করছি না যে উপন্যাসকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ভাগে ভাগ করে কোনো সহজ ব্যাখ্যায় পরিত্রাণ খুঁজব। বাংলা ভাষায় উপন্যাসের ফর্ম যে তার স্বকীয় আধুনিকতা খুঁজে পেল না—সেই সঙ্কট, যেমন জনপ্রিয় তেমনি বিশিষ্ট, এই দুই ধরণের ঔপন্যাসিকেরই সঙ্কট যদি সে-রকম কোনো ভাগ কল্পনাও করে নেয়া যায়। তাই আমাদের গল্প-উপন্যাসের বয়স সোয়া শ বছর, তাতে এমন কয়েকজন লেখক লিখেছেন যাঁরা যে-কোনো ভাষার সাহিত্যের পক্ষেই গৌরবের, তাতে এমন কিছুও লেখা হয়েছে যা যে-কোনো ভাষার সাহিত্যের পক্ষে গর্বের তবু তা আমাদের কোনো ঔপন্যাসিক ঐতিহ্য তৈরি করে নি, বড় জোর সেই ঐতিহ্য তৈরি হতে পারত এমন কিছু স্মারক তৈরি করেছে। বাংলা উপন্যাসে সঞ্চারিত হয় নি লোকায়তের পৌরুষ, বাংলা উপন্যাসের কাহিনীতে আসে নি পুরাণ বা মিথ ভাঙার লোকায়তিক পেশি, বাংলা উপন্যাসের সংলাপে আসে নি আমাদের প্রতি ক্রোশে আলাদা উপভাষার খর চলিষ্ণুতা ও ব্যঙ্গশ্লেষরসিকতার শান। সারা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই বাংলাই নাকী একমাত্র বা প্রধান নদী-বদ্বীপ যেখানে এত মানুষ বাস করে, অথচ আমাদের উপন্যাসে সে-বিবরণ লেখা হল না কত নদীর জল কত রঙের মাটি ভাঙে। সারা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই বাংলারও নাকী অন্যতম আকাশ যেখান থেকে বছরে এতগুলো মাস এত বৃষ্টি পড়ে, অথচ আমাদের উপন্যাসে সে-বিবরণ লেখা হল না কত রঙের মেঘ কত জল ঝরায়। সারা পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই বাংলার ওপর দিয়েই বয়ে যায় রহস্যময় এক সামুদ্রিক বাতাস যার নাম মৌসুমি বায়ু। অথচ আমাদের উপন্যাসে সে-বিবরণ লেখা হল না—কোন খাত দিয়ে কী বাতাসে আমাদের গাছপালা দোলে। আর, এই নদী, এই বৃষ্টি, এই বাতাস, এই পাহাড়, এই সমতল আর এই সমুদ্রকে অন্বিত করে যে-মানুষ সে তার নিজের বাঁচার কাহিনী নিয়ে আমাদের উপন্যাসে এল না। আমরা উপন্যাসে কাহিনী খুঁজেছিলাম, কাহিনীর সেই মায়ামৃগ আত্মপরিচয় থেকে আমাদের আরো দূরে দূরে সরিয়ে এনেছে। বাংলার গল্প-উপন্যাসের আধুনিকতা তাই এখনো তাত্ত্বিক তর্কের বিষয়। শ্বাসেপ্রশ্বাসে, ঘামেরক্তে, প্রতিমুহূর্তের স্বকীয় বাঁচার কঠিন আনন্দে স্পন্দ্যমান সেই আধুনিক মানুষ আমাদের উপন্যাসে তার মহিমময় বাঁচা নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি যে তার দিকে তাকানো মাত্র সব তত্ত্ব অবান্তর হয়ে যাবে।

১৯৮৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসের নন্দন

মিখাইল বাখতিন-এর উপন্যাসচিন্তা ইয়োরো-আমেরিকার চিন্তাজগতে এখন সবচেয়ে প্রবল ঝড়। পাশ্চাত্য মহাদেশগুলির চিন্তাজগৎ এতই চলিষ্ণু ও পরিবর্তনশীল যে তাতে এমন নতুন ঝড় এমন কোনো নতুনত্বও নয় হয়তো। আমাদের দেশে আধুনিক তত্ত্বচিন্তারও প্রায় কোনো গতি নেই, কতকগুলি সনাতন স্বতঃসিদ্ধের আওতা থেকে আমরা কিছুতেই বেরতে পারি না। সমাজবিজ্ঞান বা নান্দনিক সমালোচনার বর্তমানের বহুবিস্তারী মানচিত্রটিকে আমরা আয়ত্ত করে নিতে চাইছি বটে আর এ-বিষয়ে মৌলিক কিছু বইও আমাদের গবেষক-পণ্ডিতরা লিখেছেন বটে তবু ভারতীয় সমস্যার নির্দিষ্টতার সমাধানে আমরা ভারতীয় কোনো 'পদ্ধতি' বা 'মেথড' আবিষ্কার করতে পারি নি। পদ্ধতি বা 'মেথড'-এর এমন কোনো দেশীয়তা বা জাতীয়তা হয়তো থাকেও না—কতকগুলি 'বিশেষ' পরিস্থিতির জন্যে অবলম্বিত পদ্ধতি বা 'মেথড' আমাদের কতকগুলি 'সামান্য' সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায়। তাতেই পদ্ধতি বা 'মেথড'-এর সামান্যীকরণ—'ইউনিভার্সালাইজেশন'—ঘটে। তবু, সমাজবিজ্ঞান বা তত্ত্বচিন্তায় আধুনিক এই বিশেষ সমস্যাগুলি সব সময়ই পাশ্চাত্য জীবন থেকেই সংগৃহীত—সামান্যীকরণের পর আমরা সেগুলিকে আমাদের দেশের বিশেষ সমস্যাগুলির বেলায় সূত্র হিশেবে প্রয়োগ করি। পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞান বা তত্ত্বচিন্তায় প্রাচ্য বা তৃতীয় বিশ্ব কিন্তু সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সমাজবিজ্ঞানে যদিও-বা কখনো-কখনো তৃতীয় বিশ্বের বিশেষ সমস্যাগুলি পাশ্চাত্যের পক্ষেও প্রয়োজনীয় কিন্তু পাশ্চাত্যের নন্দনচিন্তায় তৃতীয় বিশ্বের কোনো অস্তিত্বই নেই। রবীন্দ্রনাথকে আমাদের এখনো বুঝতে হয় পাশ্চাত্যের বিভিন্ন রোম্যান্টিক কাব্যতত্ত্বের নিরিখে, রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতাকেও বুঝতে হয় এলিয়টি বিধানের সাহায্যে। এমনকী বাংলা কবিতার পঞ্চাশের দশকমার্কা আধুনিকতার জন্যেও প্রয়োজন হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিটবংশের সূত্র।

তাতে আমাদের একটু আগ বাড়িয়েই দুনিয়ার খোঁজখবর রাখতে হয়—পাছে পেছিয়ে পড়ি এই দুর্ভাবনায়। এতে আমাদের আত্মগ্লাঘা বাড়তে পারে এমন ঘটনাও কখনো-কখনো ঘটে। এই তো কিছু দিন আগে কলকাতায় এলেন কিউবার এক বিখ্যাত কবি। তিনি এক বৈঠকে, 'আমার কাছে ত আমার কোনো কবিতার বই নেই, নইলে পড়ে শোনাতাম দু-চারটে কবিতা', বলতেই বেরিয়ে আসে বাঙালি শ্রোতাদের ভেতর থেকে তাঁর লেখা দু-দুটো কাব্যগ্রন্থ। সে কবি তো আমাদের আন্তর্জাতিকতায় ততক্ষণে হতবাক্।

দুনিয়ার এত খবর রাখতে গিয়ে নিজেদের খবর আমাদের বড় একটা রাখা হয় না, নিজেদের লেখা ভাল করে পড়াও হয় না, নিজেদের লেখা ভাল করে বুঝে নেয়ার জন্যে নতুন-নতুন দিক থেকে চিন্তার সময়-সুযোগও ঘটে না। কিন্তু নন্দনচিন্তার নতুন সূত্র কখনোই তৈরি হয়ে উঠতে পারে না নিজের ভাষার সৃষ্টিবৈচিত্র্যের নতুন-নতুন গভীর স্তরের ভিতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢুকে যেতে না-পারলে—কখনো ডুবুরির মত, কখনো খনির মজুরদের মত, আবার কখনো শল্যচিকিৎসকের মত। সেই অন্তর্প্রবেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই তৈরি হয় প্রবেশপদ্ধতি, সেই বিশেষ পদ্ধতির জন্যে দরকারি যন্ত্রপাতি বা কৃৎকৌশল। যখনই কোনো দেশে নন্দন-আলোচনার নতুন সূত্র তৈরি হয়, তখনই সেই দেশের বা ভাষার শিল্পসাহিত্যের এক নতুন পাঠ আমরা পাই। শিল্প-সাহিত্যকে অনিবার্যতই স্থানিক ও সাময়িক হতে হয়—দেশকালের দ্রাঘিমা-অক্ষাংশে সে এমনই বাঁধা। সেই স্থানিকতা ও সাময়িকতাকে বিশ্বজনীনে নিয়ে আসাটাই নন্দনসূত্রের প্রধান, বা হয়তো একমাত্র কাজ। গ্রিস দেশ ছাড়া গ্রিক নাটক হত না, গ্রিস নাটক ছাড়া এরিস্টটল হতেন না এবং এরিস্টটল ছাড়া গ্রিক নাটকের এমন সামান্যীকরণ অগ্রিক মানুষদের জন্যে ঘটত না।

মিখাইল বাখতিনের নন্দনচিন্তা এই কারণেই ইয়োরো-আমেরিকায় এমন ঝড় তুলেছে। তিনি প্রধানত রুশ উপন্যাস ও তার মধ্যেও প্রধানত দস্তয়েভস্কিকে নির্দিষ্টভাবে পড়ে উপন্যাসের শিল্পরূপ সম্পর্কে কতকগুলি সামান্যীকরণে পৌঁছেছেন।

বাখতিনের লেখা আধুনিক লেখা নয়। তিনি প্রধানত লিখেছেন এই শতকের ত্রিশ-চল্লিশের দশকে ও তার আগে। কিন্তু তাঁর এই রচনাপঞ্জির সঙ্গে ইয়োরো-আমেরিকার নন্দনতত্ত্বজিজ্ঞাসুদের পরিচয় ঘটার সুযোগ এসেছে মাত্র ষাটের দশকে। সে-পরিচয় এখনো চলছে। কারণ বাখতিনের লেখাগুলো এখন ইংরেজি অনুবাদে সবে মাত্র বেরতে শুরু করেছে। রুশভাষায় বাখতিনের এই কটি বই বেরিয়েছে—প্রবলেম্‌স অব দস্তয়েভ্‌স্কিস-আর্ট (১৯২৯। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৩, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭২), র‍্যাবলে, অ্যান্ড ফোক কালচার অব দি মিডল এজেস অ্যান্ড রেনাসাঁস (১৯৬৫) আর প্রবন্ধসংগ্রহ—দুই খণ্ড।

এর ভিতর প্রথম বই দুটির ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে যথাক্রমে ১৯৭৩-এ ও ১৯৬৮-তে। তাছাড়া তাঁর কতকগুলি রচনাকে ঐক্যসূত্রে গেঁথে বেরিয়েছে 'ডায়ালজিক ইম্যাজিনেশন'। সম্প্রতি মস্কোর এক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে বাখতিনের একটি রচনাসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, শুনেছি, কিন্তু এখনো বইটি দেখি নি।

এই রচনাগুলি লেখা ও প্রকাশের ইতিহাস বিচিত্র। সেই ইতিহাসের সঙ্গে বাখতিন সম্পর্কে ইয়োরো-আমেরিকার আগ্রহের ইতিহাসও জড়িত। তাঁকে সোভিয়েত সম্পর্কে 'বিক্ষুব্ধ' গোষ্ঠীর একজন বলে চিহ্নিত করতে লোভ হয় কিন্তু তা করা যায় না। তাঁকে স্তালিনের অপশাসনের শিকার বলে বর্ণনা করতে ইচ্ছে হয় কিন্তু তাও সবটুকু করা যায় না। বাখতিন এমন একজন তাত্ত্বিক লেখক যাঁর কোনো লেখা সোবিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত হওয়ার আগে গোপন পথে পাশ্চাত্যে চলে আসে নি অর্থাৎ পাশ্চাত্যই তাকে আবিষ্কার করল এমন গৌরব করবার মত সাক্ষ্য পাশ্চাত্যের বিদ্যাচর্চামহলের হাতে নেই।

বাখতিন (জন্ম ১৮৯৫) রাশিয়ার প্রাক-বিপ্লব দুই দশকের প্রবল তত্ত্বচিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যৌবনে পৌঁছেছিলেন। লেনিন যখন রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনে ব্যস্ত, আর রুশ বিপ্লবের চরিত্র নিয়ে যখন তাত্ত্বিক জগতে চলছে লড়াই সেই সময়ই বাখতিন বিপ্লবের ধাত্রী পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ ছাত্র (১৯১৩)। পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন ভাবজগতের উত্তাল ঝড়—কবিতায় সিম্বলিস্ট, ফিউচারিস্ট, একমেইস্টদের লড়াই, ফর্মালিস্টদের বিরুদ্ধে স্কোলোভস্কির ঘোষণাপত্র বেরিয়েছে, পেট্রভ, ভেদেনস্কি ও ভেসেলভস্কির নেতৃত্বে তুলনামূলক সাহিত্যের নতুন চর্চা শুরু হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেদেনস্কি তখন ইয়োরোপের প্রধানতম নব্যকান্টপন্থীদের একজন। তাছাড়া ছিলেন অধ্যাপক জেলিনস্কি—তাঁর কাছ থেকেই বাখতিন পান রোমক সভ্যতা সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ ধারণা।

পিটার্সবুর্গ থেকে বাখতিন চলে আসেন পশ্চিম রাশিয়ার নেভেল শহরে। সেখানে দুবছর স্কুলে পড়ান। এইখানেই বাখতিনের অনুরাগীদের একটা সমাবেশ ঘটে।

নেভেলে বাখতিনের প্রধান আলোচ্য ছিল জার্মান দর্শন। এই বাখতিন-অনুরাগীদের তালিকা দেখলে বোঝা যায় যাকে বলে সোভিয়েতের বিক্ষুব্ধগোষ্ঠী বাখতিন তার কেউ ছিলেন না—বরং এই অনুরাগী বন্ধুদের অনেকেই পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন বিষয়ের কর্তা হয়ে ওঠেন যদিও তখনো তাঁদের বাখতিন-অনুরাগ কিছু মাত্র কমে নি। লেভ পামপিয়ানস্কি—পরে তিনি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। ভি. এন. ভোলসমোভ—তখন ছিলেন উঠতি সিম্বলিক কবি, পরে ভাষাতত্ত্ববিদ্। এস. ভি. যুদিনা—পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় প্রধানতম পিয়ানোবাদক। আই. আই. সোলারতিনস্কি পরে লেনিনগ্রাদ ফিলহারমনিকের শিল্পনির্দেশক। বি. এম. জুবাকিন—পুরাতত্ত্ববিদ। আর ছিলেন মাতভেই আইজাক কাগান—তখন তরুণ দার্শনিক, জার্মানিতে দশ বছর অধ্যয়ন করে দেশে ফিরেছেন। পরে সোভিয়েতে শক্তি (এনার্জি)-র উৎস সম্পর্কে এক প্রকাণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়ার অন্যতম সম্পাদক। কাগান ছিলেন বাখতিনের ব্যক্তিগত বন্ধু। ১৯২০-এ বাখতিন ভিটেবস্ক-এ চলে যান। সেখানেও এক বন্ধুমণ্ডলী গড়ে ওঠে। এখানে ১৯২১ সালে বাখতিন বিয়ে করেন এলেনা ওকোলোভিককে। আর এই ভিটেবস্কেই তাঁর হাড়ের অসুখ শুরু—সেই অসুখে ১৯৩৮-এ তাঁর একটি পা কেটে বাদ দিতে হয়।

সেখান থেকে তিনি লেনিনগ্রাদে চলে আসতে পারেন। কিন্তু ১৯২৯-এর পর ছ-বছরের জন্যে তাঁকে কাজাখস্তানের কুস্তাবাজ-এ চলে আসতে হয়। কেউ-কেউ সন্দেহ করেন এটাই ছিল তাঁর নির্বাসনদণ্ড। কিন্তু দুটি কারণে সন্দেহ করা যায় যে বাখতিন স্তালিনীয় ব্যভিচারের শিকার হয়েছিলেন কীনা। এমনকী তাঁর আধুনিক ভক্তদের যাঁরা গোঁড়া সোভিয়েতবিদ্বেষী তাঁরাও নথিপত্র জোগাড় করতে পারেন নি যাতে বাখতিন কী কারণে সরকারি কোপে পড়েছিলেন তা জানা যায়। পরন্তু ১৯২৯-বছরটিতে স্তালিনের ব্যভিচারপর্ব শুরু হয় নি। এই পর্বের যখন তুঙ্গকাল ১৯৩৬-৩৭ তখন বাখতিন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো শুরু করেছেন ও মস্কোর কাছাকাছি একটি শহরে চলে এসেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বছরগুলিতে মস্কোর কাছাকাছিই ছিলেন বাখতিন। ১৯৫৭-তে তিনি সারানস্কে শিক্ষকশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রুশ ও বিশ্বসাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখান থেকেই ১৯৬১-তে অবসর নেন ও মস্কোতে চলে আসেন। ১৯৭৫-এর ৭ মার্চ তিনি মস্কোতেই মারা যান।

বাখতিনের জীবনের তথ্যগুলি আমরা পেয়েছি তাঁর 'ডায়ালজিক ইম্যাজিনেশন' বইটির ভূমিকায়। সারা জীবন বাখতিন এক বিশ্বস্ত ও অনুরাগী বন্ধুমণ্ডলীর সমর্থন পেয়েছেন। আবার, বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাঁর বিরুদ্ধেও একদল অধ্যাপক সক্রিয় ছিলেন। নইলে তাঁর র‍্যাবলের ওপর বইটিকে ডক্টরেট উপাধি দিতে অস্বীকার করা হবে কেন?

প্রকাশনার ব্যাপারে বাখতিন সারা জীবনই প্রায়—শেষ বছর-কুড়ি বাদে—দুর্ভাগ্যতাড়িত। তাঁর প্রথম দিককার লেখা 'লিখিত সাহিত্যে নন্দনবিচারের পদ্ধতি' প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল 'রুশকি সোভরেমেঙ্কি' কাগজে। প্রকাশের আগে কাগজটি উঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল, সঙ্গে-সঙ্গে লেখাটিও হারিয়ে গেল। লেখাটি শেষ পর্যন্ত বেরল ৫১ বছর পর। ১৯২৯-এ বাখতিনের প্রথম বইটি—দস্তয়েভস্কির ওপর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাজাখস্তানে চলে যাওয়ার জন্য এই বইটি নিয়ে তেমন আলোড়ন হল না। ১৯৩৭ নাগাদ আঠার শতকের জার্মান উপন্যাস নিয়ে তাঁর একটি বড় বই রাষ্ট্রীয় প্রকাশনা সংস্থা বের করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু জার্মান আক্রমণের ফলে সব গোলমাল হয়ে যায় ও কপিটি হারিয়ে যায়। যে-আর একটি মাত্র কপি বাখতিনের কাছে ছিল তার কাগজ দিয়ে তিনি নাৎসি-আক্রমণের দিনগুলোতে সিগারেট বানিয়ে খেয়েছেন। যুদ্ধের পরে তাঁর দুই অনুরাগী বন্ধু ভাদিম কোজিনোভ ও সের্গেই বোচারভ-এর প্রায় প্রাণান্তকর চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত বাখতিন প্রকাশ করেন যে সারানস্ক শহরে তাঁর বাসস্থানে ইঁদুর আকীর্ণ কাঠের ছোট এক গুদামে তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলি পড়ে আছে। কোজিনেভ ও বোকারোভ সেগুলি উদ্ধার করেন, সেগুলিকে নতুন করে টাইপ করেন ও প্রকাশের জন্যে প্রস্তুত করেন। এখন বাখতিনের যে-লেখাগুলি পাচ্ছি তার বেশির ভাগের জন্যেই কোজিনভ ও বোচারভের কাছে আমরা ঋণী।

জীবনের শেষ কুড়ি বছর বাখতিন তাঁর চিন্তার ও তত্ত্বের সক্রিয়তা দেখে যেতে পেরেছেন। ১৯৭৫-এ মৃত্যুর পরে সেই চিন্তা ও তত্ত্বের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হয়তো তিনি দেখে যেতে পারলেন না, কিন্তু তার আভাস পেয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি জানতে পেরেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে আনুষ্ঠানিক সম্মান জানানো হবে। ইয়োরো-আমেরিকায় বাখতিনের এই স্বীকৃতি কিন্তু জুটছে সোভিয়েত ইউনিয়নের নন্দনতত্ত্বের সাহায্যেই। সাধারণভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের তাত্ত্বিকদের নন্দন চিন্তার সঙ্গে ইয়োরো-আমেরিকার নন্দনচিন্তার কোনো বিনিময় ঘটে না। সেই বিনিময়েরই এক নতুন অবস্থা তৈরি হচ্ছে বাখতিনকে কেন্দ্র করে। তুরবিন-এর নেতৃত্বে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে, মস্কোর গোর্কি ইনস্টিটিউট অব ওয়ার্ল্ড লিটারেচার-এ, বিশেষত কোজিনভ ও বোচারভের আলোচনায়—বাখতিন সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি নতুন 'বিষয়' হিশেবে দেখা দিয়েছেন, যেমন দেখা দিয়েছেন তিনি নতুন বিষয় হিশেবেই ইয়োরো-আমেরিকায়। তাঁর দস্তয়েভস্কি ও র‍্যাবলে বিষয়ক বই দুটি ও 'ডায়ালজিক ইম্যাজিনেশন' নামে তাঁর রচনাসংকলনটি বিশ্বের নন্দনচিন্তার জগতে শেষতম আলোড়ন তুলেছে। সেই তিরিশের দশকের কোনো কাজ এই সত্তর-আশির দশকে যখন ঝড় তোলে তখন বোঝাই যায় সে-তত্ত্বের ভেতর এমন কথা আছে যা আমাদের এখনো জানা হয় নি।

বাখতিনের প্রধান আলোচ্য—উপন্যাস, 'নভেল'। উপন্যাসের শিল্পরূপ সম্পর্কে বাখতিনের ছাড়া আর কারো কোনো তত্ত্ব নেই। লুকাচ বা আয়ান ওয়াট-এর মত বিপরীতধর্মী তাত্ত্বিকের আলোচ্য উপন্যাসের উপকরণের বিশ্লেষণ, উপন্যাসের সত্তানির্ধারণ নয়। লুকাচ-এর 'থিয়োরি অব দি নভেল' বা ওয়াট-এর 'দি রাইজ অব দি নভেল'-এ এই উপকরণ বিন্যাসেরই নানা রকমফের—সে-রকমফের নিশ্চয়ই আলোচকদের দার্শনিক প্রস্থানের ওপর নির্ভরশীল। লুকাচ তাই সমকালীন বাস্তবতা কাকে বলে, বিষয় ও ফর্মের অন্তর্সম্পর্ক কী ভাবে তৈরি হয়, 'বলা' উচিত না 'দেখানো' উচিত—এই ধরণের প্রশ্নের সম্মুখীন হন। তাতে উপন্যাসের যে উদাহরণগুলিকে সামনে রাখা হয় সেগুলো যে উপন্যাসই এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। উপন্যাস হিশেবে প্রতিষ্ঠিত সেই রচনাগুলি থেকে লুকাচ উপন্যাসের শিল্পপ্রকরণের নানা উপাদানের কাছে পৌঁছন। সে-উপাদানগুলি এক দার্শনিক সূত্রে গ্রথিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। লুকাচ উপন্যাস বুঝতে সাহায্য করেন, ঔপন্যাসিকের অন্বেষণ সম্পর্কে সচেতন করেন, এমনকী উপন্যাস কী করে হয়ে উঠছে সেই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কেও আগ্রহী করে তোলেন কিন্তু এই উপন্যাসের সত্তা বা সংজ্ঞা সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নের তিনি মুখোমুখি হন না। লুকাচ এই কথা জানবার বা জানাবার জন্যে লেখেন না—কাকে আমরা উপন্যাস বলি, কখন একটি রচনা উপন্যাস হয়ে ওঠে ও কখন হয় না, উপন্যাস হয়ে ওঠার নান্দনিক এককটি (ইউনিট) কী?

লুকাচ কেন, উপন্যাসের নান্দনিক এককের সন্ধান আর-কোনো দার্শনিক-তাত্ত্বিকেরই কর্মসূচি নয়। যেমন, ফিল্মের নান্দনিক এককের সন্ধানে শ্রেষ্ঠ ফিল্মকারদের কেউ-কেউ যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্তও আমাদের তবু জানা হয় নি কোন বিশেষ এককটি দিয়ে আমরা ফিল্মকে ফিল্ম বলে চিনে নিতে পারি। আইজেনস্টাইন যদি-বা ফিল্মের সেই এককটি আমাদের এক ভাবে বুঝিয়েছিলেন, তাঁরই স্বদেশবাসী তারকোভস্কি সম্প্রতি 'স্কাল্পটিং ইন টাইম' আত্মকথনটিতে বিপরীত মেরুতে আমাদের ঠেলে নিয়ে গেছেন।

বাখতিন তাঁর 'ডায়ালজিক ইম্যাজিনেশন' নামে প্রবন্ধচতুষ্কে এ-কথা ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন নাটক, লিরিক, এপিক—এই তিনটি শ্রেণী যে-সব কারণে পৃথক ও বিশিষ্ট, অনুরূপ পার্থক্যে ও বৈশিষ্ট্যে কেন উপন্যাসের মত শিল্পরূপকে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

উপন্যাস সম্পর্কে বাখতিনের এই আগ্রহের প্রক্রিয়াটাও তাঁর তত্ত্ব বোঝার জন্যে জানা প্রয়োজন। জার্মান দর্শনে পণ্ডিত বাখতিন দার্শনিক কোনো সিদ্ধান্তে আগে পৌঁছে সেই সিদ্ধান্তগুলিকে উপন্যাসের ওপর প্রয়োগ করেন নি। ১৯২৯-এ প্রকাশিত তাঁর প্রথম বই 'দস্তয়েভ্স্কির নন্দনতত্ত্বে' তিনি দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসগুলোকে বুঝতে চেয়েছিলেন। এই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বেরল ৩৪ বছর পরে। এই ৩৪ বছর ধরে বাখতিন দস্তভ্য়েস্কি গ্রন্থে উত্থাপিত বিষয়গুলি নিয়ে আরো অনুসন্ধান করেছেন ও ধীরে-ধীরে তাঁর উপন্যাসসংক্রান্ত তত্ত্বে পৌঁছেছেন। সেই অনুসন্ধানের কিছু-কিছু ইঙ্গিত 'ডায়ালজিক ইম্যাজিনেশন' বইটিতে মেলে। দস্তয়েভ্স্কি-বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে নতুন বিষয় সন্নিবেশিত হল, নতুন অনেকটা অংশ লেখা হল—সেই মধ্যবর্তী ৩৪ বছরের অনুসন্ধানের ফল এসে মিশল পুরনো এই লেখাটিতে। তাই ঘটনাক্রমে এখন যেন দাঁড়াচ্ছে—দস্তয়েভ্স্কি-বইটির প্রথম সংস্করণ (১৯২৯) উপন্যাস সম্পর্কে বাখতিনের প্রশ্নসূচি আর দস্তয়েভ্স্কি-বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৬৩) সেই প্রশ্নের উত্তরপত্র। মাঝখানে 'ডায়ালজিক ইম্যাজিনেশন'-এ সংকলিত প্রবন্ধগুলোতে প্রশ্ন থেকে উত্তরে পৌঁছনোর ইতিহাস। এখন আমরা বাখতিনকে যখন পড়ব তখন এই ক্রম-অনুযায়ীই পড়ব—যাতে তাঁর তত্ত্বের সমগ্রতাটাই আমরা দেখতে পারি।

বাখতিন উপন্যাসের নন্দন আবিষ্কার করতে গিয়ে সাহিত্যের এক ও একমাত্র উপকরণ ভাষাবিচারের পদ্ধতি পাল্টে দিলেন। লিরিক, এপিক ও ট্র্যাজেডি—ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। তাই লিরিক, এপিক ও ট্রাজেডিতে শব্দের ব্যবহারবিচারের একটা প্রক্রিয়াও সেই প্রাচীন কাল থেকেই ধারাবাহিক। এই বিচারের রীতিনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত—তা থেকে সরে আসার কোনো উপায় নেই। শব্দের ব্যবহারবিচারের সেই স্বীকৃত রীতিনীতির মধ্যেই নতুন-নতুন ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ এসে যায়, বা, নতুন-নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়। লিরিক, এপিক ও ট্রাজেডির এই সমালোচনাবিধি অনেকটাই স্বাবলম্বী। সেই কারণে সাহিত্যের শাখাতেও এই সমালোচনাবিধির একটু রকমফের ঘটিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহার করা হয়।

বাখতিন প্রথম বললেন—উপন্যাসের আলোচনাতেও এতকাল তাই হয়ে এসেছে। সেই কারণে উপন্যাসের আলোচনা বলতেই বোঝায় চরিত্রের আলোচনা, চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্কের আলোচনা, কাহিনীর বিকাশ ও সঙ্কট আলোচনা। নাটক বা এপিকের বেলাতেও এই বিষয়গুলিই আলোচনা করা হয়। যাঁর জানা নেই তাঁর পক্ষে একটি সমালোচনা পড়ে বোঝা সম্ভব নয় কোনটা নাটকের আলোচনা আর কোনটা উপন্যাসের আলোচনা।

তেমনি কবিতায় বা লিরিকে শব্দ ব্যবহারের প্রক্রিয়া খুঁজতে গিয়ে প্রধান অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে—দৈনন্দিনে ব্যবহৃত শব্দের কোন জন্মান্তর ঘটে যাচ্ছে লিরিকে আর কী উপায়েই-বা সেটা ঘটে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হতে পারে এপিকে বা নাটকে বা উপন্যাসে ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যা এত বেশি যে সেখানে শব্দবিচারের এই পদ্ধতি হয়তো ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু এপিক বা নাটক বা উপন্যাসের সমগ্রতাবিচারে এই পদ্ধতি ব্যবহারের একটি বিশেষ ধরণ আছে। সেখানে গ্রিক নাটকের কোনো অংশকে বা শেক্সপিয়ারের নাটকের কোনো অংশকে স্বতন্ত্র লিরিকের মর্যাদায় নিয়ে আসা হয়। তারপর সেই অংশটির ওপর লিরিকে শব্দের জন্মান্তরের প্রক্রিয়া বোঝার পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা বুঝতে চাই ঐ রচনাগুলির কবিত্বের রহস্য। তখন বিশ্বসাহিত্যের ক্লাসিকগুলির ট্র্যাজেডি, এপিক বা লিরিকের ভিতরকার গণ্ডি ভেঙে ফেলে আমরা অদ্বিতীয় এক কাব্যবোধে ওয়েদিপাউস, ডিভাইন কমেডি, হ্যামলেট ও ফাউস্টকে গ্রহণ করতে চাই। এই প্রক্রিয়াতেই পৃথিবীর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সব রচনা নিয়ে নানা কালে নানা মতবিনিময় ঘটেছে ও আমাদের বোধের সীমানা প্রসারিত হয়েছে।

বাখতিন বললেন—এই প্রক্রিয়ায় উপন্যাসের শিল্পরূপের বিশ্লেষণ সম্ভব নয় কারণ উপন্যাসে শব্দের অর্থান্তর ঐ প্রক্রিয়ায় ঘটে না। নাটকের চরিত্র যে-কারণে ও যে-ভাষায় কথা বলে, উপন্যাসের চরিত্র সে-কারণে ও সে-ভাষায় কথা বলে না। লিরিক, এপিক বা ট্র্যাজেডিতে রচনাকারের উপস্থিতি উহ্য রাখতেই হয় ঐ বিশেষ ফর্মের জন্যেই। উপন্যাসের ফর্মের প্রয়োজনেই ঔপন্যাসিককে কোনো-না-কোনো ভাবে উপন্যাসের ভিতরে উপস্থিত থাকতে হয়। তাই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সচেতনভাবে শব্দসংকর ঘটিয়ে একটা সংগঠন তৈরি করেন। শব্দের সেখানে জন্মান্তর বা অর্থান্তর ঘটে না। বরং শব্দকে অনেক বেশি করে, প্রায় পরিত্রাণহীন ভাবে অর্থের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় তারপর সেই অর্থান্তরহীন শব্দকে তার মূল অর্থসহই একটা ভিন্নতর উদ্দেশ্যে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। সেই কারণেই সাহিত্যের অন্যান্য শাখার বিচারে যে-সব নান্দনিক পদ্ধতি ইতিহাসে ফলবান প্রমাণিত হয়েছে সেই সব পদ্ধতি প্রয়োগে উপন্যাসের বিচার করা যায় না। তেমন বিচারে উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনাকে দেখায় নাটকের চরিত্র ও ঘটনার মত, বা উপন্যাসের বর্ণনা-অংশ হয়ে পড়ে যেন লিরিক।

উপন্যাস বলতে নিশ্চয়ই গদ্য-আখ্যানও বোঝায়। বিশেষ ধরণের কিছু গদ্য-আখ্যান বিশ্লেষণে আধুনিক নানা প্রকরণ ব্যবহৃত হয়েছে। লোককথা, রহস্যকাহিনী, শিল্প (ইনডাসট্রিয়াল) লোককথা—বিশেষত কমিক স্ট্রিপ—এগুলিতে কাহিনীর কতকগুলি নির্দিষ্ট ছক থাকে। সেই ছকগুলিকে ধরবার জন্যে স্ট্রাকচারাল পদ্ধতি খুব সাহায্য করেছে। কেউ-কেউ আবার মনে করেছেন এই সব গদ্য-আখ্যানের জন্যে ব্যবহৃত স্ট্রাকচারাল পদ্ধতি বুঝি উপন্যাসের পক্ষেও প্রযোজ্য। কিন্তু বাখতিনের বিশ্লেষণে আমরা বুঝতে পারি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস কেবল একটি গদ্য-আখ্যানই মাত্র নয়। বিশেষত ছোট-আখ্যানের, এমনকী ছোটগল্প বলতে উপন্যাসের যে-নিকটতম আত্মীয়টিকে বোঝায় সেই ছোটগল্পও, উপন্যাস থেকে আলাদা ফর্ম শুধু নয়, উপন্যাসের ফর্মের সঙ্গে তার বিরোধিতাই প্রধান।

কিন্তু বাখতিন এই নেতি-নেতি করে উপন্যাসের চরিত্র ব্যাখ্যা করতে চান না। তিনি পৌঁছুতে চান উপন্যাসের সেই স্বরূপে, সেই সংজ্ঞায়—যেখানে উপন্যাস স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট, স্বাবলম্বী, সাহিত্যের অন্যান্য ফর্ম-নিরপেক্ষ ও স্বক্ষেত্রে স্বাধীন। যেখানে পৌঁছুবার জন্যেই লিরিক, এপিক ও নাটকের নান্দনিক নিরিখ উপন্যাসে অব্যবহার্য কেন—সে-কথা ব্যাখ্যা করে-করে যেতে হয়। যেন, সেই নিরিখগুলির অব্যবহার্যতাই উপন্যাসের স্বরূপকে গ্রাহ্য করে তোলে।

কারণ, শিল্পকর্মের নান্দনিক বিচারে তাত্ত্বিকরা তত্ত্বের একটা কাঠামোর মধ্যে শিল্পকর্মকে ফেলে বিচার করতে চান আর উপন্যাস, বাখতিনের মতে, এমনই শিল্পকর্ম, যা কোনো কাঠামোতে, কোনো কাঠামোতেই, আঁটে না। বাখতিন বলেন, ফর্মের কাঠামো অস্বীকারের প্রয়োজন থেকেই উপন্যাসের শিল্পরূপের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। লিরিক, এপিক বা নাটকের জন্যে বহুকালের অভিজ্ঞতায় তৈরি হয়ে ওঠা তত্ত্বের কাঠামোতে ফেলে উপন্যাসের স্বরূপ চেনা যায় না—এ-কথা বলেই বাখতিন তাঁর বক্তব্য আরো বিস্তারিত করেন—কোনো এক ভাষার সাহিত্যে, যখনই সেই সাহিত্যের সীমা, সেই সাহিত্যের ওপর আরোপিত বাধানিষেধ, অতিক্রমণের প্রয়োজন দেখা যায় তখনই উপন্যাস সৃষ্টি হয়। একটি ভাষার সাহিত্য তৈরি হয় বিভিন্ন উচ্চারিত-অনুচ্চারিত বিধিনিষেধের আওতার মধ্যে। আর, 'নভেলাইজেশন'-এর প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই যখন ঐ বিধিনিষেধগুলি বিষয়ের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সেই জন্যেই বাখতিনের সংজ্ঞা অনুযায়ী উপন্যাসের ইতিহাস সার্ভেন্তিস বা রিচার্ডশন বা ফিল্ডিং দিয়ে শুরু হয় না। তাঁর কাছে উপন্যাস এমন একটি শিল্পরূপ নয় যা ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়ে 'তৈরি' হয়েছিল। তাঁর কাছে উপন্যাস এমনই এক শিল্পরূপ যা সচেতন সাহিত্যসৃষ্টির আদিকাল থেকেই চর্চিত হয়ে আসছে—এপিক, লিরিক ও নাটকের চৌহদ্দির বাইরে শিল্পসৃষ্টির প্রয়োজনে।

সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা তাঁদের যুক্তিতে ঠিকই বলেন যে প্লেটোর এথেন্সে কিংবা মধ্যযুগে উপন্যাস ছিল না। কিন্তু বাখতিনের সংজ্ঞার উপন্যাসের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ আর তা তৈরি হয়েছে সাহিত্যের স্বীকৃত ইতিহাসের বাইরে। বাখতিন তাঁর উপন্যাসের ইতিহাস খোঁজেন সাহিত্যের স্বীকৃত ইতিহাসের বাইরেই শুধু নয়, তার বিপরীত প্রক্রিয়ায়, বা এমনকী বলা যায় সেই স্বীকৃত ইতিহাসের অবমূল্যায়নে—মধ্যযুগীয় নাইটদের রোমান্সের বা রাখালিয়া কাব্য-আখ্যানের বা আবেগমন্থনের কাহিনীর প্যারডিতে। সার্ভেন্তিস-এ, স্টার্ন-এ বা ফিল্ডিং-এ এই 'প্যারডি'র সঙ্গে আমাদের দেখা হয় বটে কিন্তু বাখতিন আমাদের জানান—এ-প্যারডি চলে আসছে সেই গ্রিক আদিকাল থেকেই। কখনো স্বীকারোক্তিতে, কখনো কখনো কল্পকথায়, কখনো প্রবল ব্যঙ্গবিদ্রূপে—এই 'নভেলাইজেশন' ঘটে আসছে। বাখতিন সক্রেটিসকে প্রায় আদি-ঔপন্যাসিক বলে ফেলেন তাঁর কথোপকথনের ভঙ্গির জন্যে, তাঁর সেই ভঙ্গিতে প্রতিপক্ষের যুক্তিকে নিজের যুক্তি হিশেবে উপস্থিত করার সচেতন ভঙ্গির জন্যে, একা তাঁর কণ্ঠস্বরেই একটি বিষয়ের বহু পক্ষ তৈরির ক্ষমতার জন্যে। বাখতিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন আধুনিক কালে আসেন তখন তিনি ইবসেন-এর নাটকে, বায়রন-এর দীর্ঘ কাব্য 'চাইল্ড হেরাল্ড' ও 'ডন জুয়ান'-এ, হাইনের লিরিকে 'নভেলাইজেশন' খুঁজে পান।

এই 'নভেলাইজেশন'-এর সর্বোত্তম প্রকাশ বাখতিন খুঁজে পান দস্তয়েভ্স্কির রচনায়। দস্তয়েভ্স্কির রচনা উপন্যাসের ইতিহাসের অভূতপূর্ব কোনো ঘটনা বলে তিনি মনে করেন না কিন্তু 'নভেলাইজেশন' বলতে যা তিনি বোঝেন তার শুদ্ধতম প্রকাশ তাঁর মতে ঘটেছে দস্তয়েভ্স্কির রচনায়। দস্তয়েভ্স্কির রচনার ভিতর দিয়ে উপন্যাসের ইতিহাসে পৌঁছনোর ফলেই উপন্যাস সম্পর্কিত বাখতিনতত্ত্ব এমন বৈপ্লবিক। তাঁর কাছে 'নভেল' আর মাত্র একটি সাহিত্যরূপ নয়, উপন্যাস হয়ে ওঠে আমাদের সময়ের সাহিত্যের বিকাশের প্রধান বিষয়, আর সাহিত্যের ইতিহাসের আদিকালে সবচেয়ে সক্রিয় অন্তর্ঘাতী শক্তি।

দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসের সঙ্গে 'রোমাঞ্চকাহিনী'র ('অ্যাডভেঞ্চার স্টোরিজ') মিল অনেকেই খুঁজে পেয়েছেন। বাখতিনও সেখান থেকে শুরু করেন। আমাদের আজকের খবরের কাগজের বা টিভি দর্শকের পরিচিত 'ফ্যানটম' বা 'স্পাইডারম্যান', এমনকী 'গোয়েন্দা রিপ' ও 'জেমস বন্ড' এই ইয়োরোপীয় রোমাঞ্চকাহিনীর আধুনিক শুদ্ধ নায়ক। বাখতিন এই রোমাঞ্চনায়ক ও দস্তয়েভ্স্কিনায়কের মধ্যে একটি প্রধান মিল খুঁজে পান। এদের কারোরই সামাজিক প্রতিনিধিত্বের দায় নেই, এদের কারোরই ব্যক্তিগত চারিত্রের কোনো বন্ধন নেই। যদি সেই দায় ও বন্ধন থাকত তা হলে এই রোমাঞ্চনায়কদের ও দস্তয়েভ্স্কিনায়কদের কাজকর্ম অনেক সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে বাধ্য হত। রোমাঞ্চনায়কের বেলায় যা ইচ্ছে তাই ঘটতে পারে, রোমাঞ্চনায়কও যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। সেই বন্ধনহীন স্বাবলম্বনই তার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ বা একমাত্র লক্ষণ। দস্তয়েভ্স্কিতেও একটি চরিত্রকে একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় ফেলা হয়, তাকে খোঁচানো হয়, তাকে খুলে-খুলে দেখানো হয়, তাকে উদ্ভট সব পরিস্থিতিতে অন্য লোকদের সঙ্গে লাগিয়ে দেয়া হয়, তাতে অপ্রত্যাশিত সব ঘটনা তৈরি হয়।

কিন্তু এগুলো তো বাইরের মিল। 'ফ্যানটম' বা 'জেমস বন্ড'-এর মত অভাবিতপূর্ব পরিস্থিতিতে দস্তয়েভ্স্কির চরিত্রগুলো পড়ে বটে কিন্তু সেই পরিস্থিতি তাকে আরো উন্মোচিত করে, সেই উন্মোচনের ফলে সেই চরিত্রের ধ্যানের জগৎ আরো নতুন করে আমাদের নিকটবর্তী হয়, সেই ধ্যানের মানুষটির ওপর আরো নতুন-নতুন আঘাত এসে পড়ে, আর সেই মানুষটি আর তার ধ্যান তখন আবার নতুন আঘাতের সামনে পড়ে। রোমাঞ্চনায়ক যে-কোনো অবস্থার মোকাবিলা করে আর দস্তয়েভ্স্কির নায়ক কোনো অবস্থারই মোকাবিলা করে না। সে শুধু আত্মরক্ষা করে যায়, কখনো তাও পারে না। আর, দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসে তখনই রোমাঞ্চকাহিনীর সঙ্গে মেশে খ্রিস্টান সাধুসন্তদের স্বীকারোক্তির ভঙ্গি।

রোমাঞ্চকাহিনীর সঙ্গে সাধুসন্তদের স্বীকারোক্তি-সাহিত্যের মিলনে যে এক শিল্পগত গুরুচণ্ডালী ঘটে বাখতিন সে-বিষয়ে সচেতন। আর, তখনি তিনি আমাদের সাবধান করে দেন যে রোমাঞ্চকাহিনীর উনিশ শতকি খবরের কাগুজে সংস্করণ আর রোমাঞ্চকাহিনীর মূল উৎস এক নয়। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে রোমাঞ্চকাহিনীর মূল উৎসে যদি পাওয়া যায় তা হলে বোঝা যাবে দস্তয়েভ্স্কি কী ভাবে তাঁর উপন্যাসের প্রয়োজনে এদের মেলাতে পেরেছিলেন ও উপন্যাসশিল্প তার নিজের প্রয়োজন কী ভাবে এ-রকম বিপরীত ধর্মকে মিলিয়ে তার বহুস্বরসঙ্গতি, 'পলিফনি', তৈরি করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর পর বাখতিন সেই ধরণের সাহিত্যের ব্যাখ্যায় ঢোকেন যাকে গ্রিকরা বলতেন 'স্পাউদোগেলোয়স'—গভীর হাসির সাহিত্য, আধুনিক পরিভাষায়, সিরিও-কমিক। তাতে সোফ্রোন-এর মূকনাট্য, সক্রেটিসের সংলাপ, সিমপোসিয়াস্টদের রচনা, আদি স্মৃতিরচনা, মেনিপ্পিয়ান ব্যঙ্গনাট্য ইত্যাদির প্রসঙ্গ আসে।

এই রচনাগুলিকে বাখতিন বলেন 'কার্নিভালাইজড লিটারেচার'। এর অনেকগুলিই আদিকালের মৌখিক কার্নিভাল সাহিত্যের অংশ। সিরিওকমিক সাহিত্যের এক আলঙ্কারিক অর্থ আছে কিন্তু কার্নিভালের ফুর্তিতে সেই আলঙ্কারিক অর্থ বদলে যায়—রচনার গম্ভীরতা টাল খায়, তার যুক্তিকাঠামোয় ফাটল ধরে, তার অর্থের একটেরেপনা ভেঙে যায়।

বাখতিন বলছেন—এই কার্নিভাল সাহিত্যের মধ্যে বিশেষত সক্রেটিসের সংলাপ ও মেনিপ্পিয়ান ব্যঙ্গনাট্যও উপন্যাসের একটি উৎস। সেই উৎসের সঙ্গেই দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসের সম্পর্ক। সেখান থেকেই এই উপন্যাসের সংলাপপ্রধান ('ডায়ালজিক') ধরণ এসেছে আর সেই সংলাপবৈচিত্র্য থেকেই এসেছে 'বহুস্বরসঙ্গতি' বা পলিফনি।

ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসকার এই যে-কথা কখনো ভাবেন নি, তাঁর দস্তয়েভ্স্কি বিষয়ক বইয়ে বাখতিন সেই কথা প্রমাণ করেছেন দুর্লভ পাণ্ডিত্যে। আর তারপর সিদ্ধান্ত করেছেন—মেনিপ্পিয়ান সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসের অস্বাভাবিক মিল ; মেনিপ্পিয়ান সাহিত্যের প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই দস্তয়েভ্স্কিতে পাওয়া যায়; এ দুইয়ের জগৎ আসলে একটাই জগৎ ; যদিও মেনিপ্পিয়ানে যার শুরু, দস্তয়েভ্স্কিতে তার পরিণতি। 'কিন্তু আমরা জানি একটি সাহিত্যরূপের প্রত্ন-পর্যায় সেই সাহিত্যরূপেরই চূড়ান্ত বিকাশের সময়ও নতুনভাবে সক্রিয় থাকে। পক্ষান্তর, একটি সাহিত্যরূপ যত বিকশিত হয়, তার গঠন যত জটিল হয়, তার অতীতও ততই স্পষ্ট হয়, ততই সম্পূর্ণ হয়।'

'দি ডায়ালজিক ইম্যাজিনেশন' ও 'প্রবলেমস অব দস্তয়েভ্স্কিস পোয়েটিকস'—এই বইদুটির মধ্যে দিয়েই বাখতিনের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। এই বইদুটির নানা নিবন্ধে ছড়িয়ে আছে—উপন্যাসের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গবেষণা, উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব বা নন্দন সম্পর্কে তাঁর অনুমান ও দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসগুলিতে এই ইতিহাস ও নন্দন তিনি কী ভাবে পান তার বিশ্লেষণ। অনেকে মনে করেন, বাখতিন যুক্তিপরম্পরানির্ভর সিদ্ধান্তে আসেন না, ফলে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি সব সময় কতটা গ্রহণযোগ্য তা বুঝে ওঠা যায় না। দস্তয়েভ্স্কি বিষয়ক বইটির ভূমিকায় ওয়েন বুথও অনেকখানি এই সংশয় প্রকাশ করেছেন। অনেকে মনে করেন, বাখতিন-এর এই রচনাগুলি যতটা নিবন্ধ তার চাইতে বেশি বক্তৃতা। কথা বলার সময় আমরা যেমন অনেক কিছু ধরে নেই, বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে অনেক কিছু যেমন অনুচ্চারিত থাকে, আর কথা বলতে-বলতে যেমন নানা কথা এসে পড়ে—বাখতিন-এর এই নিবন্ধগুলিতেও তেমনি অনেক কথা ধরে নেয়া হয়েছে, অনেক কথা অস্পষ্ট থাকে, অনেক বেশি অন্য-কথা থাকে।

এটা বাখতিন-এর রচনার কোনো ত্রুটি নয়, বরং বৈশিষ্ট্য। তিনি উপন্যাসে যে বহুস্বরসঙ্গতি খোঁজেন তার বিরুদ্ধেও সেই বহুস্বরসঙ্গতি তৈরি করেন। তাই দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসের থিম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি চলে যান উপন্যাসের আর-এক উৎসের সন্ধানে। আবার সেখানে থেকে ফিরে আসেন উপন্যাসে দস্তয়েভ্স্কির ডিসকোর্সের আলোচনায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসকে ধরেই তিনি তাঁর তত্ত্বজগৎকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই প্রসঙ্গে বারবারই 'ডায়ালজি' ও 'পলিফনি' কথাদুটো ঘুরে ঘুরে এসেছে। বাখতিন উপন্যাসের শিল্পতত্ত্ব বলতে কী বোঝেন তা জেনে নেয়ার জন্যে এই দুটি শব্দের ব্যবহার ঠাহর করা খুব জরুরি।

দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসে এমন-সব উপাদান এনে ফেলা হয় যাদের মধ্যে পরস্পরের কোনো সম্পর্ক নেই। সেই উপাদানগুলিকে নিয়ে তৈরি হয় উপন্যাসের ভিতরে সেই উপাদানগুলির বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র জগৎ। সেই বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র জগৎগুলির থাকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র সচেতনতা। এই সচেতনতাগুলিকে কোনো একটি দৃষ্টিকোণে বেঁধে ফেলা হয় না—তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে অথচ উপন্যাসে তাদের সমান মূল্য। কখনোই মনে হয় না লেখক একটা সচেতনতাকে অন্য সবগুলো থেকে আলাদা মূল্য দিচ্ছেন। এই সচেতনতাগুলি শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে একটা উচ্চতর শৃঙ্খলায় বাঁধা পড়ে। এই সচেতনতাগুলির স্বাতন্ত্র্য ও পরস্পর বিচ্ছিন্নতা ও সমমূল্য থেকেই সেই উচ্চতর শৃঙ্খলা তৈরি হয়। সেই শৃঙ্খলাকেই বাখতিন বলছেন 'পলিফনিক উপন্যাসের শৃঙ্খলা'।

এই শৃঙ্খলা বা পলিফনি কী ভাবে দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসের ফর্মেরই অব্যবহিত থাকে, বা, বলা ভাল এই শৃঙ্খলা বা পলিফনি তৈরি হয়ে ওঠাটাই কী করে দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসের ফর্ম বা আধার, তার প্রায় একটা রেখাচিত্রই বাখতিন অন্য এক প্রসঙ্গে আঁকেন।

তার আগে অবিশ্যি দস্তয়েভ্স্কির নায়ককল্পনা প্রসঙ্গে বাখতিনকে বলে নিতে হয়—১. দস্তয়েভ্স্কির নায়করা স্বাধীন স্বাবলম্বী, পরিণতিহীন, অনির্দিষ্ট। (বাখতিন বলতে চান, এই নায়করা ঔপন্যাসিকনিরপেক্ষ আর সেটা বলার জন্যে পলিফনিক উপন্যাসে লেখকের ভূমিকাও তিনি ব্যাখ্যা করেন। এখানে আমরা সে-প্রসঙ্গে যাচ্ছি না)। ২. দস্তয়েভ্স্কির নায়ক পরিকল্পনা আসলে একটা ডিসকোর্সের পরিকল্পনা। এবং এই চরিত্র সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের ডিসকোর্স, আসলে একটি ডিসকোর্স সম্পর্কে তাঁর ডিসকোর্স।

এর পরে বাখতিনকে আরো জানাতে হয়—১. দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসে চিন্তার কোনো বিবর্তন নেই, এমনকী নায়কের ব্যক্তিগত চৈতন্যেরও সে-বিবর্তন নেই। তাঁর নায়করা শুরু থেকেই দেখাজানার ও চিন্তার একটা ভাঁড়ার নিয়ে চলে। উপন্যাস জুড়ে চলে সেই ভাঁড়ার সামলানো। ২. দস্তয়েভ্স্কির উপন্যাসের যে-কোনো চরিত্রই তৈরি হয় সম্বোধনের জন্যে। ৩. দস্তয়েভ্স্কির শিল্পভুবনের কেন্দ্রে আছে সংলাপ—সংলাপ কোনো মাধ্যম নয়, সংলাপই উদ্দিষ্ট। ৪. এই অনন্ত সংলাপ কখনোই গল্পনির্ভর হতে পারে না। ৫. সব সময়ই বাইরের সংলাপ থাকে ভিতরের সংলাপের সঙ্গে বাঁধা আর এই দুই সংলাপই থাকে সেই মহাসংলাপের সঙ্গে বাঁধা—যার ফলে তার প্রত্যেকটি উপন্যাসই হয়ে ওঠে এক সাংলাপিক কল্পনা—ডায়ালজিক ইমাজিনেশন-এর রূপায়ণ

উপন্যাসে এই সংলাপ ঘটে ওঠে কোন বাস্তব পদ্ধতিতে? বাখতিন তার একটা স্কিম দেন। সেখানে 'প্রত্যক্ষ ডিসকোর্স' ও 'পরোক্ষ ডিসকোর্স' এই দুই ভাগের পর তিনি নির্দেশ করেন তৃতীয় আর-একধরণের ডিসকোর্স। 'প্রত্যক্ষ ডিসকোর্স'-এ অর্থের ওপর বক্তার সম্পূর্ণ অধিকার। 'পরোক্ষ ডিসকোর্স'-এ আর-এক ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষ বাচনে।

আর, এই তৃতীয় ধরণের ডিসকোর্স-এ থাকছে দুটো কণ্ঠস্বর। কারণ, তার উদ্দিষ্ট হিশেবে থাকে আর-একটি ডিসকোর্স। এই দ্বিস্তর ডিসকোর্স-এর নিদর্শন আমরা দৈনন্দিনে পাই যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুপস্থিত আর-একজনের কথা একটু বেঁকিয়ে আমরা উপস্থিত একজনকে জানাই, এমনকী আর-একজনের গলার স্বরও নকল করি। ঔপন্যাসিক যখন আর-একজনের বিবরণ দেন—তার ভিতরও দুটো স্বরই সক্রিয় থাকে, লেখকের স্বরের মধ্যেই নিহিত থাকে যার কথা তার মত করে বলা হচ্ছে তারও স্বর। এটা দ্বিস্বর ডিসকোর্স বটে। তবে নিষ্ক্রিয়। প্যারডি আর লেখকের বিবরণ—এই দুই ধরণের দ্বিস্বর-ডিসকোর্সের পরেও বাখতিন আর-একধরনের দ্বিস্বর ডিসকোর্সের নাম দেন 'সক্রিয় দ্বিস্বর ডিসকোর্স'। সেখানে বাইরের কথা সাজানো হয় ভিতরে একটা অর্থ ঢুকিয়ে দিয়ে, সেখানে আত্মকথা বলা হয় বা স্বীকারোক্তি নেয়া হয় আর-একটা কণ্ঠস্বরকে লুকিয়ে রেখে, সেখানে অন্য কোনো বক্তার প্রতি কটাক্ষে কোনো মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়া হয়, সেখানে অন্য কোনো সংলাপের জবাবে কিছু বলে দেয়া হয়, সেখানে সংলাপ গোপন করে কথা বলে যাওয়া হয়।

এই সক্রিয় দ্বিস্বর ডিসকোর্সই দস্তয়েভস্কির উপন্যাসের সংলাপনির্ভরতার প্রধান ধরণ। তাই তার একটি চরিত্র যখন কথা বলে—'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট', 'ইডিয়ট', 'ব্রাদার্স কারামাজোভ', 'পজেজড' বা 'নোটস ফ্রম দি আন্ডারগ্রাউন্ড'-এ চরিত্রগুলি তো কথাই বলে যায়, এক বৈঠক থেকে আর-এক বৈঠকে, আর ঘটনা ঘটে এই দুই বৈঠকের অন্তর্বর্তী সময়ে পাঠকের নেপথ্যে—তখন সেই চরিত্রের কথাগুলিতে আরো বহু বহু বহু চরিত্রের বহু বহু বহু কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তাই তারা কখনো একজনের কথার জবাবে আর-একজন কথা বলে না। দস্তয়েভস্কির চরিত্ররা কখনো আলাপ করে না। তারা তাদের নিজেদের কথা বলে। তাই সে-সংলাপগুলি এত দীর্ঘ। সেই চরিত্রের জীবনের অনেকটাই যে ঐ সংলাপের ভিতর দিয়ে আমরা জানি—সঙ্গে আরো বহু চরিত্রকে।

এই ভাবেই 'ডায়ালজি' থেকে তৈরি হয় 'পলিফনি'।

দস্তয়েভস্কিকে নতুন ভাবে পড়ান বাখতিন। আর সেই জন্যে উপন্যাসকেই নতুন ভাবে দেখান।

কোনো সাহিত্যতাত্ত্বিকই এর বেশি কিছু করতে পারেন না।

১৯৮৯

পুনশ্চ

বাখতিনের আরো দুটি বই বেরিয়েছে। 'দি স্পিচ জঁারস অ্যান্ড আদার লেট এসেজ' (১৯৮৭), আর, 'আর্ট অ্যান্ড অ্যানসারেবিলিটি' (১৯৯০)। দুটি বইই তাঁর কতকগুলি বিচ্ছিন্ন লেখার সঙ্কলন—মাইকেল হলোকুইস্ট-এর সম্পাদনায়। বের করেছেন ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস প্রেস। দ্বিতীয় বইটির প্রবন্ধগুলি বাখতিনের ২৪-২৫ বছর বয়সে লেখা। তার একটিতে 'অথর' ও 'হিরো'র সম্পর্ক নিয়ে। অনেক পরে রোঁলা বার্থ, বাখতিন না-জেনেই কথাটা নতুন করে তুলেছিলেন।

২০০২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পের জনসংযোগ

থিওডর ডবলিউ অ্যাডরনোর লেখা 'মিনিমা মোরালিয়া' এই লেখাটির কারণ। কিন্তু তা সম্পূর্ণ পড়া হয়ে গিয়েছে এমন কথা বলতে পারছি না। পড়ে, বা বুঝে উঠতে না-পারার একটি মুখ্য হেতু ব্যক্তিগত অক্ষমতা বটেই, কিন্তু অপর কারণটিও নেহাত কম প্রধান নয়। অ্যাডরনোর দার্শনিক নান্দনিক রচনা শুধু বিষয়ের কারণেই দুর্গম নয়, তাঁর ভাষা ও ভঙ্গিতেও আছে এক চর্চিত দুর্বোধ্যতা। সে-দুর্বোধ্যতাও কোনো কুশলতার চর্চামাত্র নয়, দুর্বোধ্যতায় অ্যাডরনোর দার্শনিক বিশ্বাস। যে-কোনো রচনার সহজবোধ্যতা সে-রচনাকে শিল্পচ্যুত করে—অ্যাডরনো সাহিত্য সম্পর্কেও এ-রকম ভাবছেন, সংগীত বিষয়েও এ-রকম ভাবছেন। তার ওপর তিনি একটি বিষয় নিয়ে লিখতে-লিখতেই পাঠককে জানিয়ে যেতে থাকেন তিনি ঐ-ভাষার ঐ-ভঙ্গিতে লিখছেন। এ যেন লিখতে-লিখতে নিজেরই সমালোচনা করে যাওয়া বা পাঠককে জানিয়ে যাওয়া কীভাবে পড়তে হবে। তাই তাঁর অনেক লেখাই হয়ে ওঠে আসলে দুটো লেখা—বিষয় নিয়ে তাঁর বক্তব্য আর শৈলী নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যান।

তেমনি একটি রচনায় একবার অ্যাডরনো দার্শনিক দেকার্তের 'ডিসকোর্স অন মেথড' লেখাটি নিয়ে পড়েছিলেন। দেকার্তে লেখালেখির যে-চারটি নিয়ম বাতলেছিলেন প্রথমটি বাদ দিয়ে তার বাকি তিনটিই বাতিল করে দিয়েছিলেন অ্যাডরনো। দ্বিতীয় নিয়মটিতেই দেকার্তের পরামর্শ, বিষয়কে ছোট-ছোট অংশে ভাগ করা সম্ভব, ভাগ করে নিতে হবে, কারণ, যে-উপাদানগুলি দিয়ে বিষয়টি তৈরি তা ব্যাখ্যা করলেই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয়ে যাবে। যেন, অনেকটা ডাক্তারির ব্যবচ্ছেদের মত। অ্যাডরনোর আপত্তি, টুকরোগুলো মিলে তো সমগ্রটি তৈরি হয় না, বরং, সমগ্রটি তৈরি হয়ে গেলেই টুকরোগুলোর অর্থ বোঝা যায়, নইলে তো সেগুলি অবান্তর। দেকার্তের তৃতীয় নিয়মের সুপারিশ, সবচেয়ে সহজ কথা দিয়ে শুরু করে ধীরে-ধীরে ও ধাপে-ধাপে সবচেয়ে কঠিন কথাগুলির দিকে এগতে হবে। অ্যাডরনোর কাছে মনন একটা জটিল প্রক্রিয়া, সেটা ধাপে-ধাপে ঘটে না ; রাসায়নিক বিক্রিয়ার মত একবারে ঘটে। মননের সমগ্র জটিলতাকেই ধরতে হবে। দেকার্তের চতুর্থ নিয়ম—সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে মূল কথা এতটাই বিস্তারিত করতে হবে যাতে কোনো কিছু বাদ না পড়ে। অ্যাডরনো মনে করেন, যেখানে স্থিতাবস্থার বিরোধী একটা বাস্তবতাকে উপস্থিত করতে হবে, সেখানে এমন কথা আসে কী করে যে কিছুই বাদ দেয়া যাবে না। অ্যাডরনো বলেন, বরং 'এসে' (essay) তো ভাঙাচোরা বাস্তবেরই একটা ভাঙাচোরা চেহারা হয়ে উঠতে পারে, সেই ভাঙাচোরাটা দেখানোই তো কাজ, সেটাতে পলেস্তারা দেয়া নয়। অ্যাডরনো বেশ সূত্রই বানান—'এসে' আধাবিজ্ঞান ও আধাশিল্প। এর বিষয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, তা থেকেই তৈরি হয় সংস্কৃতির দর্শন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেকার্তের রচনাবিষয়ক নিয়মগুলো সম্পর্কে অ্যাডরনোর এই আপত্তি থেকেই নিজের লেখা তিনি কী ভাবে লিখতে চান তার একটা আন্দাজ জোটে। এইটুকু আন্দাজ নিয়ে পড়তে গেলে অবিশ্যি ঠেকে শিখতে হয় আন্দাজটা যথেষ্ট নয়। তিনি কী বলতে চান ও কী ভাবে বলতে চান এ নিয়েই তাঁর লেখাগুলির চেহারা-চরিত্র তৈরি হয়। সেই চিন্তা থেকেই তিনি পাঠকের কাছে পৌঁছনোর সমস্যাটা দেখেন। পাঠকের দিক থেকে রচনার কাছে পৌঁছুনোর সমস্যা তিনি দেখতে চান না। এ যেন একটা সাঁকো তৈরির ব্যাপার যা দু-পার থেকে তৈরি হয়ে উঠবে বটে কিন্তু অ্যাডরনো শুধু তাঁর নিজের পারের দিক থেকে সামনের শূন্যতার অর্ধপথ পর্যন্ত প্রসারিত সেতুটির নির্মাণসংকট ও সমাধান নিয়ে কাতর। ওদিক থেকে শূন্যতার বাকি অর্ধপথ শূন্যই থেকে গেল কী না সেটা তাঁর চিন্তনীয় বিষয় নয়। করণীয় তো নয়ই। তিনি কোনো 'টার্ম' বা তাঁর ব্যবহৃত পদের সংজ্ঞা দেন না। একই পদ নানা অর্থে ব্যবহার করে যান। কারণ যে-শব্দটিকে তিনি 'পদ' বা 'টার্ম' হিশেবে ব্যবহার করছেন সেই শব্দটি তো ভাষার অন্যান্য শব্দের মতই বহু যুগের বহু অর্থে দ্যুতিগর্ভ হয়ে আছে। একই শব্দের ভিতরে অনেক অর্থের দ্যুতি নিহিত থাকে বলেই তো শব্দ এমন বহুঅন্বয়ময় হয়ে উঠতে পারে। শব্দ থেকে এই 'মিথিক্যাল রিমাইন্ডার', স্মৃতির অবশেষটুকু মুছে দিয়ে তাকে যদি গাণিতিক বিভাগের পরিভাষাতুল্য করে ফেলা হয় তা হলে তো শব্দ তার সত্য থেকে চ্যুত হবে। তাই শিল্প-সাহিত্যের আলোচনায় কোনো 'টার্ম' বা 'পদ' পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। পাঠকের সংযোগের জন্যে যদি শব্দের শরীর থেকে অর্থের বহুব্যাপ্তিকে ছেঁটে দেয়া হয় তা হলে পাঠক সেই শব্দমালায় সমাজ ও সভ্যতার যে-সত্য গ্রথিত হয়ে আছে তার কাছে পৌঁছতেই পারবে না। অ্যাডরনোর কাছে শিল্পসাহিত্যের নানা ফর্ম বিচ্ছিন্ন কিছু নয়—সমাজ ও সভ্যতার সমগ্রতার অংশ। শিল্প-সাহিত্যের আলোচনা তাই তাঁর কাছে সমাজেরই বিচার ও সমাজেরই দর্শন। এই একই বোধ থেকে অ্যাডরনো তাঁর লেখায় কোনো প্রতিষ্ঠিত বা পরিচিত 'কনসেপ্ট' বা ধারণাও ব্যবহার করেন না, নিজেও কোনো নতুন ধারণা তৈরি করেন না। বাস্তবতার সবটুকু কোনো কনসেপ্টই ধরতে চায় না। কনসেপ্ট চায় বাস্তবতার সূত্র বানাতে। একটা ধারণাকে ধরে নিয়ে যদি কথাগুলো বলা যায় তা হলে আসলে আরো বহু ধারণাকে আড়ালে ফেলে দেয়া হয়। কোনো 'কনসেপ্ট' নয়, কোনো 'টার্ম' নয়—সমালোচনা হবে একটা স্বাধীন রচনা যেখানে পাঠক বাস্তবতাকে তার সমগ্রতায় চিনবে—যেমন একটা ছবিতে, বা গানে, বা সাহিত্যে চেনে।

অথচ লেখার ব্যবহার্য উপকরণগুলি নিয়ে অ্যাডরনোর খুবই ব্যস্ততা—লেখার শিরোনাম কী হবে, যতিচিহ্ন কী ভাবে বসবে, বিদেশী শব্দ তিনি কী ভাবে ব্যবহার করেছেন, বাক্যগঠন ও শব্দার্থের সংকট কী ভাবে মিটবে, এ-সব নিয়েও তাঁকে লিখতে হয়, বা কোনো লেখার ভিতরেই তিনি এ-সব নিয়েও কথা বলে নেন।

প্রায় নৈয়ায়িকের নিষ্ঠায় যিনি দর্শনের নৈয়ায়িক কাঠামো ভাঙেন তিনি নিজেকে দার্শনিকই ভাবতেন হয় তো, কিন্তু প্রায় সারা জীবন তিনি দর্শনের মূল সংজ্ঞা পুনরুদ্ধারের পথ খুঁজছেন। ইয়োরোপের সমস্ত দার্শনিক মেথড আর জ্ঞানতত্ত্বকে ধূলিসাৎ করে জার্মানিতে নাৎসিবাদ ক্ষমতায় এসেছিল। এরপর আর এনলাইটেনমেন্টের তত্ত্ব চলে না। অ্যাডরনোর কাছে তাই দর্শন কোনো 'মেথড' নয়। এক-একটি দার্শনিক প্রস্থান এক-একটি মেথডের সঙ্গে বাঁধা পড়ে দর্শনের মূল সংজ্ঞা নষ্ট করে ফেলে। তিনি দর্শনের এই মেথডেরই বিরুদ্ধে। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর দর্শন তিনি কোনো দার্শনিক বই লিখে প্রমাণ করেন না। তাঁর কাছে 'এসে' বা রচনাই হচ্ছে দর্শনের যোগ্য কাঠামো।

এমনকী আমরা যাকে আজকালকার ভাষায় 'রিভিয়ু' বলি, অ্যাডরনো মনে করেন সেগুলোই হচ্ছে দার্শনিক আলোচনার যথোচিত আধার। সেখানে হেতু-প্রত্যয়ের মূলে যাবার দায় নেই, সেখানে সিদ্ধান্তের কোনো দায়িত্ব নেই। একটা গান, বা ছবি, বা কবিতা, বা ভাস্কর্যের আলোচনায় সমাজের ও ইতিহাসের সত্য উঠে আসতে পারে আর সেই সত্যই শিল্পের প্রকরণের সমস্যাকে চিনিয়ে দিতে পারে। এ-রকম আলোচনা যিনি করেন, তাঁকে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরেই এগতে হবে আর সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা কোনো একটি মাত্র মেথডে বাঁধা হতে পারে না।

অ্যাডরনো তাই টুকরো-টুকরো লেখাই লিখে যেতেন। সেই টুকরোগুলো থেকেই পরে তৈরি হয়ে উঠত তাঁর বইগুলো। বইয়ের চেহারায় এলেও—টুকরো লেখার খণ্ডতাতেই তিনি তাঁর কথা বলতেন।

এতগুলো কথা বলে রাখতে হল হয়তো ক্ষমার্হ এই ব্যক্তিগত অহমিকাটুকু বজায় রাখতে যে অ্যাডরনো পড়ে ওঠা সত্যি-সত্যি বেশ দুরূহ। এ-কথাগুলিরও কিছু অন্তত জানা গেল, 'মিনিমা মোরালিয়া' বইটি পড়ার কাজ সহজতর করে নেয়ার উদ্দেশ্যে গিলিয়ান রোজ-এর লেখা 'দি মেলানকলি সায়েন্স—অ্যান ইনট্রোডাকশন টু দি থট অব থিয়োডর ডবলিউ অ্যাডরনো' বইটি পড়ে।

অ্যাডরনো সম্পর্কে আমাদের উৎসাহ অনেক দিনের। কয়েক বছর আগে 'পরিচয়'-এর একটি সংখ্যায় অ্যাডরনোর একটি লেখা অনুবাদও করেছিলাম সেই উৎসাহের সূচনায়। কিন্তু ইংরেজিতেও অ্যাডরনো অনুবাদ খুব বেশি দিন শুরু হয়নি। যাও-বা হয়েছে আমাদের দেশে পেয়ে ওঠা বেশ দুর্ঘট। ফলে একবারের বইমেলায় প্রায় একই সঙ্গে অ্যাডরনোর 'মিনিমা মোরালিয়া' ও 'থিয়োরি অব এনলাইটেনমেন্ট' পেয়ে যাওয়ায় সেই পুরনো উৎসাহ ফিরে এল।

উৎসাহের কারণটা খুব ব্যক্তিগত নয়, তা আমাদের সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে জড়িত। আমাদের দেশে এখন 'মিডিয়া এক্সপ্লোশন', প্রচার মাধ্যমগুলির বিস্ফোরণ ঘটে যাচ্ছে। একের পর এক দৈনিক কাগজ বেরচ্ছে, ইংরেজিতে ও ভারতীয় অন্যান্য ভাষায়, ম্যাগাজিনের তো কথাই নেই, দূরদর্শনের একটার পর একটা নতুন কেন্দ্র হচ্ছে, নতুন-নতুন চ্যানেলও হচ্ছে। রেডিও হয়তো একটু বয়স্ক বলেই দমে আছে। কিন্তু টিভিও এখনো পকেটে নিয়ে ঘোরার মত হয়নি—সেখানে ট্র্যানজিস্টরই ভরসা। ফলে, আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে ব্যক্তিগত জীবন সব কিছুই প্রচারিত হয়ে যাবার বিষয় হয়ে উঠছে। নেহাত পারিবারিক, নেহাত ব্যক্তিগত, কোনো ঘটনাও সংবাদ হয়ে উঠছে এমনকী আমাদের এই কলকাতা শহরেও। আমাদেরই এক প্রবীণ কবির কথা জানি, যিনি ব্যক্তি হিশেবে হয়তো-বা একটু একান্ততাই পছন্দ করেন, অন্তত বারকয়েক তাঁর বন্ধুবান্ধব স্ত্রী-কন্যা সমন্বিত ব্যক্তিগত, দৈনিক কাগজে খবর হয়ে গিয়ে তাঁকে নিজের কাছেই অপ্রস্তুত করেছে।

কিন্তু এই যে এত কাগজ, এত খবর, তার একটির থেকে আর-একটিকে আলাদা করার আর-কোনো উপায় নেই—হরফের চেহারা ছাড়া। কিন্তু ওটুকু পার্থক্যও সব সময় থাকে না কারণ আধুনিক ফটো টাইপ সেটিং-এর টাইপ তৈরি করেন শাহেবরা। তাঁরা বাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরফের আর-কত বৈচিত্র্যই-বা সাধতে পারেন। আমরা আমাদেরই হরফ শাহেবদের কাছ থেকে ধার করে এনে প্রতিদিন নতুন নতুন কাগজ বের করছি। একটি কাগজের সঙ্গে আর-একটি কাগজের প্রায় কোথাও কোনো তফাৎ ঘটে না, যাতে না-ঘটে সে-বিষয়েও সবাই সতর্ক থাকে। একই খবর বিভিন্ন শিরোনামে আমরা পড়ে যাচ্ছি, পড়ে যাচ্ছি। সব কাগজই আমাদের কাছে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি সবার আগে পৌঁছতে চায়। জনসংযোগ, জনসংযোগ, জনসংযোগই এক ও একমাত্র লক্ষ। বিজ্ঞাপনের ভাষা, টেলিভিশন রেডিয়োতে বিজ্ঞাপনের শব্দ আর ছবি—সবাই আমাদের কাছে অন্যদের চাইতে আগে পৌঁছে যেতে চাইছে। আমরা—পাঠক, দর্শক বা শ্রোতা—শব্দের বা ছবির পেছনে ছুটছি বা, শব্দ বা ছবি আমাদের পেছনে ছুটছে।

এটা একটা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। কিন্তু শিল্পী-সাহিত্যিক যখন তাঁর গান গাইতে বা ছবি আঁকতে বা কবিতা-উপন্যাস লিখতে চান, তখন তাঁকে এক বিপরীত প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে যেতে হয়। কারণ তিনি সুরকে অবলম্বন করে অপধ্বনিতে নিমজ্জন থেকে ভেসে উঠতে চান, কথার অর্থের পেছনে-পেছনে অজ্ঞাতবাসে যেতে চান, রং ও রেখার গুপ্ত খনি আবিষ্কার করতে চান। তা হলে এখন শব্দ বা ছবি বা গান বা রং যে-দ্রুততায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঢুকে পড়ছে, নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেও ঢুকে পড়ছে—সেই দ্রুততার এক বিপরীত পথ তাঁকে খুঁজে নিতে হবে, যেখানে একটি শব্দ তার নিকটতম প্রতিবেশী থেকেও স্বতন্ত্র হয়ে যাবে, অথচ সেই স্বাতন্ত্র্যই তাকে প্রতিবেশীর ঘনিষ্ঠ করে তুলবে, যেখানে অর্থবোধ একটা মানসিক প্রক্রিয়া হয়ে উঠবে। জনসংযোগ নয়, শিল্পের সংযোগের জন্যে যেখানে অপর পার থেকেও সেতুনির্মাণের প্রয়োজন হবে। কেউ ভাবতে পারেন, কেউ-কেউ এমন ভাবেনও দেখি, লোকের পড়ার জন্যেই তো লেখা, যে-লেখা লোকে পড়ে না সে-লেখা লিখে কী লাভ, অন্য কেউ ভাবতে পারেন, লোকের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবার জন্যে লিখব না কিন্তু লোকে যাতে পড়তে না-পারে সে জন্যেও নিশ্চয় লিখব না।

এর বিপরীতে এমনও কেউ ভাবতে পারি, একটু বাড়াবাড়ি করেই ভাবতে পারি—লেখাটাই হয়ে উঠবে একটা দুর্গের মত, তার গড়নে থাকবে প্রধানত আত্মরক্ষার দুর্ভেদ্য প্রাকার, তার মিনারে থাকবে আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত প্রহরা, তার জীবনযাত্রা হবে এমন যে অবরোধের মধ্যেও তা অব্যাহত থাকবে, খবরের কাগজের পঠনাভ্যাস সেখানে প্রতিহত হতে থাকবে, শব্দের অভ্যস্ত পরিচয় ভেঙে যাবে। লেখা কেন হয়ে উঠবে না এমনই দুর্গ, যেখানে পাঠককেও ঢুকতে হবে প্রস্তুতি নিয়ে। পুরো সেতুর বদলে মাত্র আধখানা সেতুই কখনো-কখনো, যেমন এখন, হয়ে উঠতে পারে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। কেউ-কেউ তো সেই উপায়টি বেছে নিতে পারেন। দুর্বোধ্যতা তো কখনো, কোনো সময়ে লেখাটিকে বাঁচিয়েও দিতে পারে। অ্যাডরনো সেই দুর্বোধ্যতার, শিল্পের চর্চিত দুর্বোধ্যতার একটা সমর্থন জোগাতে পারেন। অ্যাডরনোতে তাই আমাদের এমন উৎসাহ।

কিন্তু অ্যাডরনোই কেন? আর কেউও এই প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে দিতে পারতেন। তেমন কোনো দার্শনিক সমালোচক তত দুর্লভ নন যাঁরা জনসম্পর্কশূন্য শুদ্ধতার জন্যে শিল্প-সাহিত্যকে দুর্বোধ্যতার অভিজাত আড়াল দিতে চান।

অ্যাডরনোর কাছে শিল্প-সাহিত্য ছিল নাৎসিবাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার বর্ম। গত শতকের শেষ দশক থেকেই জার্মানিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও জ্ঞানচর্চার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধনতন্ত্রের বিকাশ ও দুনিয়ায় জার্মানির নতুন ভূমিকা নিয়ে নানা ধরণের আলোচনা শুরু হয়। পুরনো সব দার্শনিক পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক রীতি ছেড়ে দিয়ে এক নতুন দর্শন ও নতুন বিজ্ঞানের জন্যে যেন তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। ১৯২০ সালে ফ্র্যাঙ্কফুর্টে ইনস্টিটিউট ফর সোস্যাল রিসার্চ তৈরি হয়। বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার মধ্যে কোনো পার্থক্য না করে তার পদ্ধতিগুলো থেকে কতকগুলি সাধারণ সত্যে যাতে পৌঁছনো যায় তার চেষ্টা এই স্কুলে চলতে থাকে। তিরিশের দশকের শুরুতে হোর্কহাইমার এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তখন থেকেই তাঁর পরিচালনায় 'জার্নাল ফর সোস্যাল রিসার্চ' বেরতে থাকে। অ্যাডরনো এই প্রতিষ্ঠানের কর্মী ছিলেন আর এই জার্নালেই তাঁর লেখাগুলি নিয়মিত বেরত। হিটলার ক্ষমতায় আসার পর এই স্কুলের কর্মীরাও জার্মানি ছেড়ে এসে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। হোর্ক হাইমার ও অ্যাডরনো শেষ পর্যন্ত মার্কিন দেশে এসে এই স্কুলের একটি শাখা আবার তৈরি করেন, জার্নালটিও নিয়মিত বেরতে শুরু করে। যুদ্ধের শেষে হোর্ক হাইমার ও অ্যাডরনো পশ্চিম জার্মানিতে ফিরে যান ও সেখানে স্কুলটি আবার শুরু হয়। কিন্তু তত দিনে নতুন পশ্চিম জার্মানির শাসকগোষ্ঠী ও প্রধান জনমতের সঙ্গে এঁদের বিরোধ বাড়তে থাকে। জার্মানি ছেড়ে যাবার আগেই অ্যাডরনো তাঁর বিভিন্ন রচনায় জার্মানিতে নাৎসিদের জয়ের কারণ খুঁজছিলেন। সত্যি করেই যখন সেই জয় ঘটে গেল ও তাঁদের দেশ ছাড়তে হল, তখন প্রবাসে, প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁদের প্রধান চেষ্টা ছিল একই সঙ্গে জার্মান সংস্কৃতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার রক্ষণ, আর জার্মান সমাজে যেখানে নাৎসিবাদের মূল নিহিত ছিল তার উদ্‌ঘাটন। এ বড় কঠিন চেষ্টা। ফলে তাঁরা একই সঙ্গে উভয় পক্ষের শত্রু হয়ে পড়লেন। ষাটের দশকে জার্মানিতে যে ছাত্র বিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল তা থেকে হোর্কহাইমার ও অ্যাডরনো বাদ পড়েন নি। হোর্কহাইমার অসুস্থ, অ্যাডরনো মারা যান ১৯৬৯-এই। আজ হোর্কহাইমার ও অ্যাডরনোর রচনাবলিতে নাৎসিবাদ আক্রান্ত জার্মান সংস্কৃতির এক অন্য ভাষা আমরা পাচ্ছি—মার্কসবাদের সহজ-সরল কোনো সংস্করণের সূত্রে সে ভাষ্য কোনো জনপ্রিয় ব্যাখ্যা দেয় না, আবার মার্কসবিরোধী কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও সে ভাষ্যে নিহিত নেই। ইহুদি পিতার সন্তান অ্যাডরনোকে (জন্ম ১৯০৩) নাৎসিরা ১৯৩৩-এ ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেয়। ১৯৩৪-এই তাঁকে লন্ডনে চলে আসতে হল। অক্সফোর্ডে কিছুদিন কাটিয়ে ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকাপাকিভাবে চলে গেলেন। ১৯৪১ থকে ক্যালিফর্নিয়ায় হোর্কহাইমার, হানস আইসলার, টমাস মান ও অন্যান্যদের সঙ্গে অ্যাডরনো 'দি অথরিটেরিয়ান পার্সনালিটি' প্রকল্পে কাজ শুরু করেন। অর্থাৎ অ্যাডরনোর কর্মজীবনের প্রথমার্ধ কেটেছে জার্মান ইহুদি হিশেবে নাৎসিবাদের শিকার হয়ে। আর, মহাযুদ্ধের পরে তাঁর কর্মজীবনের দ্বিতীয়ার্ধ কেটেছে পশ্চিম জার্মানিতে নাৎসিবাদ সম্পর্কিত প্রশ্ন নতুন করে উত্থাপনের পরিবর্তিত অবস্থায়। পশ্চিম জার্মানিতে নাৎসিবাদের কার্যকারণ ব্যাখ্যার রাজনৈতিক অবস্থা তৈরি হল না। অ্যাডরনো তাই সেখানেও যেন প্রবাসেই এলেন, তাঁর প্রাচীন সব প্রশ্ন নিয়ে। বোধহয়, নিজের জীবন, যা অনেক জার্মান লেখক বুদ্ধিজীবীরই জীবনের অনুরূপ, অ্যাডরনোর কাছে শিল্পসংস্কৃতির নান্দনিক-সামাজিক প্রশ্নকে এমন অব্যবহিত করে তুলেছিল। আর তাই তাঁর সমস্ত তত্ত্বের বা মন্তব্যের মধ্যেই গোপন থাকে এক আত্মজীবনী। নিজের সেই আত্মজীবনীর তত্ত্ব লিখতে গিয়েই কখনো তিনি তাঁর বই 'মিনিমা মোরালিয়া'-কে বলেন তাঁর 'মেলানকলি সায়েন্স' থেকে কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপহার। আবারও বলেন, 'ক্ষুণ্ণ (broken) এক জীবনের কিছু টুকরো।' 'উৎসর্গ'-য় অ্যাডরনো একটু ব্যাখ্যা করেই বলেছেন যে কেন এমন টুকরো লেখাতেই তাঁর আগ্রহ, যে-টুকরো লেখাতে তিনি তাঁর ব্যক্তিগতের অনেকটাই পাঠককে জানাতে পারবেন। তাই এই লেখাগুলি আত্মকথনের মত—অনায়াসে কখনো-বা আসছে হেগেলের কোনো ছোট মন্তব্য, মার্কসের কোনো একটা পদ্ধতি, আজকাল মানুষের স্বভাব কী ভাবে পাল্টে যাচ্ছে তার দু-একটা পথ-চলতি উদাহরণ। দরজা বন্ধ করতে হয় কী ভাবে তা ভুলে গেছে সবাই, কী ভাবে উপহার দিতে হয় তা নিয়ে আর ভাবে না কেউ। অ্যাডরনোর এই ধরণটাকেই কেউ বলেছেন একটু বেঁকিয়ে কথাটাকে উল্টে দেয়ার কৌশল—'আয়রনিক ইনভার্শন'। এই কৌশলটি অ্যাডরনোর খুব প্রিয় কিন্তু 'মিনিমা মোরালিয়া'তে তিনি এর সবচেয়ে ভাল ব্যবহার করেছেন। তাঁর অন্যান্য রচনায় অনেক সময় এই বেঁকিয়ে দেয়াটা ধরা পড়ে না—ফলে তাঁর কথার সোজাসুজি অর্থ যা দাঁড়ায় তাতে তাঁর ঈপ্সিত অর্থের উল্টোটাই পাঠক বুঝে নেয়। ইয়োরোপীয় দর্শনে যে-সব কথা প্রায় প্রতিষ্ঠিত সত্য সেগুলোকে উল্টে দিয়ে অ্যাডরনো পরোক্ষে বুঝিয়ে দেন যে নাৎসিবাদের উত্থান সম্ভব করে তুলে ইয়োরোপ নিজের দর্শনের উচ্ছিষ্ট নিজেই চাটছে কেমন। কিয়ের্কেগার্দ-এর একটি রচনার নাম—'আমৃত্যু অসুখ'। তাতে কিয়ের্কেগার্দ সমাজে প্রচলিত স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিকতা সম্পর্কে ধারণা নিয়ে ভেবেছেন। অ্যাডরনো সেটাকে উল্টে দিলেন 'আমৃত্যু স্বাস্থ্য'। সে-রকমই আর-এক মৌলিক চেষ্টায় তিনি হেগেলের 'সমগ্রতাই সত্য' এই বচনটাই উল্টে দেন 'সমগ্রতাই মিথ্যা।' অ্যাডরনো তত্ত্ব আর বাস্তবের পার্থক্যকেই বলেন, 'আয়রনি'। সেই আয়রনিটাই আজ মিথ্যে হয়ে গেছে।

'মিনিমা মোরালিয়া' বইটি দেখে-দেখে বুঝে নেবার মতই বটে কারণ অ্যাডরনোর কাছে যে-কোনো একটি বইয়ের অর্থই, আত্মপ্রকাশ। সেখানে তিনি নিজেকে এনলাইটেনমেন্টের দার্শনিকদের থেকে আলাদা করেন। তাঁর কাছে কোনো বই কোনো জ্ঞানতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা নয়—আত্মদর্শনের প্রতিষ্ঠা। তাঁর এক পরোক্ষ প্রত্যাখ্যানই থাকে কান্ট, হেগেল, কিয়ের্কেগার্দ-এর পদ্ধতির প্রতি, যদিও তিনি মার্কসবাদের ভিতরে থেকেও মার্কসবাদের বাইরের দার্শনিক প্রস্থানগুলিকে ব্যবহার করতে চান, বিশেষত হেগেলকে তো বটেই। তিনি যেন বরং সঙ্গ পেতে চান প্রাক-এনলাইটেনমেন্ট দার্শনিকদের যাঁরা মানুষকে শেখাতে চেয়েছেন জীবনযাপনের কতকগুলি নিয়ম—বুদ্ধ, কনফুসিয়স থেকে শুরু করে এরিস্টটল পর্যন্ত। আর আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে বেশি বিনিময় নিৎসের সঙ্গে হয়তো এই কারণেই যে নিৎসেও জীবনের কথা বলেন—তাঁর নিজের মত করে, জ্ঞানতত্ত্বের কোনো পদ্ধতি বা কথা বলবার কোনো রীতি প্রমাণ করেন না।

এরিস্টটল লিখেছিলেন 'ম্যাগনা মোরালিয়া', সেটা, মনে রেখেই অ্যাডরনো তাঁর বইয়ের নামটি বেছেছেন। এই ঠাট্টা মার্কসকে মনে পড়ায়। প্রুদোঁর 'ফিলজফি অব পভার্টি'-র জবাবে লেখেন মার্কস 'পভার্টি অব ফিলজফি'। তাঁর বইটির একটা উপনামও অ্যাডরনো ব্যবহার করেন—'রিফ্লেকশনস ফ্রম এ ড্যামেজড্ লাইফ।' ম্যাক্স হোর্কহাইমার-এর পঞ্চাশত্তম জন্মদিন উপলক্ষ হয়েছিল এই বইটি লেখার। সেই দিনটি ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। কিন্তু বইটির তিনটি ভাগে আছে ১৯৪৪, ১৯৪৫ ও ১৯৪৬-৪৭ এই তিন সময়ে লেখা যথাক্রমে ৫০টি, ৫০টি ও ৫৩টি রচনা। সেগুলির কোনোটিই প্রায় এক-দেড় পৃষ্ঠার বেশি নয়, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। 'ডেডিকেশন' নাম দিয়ে অ্যাডরনো একটা ভূমিকাই লিখেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে বলছেন, 'এই তিন ভাগই শুরু হয়েছে সংকীর্ণতম ব্যক্তিগত কথা দিয়ে—প্রবাসী এক মননকর্মীর কথা।' আবার বলেছেন—লেখাগুলি তৈরি হয়ে উঠছিল হোর্কহাইমার আর অ্যাডরনো যখন একটু আলাদা-আলাদা কাজ করছিলেন। ('থিয়োরি অব এনলাইটেনমেন্ট' ওঁদের যৌথ রচনা)। এই রচনাগুলিতে অ্যাডরনো 'কৃতজ্ঞতা আর আনুগত্যে' দেখাতে চেয়েছেন, দুজনের মধ্যে কোনো দূরত্ব নেই, পার্থক্য নেই। অ্যাডরনো লিখছেন, তাঁর সম্পূর্ণ মৌলিক এই বইটি সম্পর্কেই লিখছেন, এ যেন এক অন্তরঙ্গ সংলাপের সাক্ষ্য বইছে : এই বইয়ের এমন কোনো কথা বলা হয় নি যা ততটাই হোর্কহাইমারের নয়, যতটা তার। ১৯৩৪-এ জন্মের দেশ থেকে উদ্বাস্তু এই দুই মননকর্মী যে-বন্ধুত্বে যুদ্ধের প্রস্তুতি, ধ্বংস ও অবসানের বছরগুলিতে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের বিপর্যয়কে বুঝতে চেয়েছেন ইয়োরোপীয় সভ্যতার এক মন্বন্তরের নিরিখে—তা এতই ব্যক্তিগত ও একান্ত, যেন তাঁরা আত্মার সহোদর, অথচ তা এমনই নৈর্ব্যক্তিক যে বন্ধুতার সূত্রে গঠিত এমন রচনাটি হয়ে ওঠে যুদ্ধের সময়েরই এক জার্নাল। এই দশটি বছর হচ্ছে সেই সময় যখন টমাস মান প্রায় একই জায়গায় বসে শেষ করছেন যোশেফ পুরাণ আর শুরু করেছেন ডক্টর ফস্টাস। এই ডক্টর ফস্টাস রচনায় অ্যাডরনো তাঁকে সাহায্য করেন ইয়োরোপীয় সংগীতের তথ্য ও তত্ত্ব বিষয়ে নিয়ত অবহিত রেখে। জার্মানিতে নাৎসিবাদের সমার্থক জার্মান সংস্কৃতি যখন নিজেকে ধ্বংস করে ইয়োরোপীয় আধুনিকতার আত্মপ্রতারণা উদ্‌ঘাটন করে রাখছে ইয়োরোপের মূল ভূখণ্ডে, ঠিক তখনই, জার্মানি ও ইয়োরোপ থেকে দূরে, প্রবাসে, জার্মানির এই সকল স্রষ্টা ও মননকর্মী এমন কিছু রচনা সৃষ্টি করে রাখছিলেন, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে যা জার্মান মানসের শ্রেষ্ঠ ফসল হিশেবে মানবসভ্যতাকে দুহাত পেতে নিতে হবে। সেই ১৯৪৫ থেকে আমরা মাত্র ৪২টি বছর পেরিয়ে এসেছি।

কিন্তু এই কাজ যখন তাঁদের করতে হয়েছে তখন কী গ্রিক ট্র্যাজেডিতুল্য আত্মবৈপরীত্যের মধ্যেই-না এঁদের দিন কেটেছে। 'ব্যক্তির অভিজ্ঞতা থেকে সামাজিক বিজ্ঞান অতুলনীয় শিক্ষা পেতে পারে,...আর তার বিপরীতে বিরাট সব ঐতিহাসিক যুক্তিপুঞ্জ নিয়ে ইতিমধ্যে যা কিছু ঘটানো হয়েছে তাতে সে-সবকে আর জালিয়াতির সন্দেহের ঊর্ধ্বে ভাবা যায় না।'

'তার ধ্বংসের পর্বে ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, আর বাইরে সে যা কিছু দেখেছে, সে-সবই, জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়াচ্ছে আরো একবার।'

'এককালে দার্শনিকরা যাকে জীবন বলে জানতেন, তা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যক্তিগত অস্তিত্বের জগৎ আর শুধু পণ্যভোগের জীবন...।'

'অব্যবহিত জীবন সম্পর্কে যে কিছু জানতে চায়, তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে গোপনতম অবকাশেও ব্যক্তিগত জীবনকে যে নিয়ন্ত্রণ করে সেই নৈর্ব্যক্তিক শক্তিগুলোকে।'

'জীবনের পরিপ্রেক্ষিত এখন একটা তত্ত্বমাত্র। সেই তত্ত্ব শুধু এই সত্যটা গোপন করছে যে কোথাও কোনো জীবন নেই।'

'টেকনোলজি সব ভঙ্গিকে করে দিচ্ছে নির্দিষ্ট, কঠিন মানুষকেও। ভঙ্গি থেকে চলে যাচ্ছে দ্বিধা, ইচ্ছা, সামাজিকতা।...এই ভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আস্তে করে ভালভাবে বেশ সেঁটে একটা দরজা বন্ধ করে দেয়ার ক্ষমতা। গাড়ির ও রেফ্রিজারেটারের দরজা ধাক্কা দিয়ে বন্ধ করা হয়, কোনো-কোনো দরজা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যেতে চায়—ফলে যে-ঢোকে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর পেছন ফিরে না-দেখার অভব্যতা চেপে বসে, যে-গৃহে সে ঢুকছে তার অন্তঃপুরকে রক্ষার দায়িত্ব আর সে নেয় না।'

'উপহার কী ভাবে দিতে হয় আমরা ভুলে যাচ্ছি।...কিছু দেয়ার কাজটা যে কত খারাপ হয়ে গেছে তা বোঝা যায় উপহার দ্রব্যের বাহুল্যে, যেন সে দেবে সে জানেই না, কী দেবে'।

'এই যুদ্ধের পরও জীবন 'স্বাভাবিক' ভাবে চলবে এবং এমনকী সংস্কৃতিও আবার বানিয়ে তোলা যাবে। যেন সংস্কৃতির এই পুনর্নির্মাণ মানেই সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা অস্বীকার করা নয়। এ-সব ভাবা বোকামি, মূর্খতা। লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনাটিই কি চরম সর্বনাশ নয়, এ কি এক অন্তর্নাটক মাত্র? এতে কি ইয়োরোপীয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কোনো ব্যাঘাতই ঘটেনি?'

যাঁরা মার্কসবাদের এক ও অদ্বিতীয় পাঠে বিশ্বাসী তাঁদের অ্যাডরনোর অনেক বক্তব্যই ভাল লাগবে না। কিন্তু এটা ভাল-মন্দ লাগার ব্যক্তিগত কথা নয়। এনলাইটেনমেন্ট যেমন ইয়োরোপের দর্শনচর্চার বহু মুখ খুলে দিয়েছিল, মার্কসবাদ তেমনি আধুনিক বিশ্বের দর্শনচিন্তাকে নানা নতুন সমস্যার সম্মুখীন করেছে। ইয়োরোপে নাৎসিবাদ ও ইয়োরোপীয় চিন্তায় তার প্রভাব অ্যাডরনোকে সমাজ ও শিল্প সম্পর্কে নানা সিদ্ধান্তে উন্মুখ করেছে। সেই জিজ্ঞাসার সঙ্গে মিশে গেছে তাঁর যন্ত্রণাখিন্ন ব্যক্তিগত জীবন। তাই তাঁর লেখা থেকে আমাদের এখনকার ভারতীয় অস্তিত্ব নিয়েও আমরা প্রশ্নাতুর হয়ে উঠতে পারি—সে ভারতীয় অস্তিত্বও আধুনিক বিশ্বেরই একটা অংশ।

১৯৮৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরাণ থেকে পুরাণ

সংস্কৃতে 'আখ্যান' শব্দটির অর্থ বেশ ঘোরালো। যেমন, বেশির ভাগ সংস্কৃত শব্দেরই। ধাতু থেকে সংস্কৃত শব্দের গায়ে লেগে থাকে খনিজচিহ্ন, সেটা কখনোই লুপ্ত হয় না, যুগযুগান্তর ব্যবহৃত হলেও না। আর, সেই খনিজ শব্দটি বাইরের আলো যতই শুষতে থাকে, বাইরের তপ্ত, নোনা বা ঠাণ্ডা হাওয়ায়-হাওয়ায় যতই সে শব্দ হয়ে ওঠে কণা-ভাস্কর্য, ততই তাতে দীপিত হতে থাকে নতুন-নতুন সঙ্কেত, নিশানা, দিশা। শব্দের তখনো অর্থ একটা থাকে বটে কিন্তু কী সে অর্থ তা আমাদের বুঝতে হয় ব্যবহার দেখে, প্রসঙ্গ দেখে। পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ কবি পার্বতী-পরমেশ্বরের সম্পর্কের উপমান পেয়েছিলেন একমাত্র বাক্ ও অর্থের ভিতরকার নিবিড় চিরনবীন পরিবর্তসহ সম্বন্ধে। আমরা সংস্কৃত না জেনে যদি সংস্কৃত বুঝতে চাই, তাহলে আমাদের অগত্যানির্ভর তো একমাত্র অভিধানই আর অভিধানে ব্যুৎপত্তি ধরে বা জ্ঞাপনীয়তা ধরেই শব্দ সাজানো হয়। তাতে এমন ভুল ধারণা তৈরি হয়ে যেতে পারে যে সংস্কৃত শব্দগুলি প্রধানত একার্থক প্রতিশব্দমাত্র। এই ভুলও হতে পারে যে ধাতু থেকে নানা পদ্ধতিতে নতুন-নতুন শব্দসৃষ্টির যে-ক্ষমতা সংস্কৃতকে ভাষা হিশেবে অমরতা দিয়েছে, সেই ক্ষমতা আসলে অসংখ্য ও অসংখ্যতর প্রতিশব্দ তৈরির কৌশলমাত্র। যেমন, অবাঙালি কেউ, কোনো বাংলা অভিধানে যদি দেখেন, 'নারী—স্ত্রী, মহিলা, মেয়ে, মেয়েছেলে, লেডিজ, পুরুষের বিপরীত লিঙ্গ, জেনানা, আর তিনি যদি ধরে নেন এগুলি সমার্থক ও প্রতিশব্দ, সুতরাং, একটি প্রতিশব্দের বদলে আর-একটি প্রতিশব্দ ব্যবহার করা যায়, তাহলে তিনি কত অপ্রস্তুত অবস্থাতেই-না পড়বেন। কৌতুকের বিষয় এটাই যে আমাদের এই কাল্পনিক বাংলা অভিধানে 'নরের স্ত্রী-লিঙ্গ' এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নাও থাকতে পারে, যদিও প্রয়োগের উদাহরণে থাকতেও পারে, 'নরনারী'। সেই 'নরনারী' বাংলাব্যবহারে নরের স্ত্রীলিঙ্গ বা নারীর পুংলিঙ্গকে বোঝায় না, বরং বোঝায় লিঙ্গনিরপেক্ষ এক মানবসমাবেশ বা সমাজ। বাংলা, উর্দু, আরবি, ইংরেজি, ইতালিয়ান, ফরাসি, স্প্যানিশ বা এই রকম আরো যে-সব ভাষা কালানুক্রমে পরে এসেছে তাদের শব্দগুলিতে খনিজচিহ্ন অনিবার্যত থাকে না। এই সব আধুনিক ভাষার ব্যবহার এতই দৈনন্দিন, বিচিত্র, অনির্দিষ্ট যে তার শব্দ বা তার বাচন থেকে খনিজতা ঝরে যায়। মার্কিনি ইংরেজির মত শ-দুই-আড়াই বছরের আধুনিক ভাষা, ব্যবহারের প্রয়োজনে যেমন কখনো ধাতুর দিকেই যায়, তেমনি আবার একেবারে উল্টোদিকেও যায়—মানেটা বুঝিয়ে দিতে পারলেই হল। সে-ভাষার কোনো অক্ষরেখা নেই। নাকী এক যান্ত্রিক প্রয়োজনে মাত্র কয়েক বছর হল আমাদের রপ্ত করতে হচ্ছে 'ওয়েইটলিস্ট'-এর মত ভুল ইংরেজির শব্দ, যাকে বাংলাই বলা যায়। কমপিউটার নাকী আটটির বেশি অক্ষর আছে, এমন শব্দ নেয় না। মার্কিনি অভিধানেও 'ওয়েইটলিস্ট' নেই। এমনকী অক্সফোর্ড-এর 'অ্যাডভান্সড লারনার্স ডিকশনারি'র ভারতীয় ইংরেজির পরিশিষ্টেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। পরের সংস্করণে নিশ্চয়ই থাকবে। ডিকশনারি তো মানুষের জিভের পেছন-পেছন যায়। বিধি-বিধান বানায়। বদলায়। মানুষকেও তার ব্যবহারের প্রয়োজনে ডিকশনারি খুঁজতে হয়—নতুন দরকারে ব্যবহারযোগ্য শব্দ খুঁজতে।

আমাদের একটি এমন নতুন শব্দের দরকার হয়ে পড়ল, যে-শব্দ খুব আঁটোসাঁটো নয়, একটু ঢিলেঢালা ; যে-শব্দে কল্পনা ছড়িয়ে আছে, আবার সেই কল্পনাকে সত্য করে তোলার একটা বাস্তব চেষ্টা ও শ্রমও জড়িয়ে আছে ; যে-শব্দের ভিতর একটা ধারাবাহিকতার প্রবাহ আছে অথচ সে-প্রবাহের শাখাবিস্তারও আছে ; যে-শব্দ কখনো-কখনো একটা প্রধান অর্থকে স্পষ্ট করে তোলে, আবার কখনো-কখনো এক বা একাধিক অপ্রধান অর্থ সেই প্রাধান্যকে দাবিয়ে দেয় ; যে-শব্দ কখনো-কখনো একটা ক্ষমতার আধার হয়ে ওঠে আবার, তারই সঙ্গে, বা কিছু পরে, ক্ষমতার বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত বা বিদ্রোহও হয়ে ওঠে ; যে-শব্দে আকাঙ্ক্ষা আছে, প্রমাণও আছে ; যে-শব্দের ওপর দখলদারি কায়েম করতে পারে সমাজ বা রাষ্ট্রের কোনো শক্তি, আবার সেই দখলদারি থেকে শব্দকে মুক্ত করতেও ঘটে যেতে পারে কোনো সমাবেশ।

আমরা সংস্কৃত 'আখ্যান' শব্দটিকে বেছে নিয়েছি। রাধাকান্ত দেব-এর 'শব্দকল্পদ্রুম'-এ 'আখ্যান'-এর অর্থ দেয়া আছে—'নাম, সংজ্ঞা, ইতিহাস, উপন্যাস'। মনিয়ার উইলিয়ামস-এর অভিধানে আছে—'টেলিং, কমিউনিকেশন, দি কমিউনিকেশন অব এ প্রিভিয়াস ইভেন্ট (ইন এ ড্রামা), এ টেল, স্টোরি, লিজেন্ড।'

অভিধান দুটির অর্থগুলিকে যদি মেলানো যায় তাহলে দাঁড়ায়—নাম, সংজ্ঞা, ইতিহাস, উপন্যাস, বাচন, সংযোজন, অতিকথা।

আমরা এমন একটি শব্দই খুঁজছিলাম যা কখনো অতীতের দিকে চলে যায়—ইতিহাস, অতিকথা যা কল্পনার আশ্রয় নেয়—উপন্যাস যা অনেকের সঙ্গে বিনিময় গড়ে তোলে—বাচন, সংযোজন যা কখনো-বা পাথরের মত কঠিন ও অনড় হয়ে উঠতে পারে—সংজ্ঞা ; যা কখনো-বা সমস্ত বৈচিত্র্য আত্মসাৎ করে নেয়—নাম। যা ইতিহাস, তা অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে যায়। যা বিন্যাস, তাও বর্তমান থেকে অতীতে ও ভবিষ্যতে যেতে পারে।

দুই

ভারতীয়তার একটা পরিচয় ইংরেজরা ভারতীয়দের জন্যে সত্য করে তুলেছিল। সেই একই পরিচয় তাদের নিজেদের জন্যেই প্রথমে তারা সত্য করে নিয়েছিল। সাম্রাজ্যবিস্তারের পক্ষে প্রয়োজনীয় সেই আখ্যান, পৃথিবীর অন্যত্রও, ইংরেজদের ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের কলোনিপ্রতিষ্ঠার যুক্তি হিশেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ভারতবর্ষ সেক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম নয়।

ইয়োরোপীয়রা ভুল মানচিত্রের ভুল জায়গায় পৌঁছে তাকে 'ভারত' বললে সেটাই ভারত, 'ইন্ডিজ', পরে তার আগে একটা 'ওয়েস্ট' জুড়ে দেয়া যায়, বড় জোর। ইয়োরোপীয়রা যেদিন আমেরিকা-ভূখণ্ড চিনল, মাত্র সেদিন থেকেই আমেরিকা ভূমিষ্ঠ হল—'ডিসকাভারি অব আমেরিকা।' ইয়োরোপীয়রা যেদিন উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফ্রিকায় কলোনি বসাল, সেদিনই 'পৃথিবী' অন্ধকার মহাদেশের কথা জানল। পশ্চিম এশিয়াকে মহম্মদ একত্রিত করেছিলেন। তাঁর চাইতেও মহত্তর ভূমিকা তৈরি হল লরেন্সের জন্যে। হিন্দুকুশ আর আরাকান পর্বতমালার ভিতরে ভারত ভূখণ্ডকে তো বিচ্ছিন্নই ধরা হবে, যতদিন উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভাস্কো ডা গামার জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূলে না ভিড়ল। ভারত আসলে উন্মোচিত হল শ দেড়েক বছর পর, যখন কুমারিকা অন্তরীপ ঘুরে ইংরেজের, ফরাসির জাহাজ বঙ্গোপসাগর থেকে, মোহানা থেকে, গঙ্গা ধরে স্থলভাগের দিকে এগল। লরেন্স অব অ্যারাবিয়া, ক্লাইভ অব বেঙ্গল, স্যার সিসিল রোডস—ইয়োরোপীয়দের বিশ্বআবিষ্কারের নতুন দেবদেবী এঁরাই।

এমন নয় যে ইয়োরোপীয়রা, আমাদের বেলায় ইংরেজরা, দিগন্ত পেরতে গিয়ে উপনিবেশ গড়ে ফেলল, আর উপনিবেশ তৈরি হয়ে গেলে সাম্রাজ্যব্যবস্থা বিস্তারিত না হয়ে পারে? আখ্যান একটাই। নতুন পৃথিবীতে পৌঁছুনো, কলোনি গেড়ে ফেলা আর সাম্রাজ্যও ছড়িয়ে দেয়া—সেই আখ্যানের পরম্পরাগত তিনটি পরিচ্ছেদ নয়। একটু লেখাপড়া-জানা মাঝিমাল্লাদের, বা কলম্বাসের মত কোনো নেতার, বা জাহাজের লগবুক থেকে কাহিনী তৈরি করে তুলতে পারে এমন পেশাদার লেখকদের, নতুন-নতুন দেশ খুঁজে বের করার সেই সব গল্প, উপন্যাস, বা বাচন, ঐ আখ্যানের অংশ—যে-অর্থে আখ্যান গল্প-বানানো বোঝায়, গল্প-বলা বোঝায়, উপকথা বোঝায়। সেই সব গল্পের যে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, তাও নয়। এমনও নয় যে এই খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শেষে, যখন ব্যবস্থা হিশেবে, বা একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে, আর-একটি ভৌগোলিক দিক থেকে অসংলগ্ন ভূখণ্ডের জনসমাজের সম্পর্কের আদল হিশেবে, উপনিবেশবাদ আর প্রত্যক্ষ ঘটনা নয়, আমরা পাঁচশ বছর উজিয়ে এই আখ্যানের সমগ্রতা আরোপ করছি। পাঁচশ বছর আগেই পর্তুগাল আর স্পেন যখন নতুন মাটি খুঁজতে সাগরে জাহাজ ভাসিয়েছে, তখন, ফ্লোরেন্স থেকে মানববাদী দার্শনিক পলিজিয়ানো চিঠি লিখেছিলেন পর্তুগালের রাজাকে। তিনি 'নতুন দেশ, নতুন সমুদ্র, নতুন পৃথিবী, এমনকী নতুন নক্ষত্রমণ্ডলী' আবিষ্কারের জন্যে রাজাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, এই সব কথা মনে থাকতে-থাকতে তাঁর, রাজার, লিখে ফেলা উচিত।

সেই অভিযানের গল্প, সেই উপকথা, সেই গল্প-বলায় মিলে যায় কলোনির ইতিহাস। সে-ইতিহাসও তো আখ্যানেরই আর-এক অর্থ। সেই ইতিহাস এখনো লেখা হয়েই যাচ্ছে। এই ভারতবর্ষেরই পশ্চিম মহাদেশীয় সংসর্গের ইতিহাস। এই সুরাট বা কলকাতা বন্দরের ইতিহাস। এই আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের ইতিহাস।

আখ্যান একটাই। সে-আখ্যানে যেমন নতুন পৃথিবীর দিকে অভিযান, উপনিবেশবিস্তার, সাম্রাজ্যনির্মাণ আছে, তেমনি আছে, পৃথিবীর অন্য সব মহাদেশের তুলনায় ইয়োরোপের, আমাদের বেলায় ব্রিটেনের, শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে দ্বিধাহীন আস্থা। এ শ্রেষ্ঠতা সভ্যতাগত শ্রেষ্ঠতা, সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠতা। 'আর্থিক লাভ ও আরো লাভের টান, মশলা, চিনি, দাস, রবার, তুলো, আফিঙ, টিন, সোনা, রুপো, [চা, পাট] এই সবের লোভ কয়েক শতক জুড়ে যথেষ্ট প্রমাণ করে দিয়েছে যে এই লাভের টান ও লোভের টানই পশ্চিমি সাম্রাজ্যগুলির বিস্তারে প্রবল এক উপাদান। ...কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশবাদে এর বেশি কিছু আছে। লাভের চাইতে বড় একটা দায়বোধ ছিল, ছেদহীন চক্রবৃদ্ধির দায়, চক্রবৃদ্ধি চালিয়ে যাওয়ার দায়। সেই দায়বোধ থেকেই সভ্যভব্য মানুষজনও এই ধারণা পোষণ করতেন যে বহু দূরের এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব ভূখণ্ড ও সেখানকার আদিবাসীদের দখলে আনতে হবে, অধীনে রাখতে হবে। অন্যদিকে পশ্চিমের দেশগুলির শক্তি ও ক্ষমতা বাড়াতে হবে যাতে এই সব সভ্যভব্য মানুষজন ভাবতে পারেন যে সাম্রাজ্য বস্তুত এক প্রলম্বিত নৈতিক কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালনের জন্যেই অধীনস্থ, নীচ, পশ্চাৎপদ জাতিগুলিকে শাসন করতে হবে' (এডোয়ার্ড সয়িদ, *কালচার অ্যান্ড ইমপিরিয়ালিজম*, ১৯৯৩)।

সাম্রাজ্য উচ্চতর এক সভ্যতা, উপনিবেশ সেই সভ্যতার মাধ্যম। তাই সাম্রাজ্যের সঙ্গে সভ্যতার বিস্তার আর উপনিবেশ গড়াও সেই একই আখ্যানের অন্তর্গত থেকে গেছে, স্থায়ীভাবে। এমনকী ১৯৪৪ সালে লিউইস মামফোর্ড তাঁর 'দি কনডিশন অব ম্যান'-এ নিজেরই আবিষ্কৃত যন্ত্রে নিজেরই বিনাশ থেকে 'ওয়েস্টার্ন ম্যান'-এর আত্মরক্ষার উপায় খুঁজছিলেন, তখনো উপনিবেশ গড়ার প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যায় বলছেন, 'ধ্বংসের শক্তিরও একটা ভাল দিক আছে যখন তা হয়ে ওঠে গড়ে-তোলার ভূমিকা।' মামফোর্ড এ-কথা লিখেছিলেন ফ্যাসিবাদের অভিজ্ঞতার পর, নাৎসি জার্মানিতে ইহুদিনিধনের বৈজ্ঞানিক নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থার বিবরণও জানার পর। তখনো হিরোশিমা ঘটেনি। ১৯৬২-র নতুন সংস্করণের ভূমিকাতে ঠাণ্ডা যুদ্ধের ফলে পশ্চিমি সভ্যতার নতুন বিপন্নতার উল্লেখ আছে, কিন্তু কোথাও নেই আণবিক অস্ত্র থেকে মানবতার বিনাশ-আশঙ্কা। আণবিক অস্ত্র তো বিজ্ঞানের, উচ্চতর, কৃৎকৌশলের, মহত্তর সভ্যতারও এক প্রমাণ।

সভ্যতার মহত্তরতায় বিশ্বাস ও সাম্রাজ্যবিস্তারের দায়িত্ব এখন আখ্যানটিকে আরো অখণ্ড করে তুলেছে। এখন তো আর পুরনো অর্থে কলোনি নেই। তাই এখন নতুন অর্থে পোস্টকলোনি তৈরি হচ্ছে—তত্ত্বত ও বস্তুত।

৬০-এর দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে, তার আগে থেকেই আলজেরিয়ার স্বাধীনতার পক্ষে ও এমনই আরো কিছু বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমি দুনিয়ার যুব-ছাত্র-বুদ্ধিজীবী সমাবেশ ঘটেছিল। সেই সব সমাবেশও কি সাম্রাজ্যের বিরোধিতা করেছে? বা, সভ্যতার নিরিখে উপনিবেশ গড়ার বিরোধিতা করেছে? করেনি। তাই এক দশক পেরতে না-পেরতেই ১৯৭০-এ, ও আরো পরে ১৯৮০-তে, ঐ ষাট দশকের স্বল্পায়ু ইয়োরোপীয়-মার্কিনি নকশালি বিদ্রোহের বিপরীত দর্শন তৈরি হয়ে যায়। আত্মবঞ্চিত পশ্চিমি সভ্যতা যেন নিজের পাকে জড়িয়ে গিয়ে মনে করছে আর তার উদ্ধার নেই। পশ্চিম যুব-ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের উপনিবেশবাদ বিরোধিতার তুঙ্গপর্ব ষাটের দশক, যখন তারা নানা স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও আলজেরিয়া, কিউবা, ভিয়েতনাম, কঙ্গো, প্যালেস্তাইন, ইরানের উপনিবেশ-বিরোধী সমাবেশকে সমর্থন করেছে। বা, বলা ভাল, এই দেশগুলির ওপর পশ্চিমি আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। ততদিনে তো উপনিবেশগুলি স্বাধীন হয়ে চলেছে ও জোটনিরপেক্ষ এক তৃতীয় দুনিয়া তৈরি হয়ে উঠেছে। ৭০ ও ৮০-র দশকে এমন যুক্তি, তত্ত্ব ও রিগান-থ্যাচারের রাষ্ট্রনীতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যেন সুয়েজ, আলজেরিয়া, ভারত, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও আরো সব কলোনি থেকে চলে-আসাটাই ভুল হয়েছে। যেন চলে-আসাটা সাম্রাজ্যশক্তির একক সিদ্ধান্ত ছিল। যেন তারা চলে-আসতে বাধ্য হয়নি। সুয়েজে যে-যুদ্ধ ব্রিটেন লড়তে পারেনি, তারই ক্ষোভে থ্যাচারের ফকল্যান্ড যুদ্ধ। সে-যুদ্ধ তখন প্রহসনই মনে হয়েছিল। অথচ তেমন যুদ্ধ আর প্রহসন থাকল না যখন ৯০-এর দশকের শুরুতেই দেশ ও রাষ্ট্র হিশেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন লুপ্ত হয়ে গেল। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্য-সভ্যতার একমাত্র প্রতিনিধি হিশেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সন্ত্রাসবাদ' রুখতে লিবিয়ার আর আফগানিস্তানের ওপর রকেট চালালো সমুদ্র থেকে, এল-সালভাদোরের ভোটে অংশ নিল স্থলপথে, সেই 'সন্ত্রাসবাদ' রুখতে দশক না-পেরতে আবার আফগানিস্তানের ওপর রকেট চালালো সেই সমুদ্র থেকেই, ইরাকের ওপর রকেট চালালো ইরাককে কুয়েত-দখলের শাস্তি দিতে ও এখন যুগোস্লাভিয়ার ওপর রকেট তাক করছে সে-দেশের অস্ত্রভাণ্ডারের হিশেব আদায় করতে। এই সব অভিযানেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছে, তারা সভ্যতার প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করছে, পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের মধ্যে পয়লা নম্বর হিশেবে তাদের যে-দায়িত্ব তারা মেনে নিয়েছে, তাদের তো নেতৃত্ব দিতেই হবে, দুনিয়ার স্বাধীনতা তো তাদের রক্ষা করতেই হবে—তাদের সংজ্ঞা-অনুযায়ী স্বাধীনতা। এ-কথা ঠিক নয় যে সে-দেশের কোনো নাগরিকই এই অনুভবের সংক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। নোয়াম চোমস্কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের এই পর্বের, বিশেষত গত বিশ-পঁচিশ বছরের, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় নীতির সবচেয়ে সরব সমালোচক। অন্যদিকে টনি মরিসন প্রমুখ আফ্রো-আমেরিকান কবি-ঔপন্যাসিক-নাট্যকাররা এই অনুভবের সংক্রমণের বাইরে তো বটেই, বরং তাঁরা এক পাল্টা অনুভবকে বাস্তব করে তুলছেন। এই আত্মবৈপরীত্য কলোনিযুগের সাম্রাজ্য-সংস্কৃতির প্রতিনিধি ডিকেন্স বা কনরাডের রচনার আধার ছিল না। তবু কলোনি-পর্বের অবসান সাম্রাজ্য-সংস্কৃতির আখ্যানকে ভিতর থেকেও অনেকটা বদলে দিলেও বিশ শতক শেষ হওয়ার দু-বছর আগেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কণ্ঠস্বর, প্রবলতর সংখ্যাগরিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, সরকারি কণ্ঠস্বর ও বেসরকারি কণ্ঠস্বর পাঁচশ বছরের পুরনো সাফাই-ই গেয়ে যায়, অদ্ভুত এক ধুয়োর সুরে, যে-সাফাই গেয়েছে ব্রিটিশ, ফরাসি, বেলজিয়ান, জাপানি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ সাম্রাজ্যশক্তি।

সাম্রাজ্যের দীর্ঘ, জটিল ও বক্রিম ইতিহাসের এমন সংক্ষেপণ শুধু এইটুকু মনে রাখতে যে সাম্রাজ্যশক্তিগুলিকে গত পাঁচশ বছর ধরে এই একটি আখ্যান বা ইতিহাস প্রথমে তৈরি করে তুলতে হয়েছে, ও পরে, এমনকী আমাদের এই সময়েও সেই আখ্যানকেই বা তত্ত্বকেই অপরিবর্তনীয় বলে গভীর বিশ্বাস করতে হয়েছে যে নিজের ভূখণ্ড ছেড়ে দূরতর সব ভূখণ্ডে পৌঁছনো ইয়োরোপে, আমাদের বেলায় ব্রিটেনের, তৎপরতর কর্মশক্তির, সাহসের ও উচ্চতর সভ্যতারই পরিণতি আর সেই উচ্চতর সভ্যতার দায়-দায়িত্ব মেটাতে কলোনি তৈরি করতে হয়েছে ও সেই কলোনিগুলিকে একটা সাম্রাজ্যব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হয়েছে। সাম্রাজ্য এখন আর ভূখণ্ডের অধিকার বোঝায় না। কলোনিতে প্রশাসন চালানোও বোঝায় না। কিন্তু দরকারে সমুদ্র থেকে অস্ত্রের শাসানিতে অন্য ভূখণ্ডকে শাসন করাও বোঝায়।

তিন

এই আখ্যান তৈরি ও স্থায়ী করতে গিয়ে পশ্চিমি সব দেশ এই বাস্তব নিঃশেষে ভুলে গেছে যে কলোনির দেশগুলির বা অনিয়োরোপীয় দেশগুলির একটা নিজস্ব আখ্যান বা ইতিহাস, আখ্যান বা কল্পনা, আখ্যান বা গোত্রধারণা থাকতে পারে। সে-আখ্যান এই সাম্রাজ্য-আখ্যানের পরিপূরক নাও হতে পারে। আবার নিশ্চিতভাবে বিপরীত কোনো আখ্যানও না হতে পারে। ইয়োরোপ-যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের কোনো দেশের, বা জনগোষ্ঠীর, কোনো এমনকী নিরপেক্ষ আখ্যানের অস্তিত্বও যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে, পরোক্ষে এ কথাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেনে নিতে হয় যে সাম্রাজ্যআখ্যান তৈরি, স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় করে তুলতে গণনাতীত অসংখ্য স্বাধীন আখ্যান ধ্বংস করতে হয়েছে—সেটাও পাঁচশ বছরের দীর্ঘ সাম্রাজ্যআখ্যানের বা সাম্রাজ্যের ইতিহাসের, বা সাম্রাজ্যকল্পনার অংশ। ইয়োরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র সেটা মানতে পারে না।

সেই মানতে না-পারাটা যে কত গভীর তা কতকগুলো টুকরো ঘটনা মিলিয়ে নিলে স্পষ্ট হয়। এমন আরো অনেক টুকরো হয়তো আরো অনেকের জানা।

চিরকালের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের অন্যতম ফ্রান্সের ফার্নান্দ ব্রদেল (১৯০২-৮৫) তাঁর দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার ইতিহাসের পাঠক্রম বদলানোর প্রস্তাব করেন, সহমতী আরো কয়েকজন ঐতিহাসিকের সঙ্গে। ১৯৪৫ থেকে এই পাঠক্রম ছিল এরকম—মেসোপোটামিয়া ও প্রাচীন ইজিপ্ট দিয়ে শুরু আর শেষের দুই ক্লাশে, আমাদের এখানকার নাইন-টেনে, 'সমকালীন ইতিহাস' দিয়ে শেষ। নাইনে ১৭৮৯ থেকে ১৮৫১ আর টেনে ১৮৫১ থেকে ১৯৩৯। ১৯৫৭-তে এই পাঠক্রমকে তিন বছরে ছড়িয়ে দেয়া হল—১৭৮৯ থেকে ১৮৫১ পড়ানো হত ক্লাশ এইটে, ১৮৫১ থেকে ১৯৪৫ নাইনে, আর টেনে 'সমকালের অন্যান্য প্রধান সভ্যতা—পাশ্চাত্য, সোভিয়েত, মুসলিম, দূর প্রাচ্য, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, ও কৃষ্ণ আফ্রিকা'। দু বছর পরই, ১৯৫৯-এ, দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়াকে এক করে নাম দেয়া হল 'ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর।' ক্লাশ টেনে যোগ করা হল নতুন একটি বিষয়—'আজকের প্রধান প্রধান সমস্যা'। আর এই শেষ ক্লাশে আবার পুরনো সিলেবাস থেকে আনা হল, '১৯১৪ থেকে ৪৫'। ব্রদেল ও তাঁর সহকর্মীদের কথা ছিল ১৯৪৫ অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর নতুন-নতুন স্বাধীন দেশগুলির কথা একজন ফরাসি ছাত্রকে জানতে হবে। তিনি বলেছিলেন, 'আমার কাছে এটা অপরিহার্য মনে হয় যে আঠার বছর বয়সে কাজেকর্মে ঢোকার আগে আমাদের ছেলেমেয়েদের আজকের সমাজের সব সমস্যা জানতে-বুঝতে হবে, দুনিয়ার বিরাট-বিরাট সাংস্কৃতিক সংঘাতের কথা পড়তে হবে ও সভ্যতার বহুরূপ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে'। ১৯৫৭-র সংস্কার ছিল ব্রদেল-এর মতের সবচেয়ে কাছাকাছি। ১৯৫৯-এর সংশোধনে একটু পেছিয়ে যাওয়া হল, তবু ব্রদেল-এর প্রস্তাবটাই থাকল। আরো যাতে পেছিয়ে না যায় সেই জন্যে ব্রদেল নিজেই এই মাধ্যমিক ইশকুলের পাঠক্রম অনুযায়ী একটি বই লিখলেন, 'সভ্যতাসমূহের ইতিহাস'। বছর ছয়েক যেতে না-যেতেই ১৯৬৫-তে ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রক 'সভ্যতাসমূহ'-কে ছাঁটলেন, কৃষ্ণ আফ্রিকার ইতিহাস বাদ দিয়ে দেয়া হল। ১৯৭০-এ চুপিসাড়ে ব্রদেল-এর বইটি চেপে দেয়া হল, ইশকুলে আর পড়ানো হত না। তারপরই ইতিহাসের পাঠক্রম আবার বদলানো হল—নাইন-টেনের জন্যে ধার্য হল, 'সমকালীন ইতিহাস, ১৯১৪-৪৫'। ব্রদেল ও তাঁর সহকর্মীরা হেরে গেলেন। ৭০-এর দশকেই ইয়োরোপ-আমেরিকার যুব-ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের নকশালি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় ঔপনিবেশিকতা-বিরোধিতা বদলে যেতে শুরু করে উত্তর উপনিবেশিকতায়। উপনিবেশ বিস্তারের সমর্থনে নতুন দর্শন যখন দরকার, তখন ব্রদেল-প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচি ও ব্রদেল-প্রণীত গ্রন্থ অনুযায়ী অন্যান্য সভ্যতার সম-অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। উপনিবেশগুলি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হতে পারে কিন্তু সে-স্বাতন্ত্র্যকেও সাম্রাজ্যবিস্তারের পাঁচশ বছরের প্রাচীন, প্রতিষ্ঠিত ও অপরিবর্তনীয় আখ্যানের সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। সভ্যতার কোনো 'সমূহ' নেই। সভ্যতা একবাচনিক। পশ্চিমি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর-একটি ঘটনাও বলবার মত।

১৯৮৬-তে বিবিসি একটা টিভি প্রোগ্রাম প্রযোজনা করে, 'দি আফ্রিকানস'। চিত্রনাট্য লেখেন ও বলেন আলি মাজরুই। কেনিয়ার মানুষ ও ধর্মে মুসলিম। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তাঁর বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে কারো কোনো সন্দেহ নেই। এই বিষয়টিতে তাঁর বিশেষজ্ঞতাও তুলনাহীন। মাজরুই-এর লেখায় ও বলায় দুটি বিষয়ে প্রাধান্য ছিল। পাশ্চাত্যদৃষ্টিতে দেখা আফ্রিকার ইতিহাসচর্চার জগতে এই প্রথম একজন আফ্রিকান, আফ্রিকার ও তার নিজের প্রতিনিধিত্ব করছে পাশ্চাত্যের দর্শক ও শ্রোতাদের সামনে, যে-পাশ্চাত্যের নানা দেশ কয়েক শতাব্দ জুড়ে আফ্রিকাকে দখলে রেখেছে, লুট করেছে, দাস করে রেখেছে। মাজরুই-এর দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল—আফ্রিকার ইতিহাসের তিনটি উপাদান—আফ্রিকার আদি অধিবাসীদের অভিজ্ঞতা, ইসলামের অভিজ্ঞতা, কলোনি হয়ে থাকার অভিজ্ঞতা। এই প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর দি হিউম্যানিটিস' টাকা দেয়া বন্ধ করে দিল। ৮৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর, ৯ অক্টোবর, ২৬ অক্টোবর 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর টিভি-সমালোচক ধারাবাহিক একটি রচনায় সামাজিক সৌজন্যের ধার না ধেরে চিৎকার করে লিখলেন, মাজরুই তথ্য বিকৃত করেছেন, সত্য অস্বীকার করেছেন, সাম্রাজ্যের খারাপ দিকগুলোর ওপর অকারণে জোর দিয়েছেন ও সুয়েজ খাল কাটতে গিয়ে বা আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে আফ্রিকার কত মানুষ প্রাণ দিয়েছেন সেই সব পুরনো কথা তুলেছেন। সেই সমালোচক এমন কথাও লিখলেন যে পাশ্চাত্যের টিভির সবচেয়ে দামি সময়ে (প্রাইম টাইম) এমন একজন আফ্রিকানকে কেন হাজির করা হল যে ইয়োরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের ব্যাখ্যা তার নিজের মত করে দেয়ার সাহস দেখায়?

'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর টিভি সমালোচকও মার্কিনি সমাজে ও বিদ্বৎমণ্ডলীতে খুব ফেলনা লোক নন। তিনি যখন এই প্রশ্নগুলি তোলেন ও মাজরুইকে অভিযুক্ত করেন, তখন কিন্তু তিনি তাঁর পেশাগত সীমার কেন্দ্র থেকে কথাগুলি বলেন না। তিনি কথাগুলি বলতে পারেন ইয়োরোপ ও মার্কিন সমাজের এই অনুমোদন ও সম্মতি থেকে, সাম্রাজ্যের যে-আখ্যান পাঁচশ বছর ধরে তৈরি করে তোলা ও লালন করা হয়েছে, সেই আখ্যানের অপরিবর্তনীয়তা, নৈতিকতা ও বাধ্যতা সম্পর্কে কোনো জিজ্ঞাসাকে কোনো ভাবেই প্রশ্রয় দেয়া হবে না মাজরুই-এর পাণ্ডিত্য ও বিশেষজ্ঞতার কোনো সাম্রাজ্যনিরপেক্ষ মূল্য তাঁদের কাছে নেই—যদি মাজরুই-এর মত স্বীকৃত পণ্ডিতও তাঁর বিদ্যাকে সাম্রাজ্যের আখ্যানের বিপরীতে অন্য কোনো আখ্যানের পক্ষে ব্যবহার করেন।

দিলীপ চিত্রে এখনকার একজন খ্যাতিবান মারাঠি কবি। তিনি নিজের কবিতার জন্যে 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কার ও অনুবাদের জন্যে 'সাহিত্য অকাদেমি অনুবাদ পুরস্কার' পেয়েছেন। তিনি ইংরেজিতে তুকারামের পদগুলি অনুবাদ করেছেন। ১৯৭৫ থেকে ৭৭-এ দিলীপ চিত্রে যুক্তরাষ্ট্রের আইয়োয়া-তে ছিলেন আন্তর্জাতিক অনুবাদ কর্মসূচিতে। সেই কর্মসূচির উদ্বোধন-ভাষণ দিতে এসেছিলেন প্রবীণ ভাষাতত্ত্ববিদ, অনুবাদক, তাত্ত্বিক জর্জ স্টেইনার। স্টেইনার তো সত্যি করেই খুব বিদ্বান ও সে-বিদ্যা ব্যবহার করতে পারেন এক বিরল প্রসাদের সঙ্গে। তিনি ১৯৬১-তে তাঁর 'শব্দ থেকে সরে আসা' শীর্ষক বিখ্যাত এক নিবন্ধে লিখেছিলেন, 'তাঁর প্রেস কনফারেন্সগুলিতে আইজেনহাওয়ার যে-ইংরেজিতে কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেন, তা একটা নতুন কাপড়কাচা সাবানের বিজ্ঞাপনের মত।' তিনি, দিলীপ চিত্রে লিখেছেন, ঐ আইয়োয়ার বক্তৃতায় বলেছিলেন, ইয়োরোপের বাইরে কোনো সাহিত্য-ঐতিহ্য আছে বলে তাঁর মনে হয় না। অথচ এই স্টেইনার-ই তাঁর 'ভাষা ও গুপ্তবিদ্যা'য় ভাষাতাত্ত্বিক হোর্ফ-এর মতের উল্লেখ করেন, সংস্কৃত ও ল্যাটিন, মানবভাষার স্বাভাবিক পরম সঞ্চয়। কিন্তু সাম্রাজ্যের আখ্যানের অদ্বিতীয়তা জিজ্ঞাসিত হলে তিনিও বিদ্যাচর্চার নিরপেক্ষতা রক্ষা করতে পারেন না।

চার

সাম্রাজ্যের এই আখ্যান বাঙালি ও ভারতীয়দেরও রচনা। বা, সাম্রাজ্যশক্তির এই আখ্যান যখন বাঙালিরা বুঝতে পেরেছে, তখন তারা এই আখ্যানটিকে গ্রহণ করেছে। এই গ্রহণ কোনো পরোক্ষ গ্রহণ নয়। এই গ্রহণ বাঙালি-ভারতীয়দের একটা আত্মপরিচয় তৈরি করে তুলতে উদ্যোগী করেছে। সাম্রাজ্যের এই আখ্যান ইংরেজরা বাঙালি-ভারতীয়দের মেনে নিতে বাধ্য করেনি। বাঙালি-ভারতীয়রা নিজেরাই নিজেদের বাধ্য করেছে। সাম্রাজ্যের এই আখ্যান তাই বাঙালি-ভারতীয়দেরও রচনা। এমন নয় যে সাম্রাজ্য-আখ্যান জেনে তারা তার একটি অনুকৃত ভারতীয় আখ্যান তৈরি করেছে। বা, সাম্রাজ্য-আখ্যানের দেশীয় সংস্করণটি সাম্রাজ্যশক্তির মৌলিক সংস্করণের পরিশিষ্ট। বস্তুত, সাম্রাজ্য-আখ্যানের অখণ্ডতায় বাঙালি ভারতীয়রাও সেই আখ্যানের সমকালীন রচয়িতা। মেকলে-র মিনিটে সেই অখণ্ড সাম্রাজ্য-আখ্যান রচনার পদ্ধতিই স্পষ্ট করে তোলা হয়েছিল। সেই অখণ্ড সাম্রাজ্য-আখ্যানের অন্তর্গত না করে ইংরেজের পক্ষে ভারতসাম্রাজ্য গঠন সম্ভবই হত না। ১৯৩০ সালে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণের সময়ও তিরিশ কোটি ভারতবাসীকে ও এই উপমহাদেশীয় ভূখণ্ডকে শাসন করত মাত্র ৬০,০০০ গোরা সৈন্য আর ৪০০০ ব্রিটিশ সিভিল সারভেন্ট। প্রশাসনের বাইরে ব্যাবসা-বাণিজ্যের ও খ্রিস্টান ধর্মপ্রতিষ্ঠানের আরো প্রায় লাখখানেক শাহেবকে যদি ধরাও হয়, তাহলেও ব্রিটিশ-ভারতে শাহেব-জনসংখ্যা দেড় লাখের সামান্যই বেশি ও পৌনে দু লাখের সামান্যই কম। তবু যে ভারতসাম্রাজ্য ব্রিটেনের মুকুটমণি হয়ে ছিল তার প্রধানতম কারণ ভারতবাসীরাও এই সাম্রাজ্য-আখ্যানের সহরচয়িতা ছিল। ব্রিটিশ শক্তির কোনো অভিযানে এই ভারতীয়রাও গর্বিত সহযোদ্ধা বলে নিজেদের মনে করত। এই শতকের দুটি মহাযুদ্ধে ও দুই শতকের অজস্র স্থানীয় যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্য হিশেবে ভারতে ও ভারতের বাইরে ভারতীয়দের ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে এক যোদ্ধা-অহং-এর তৃপ্তি ও অস্মিতা জুটেছে। উপনিবেশের আদি ও মৌলিক অধিবাসীদের অস্মিতাকে যদি তারা সাম্রাজ্যশক্তির অস্মিতার সঙ্গে এক করে নিতে না পারে, তাহলে সাম্রাজ্য তৈরি হতেও পারে না, ছড়িয়ে পড়তেও পারে না, টিকে থাকতেও পারে না। এই অস্মিতাকে মোহ বা অপচেতনা বললে বাস্তব হয়তো সহজে বোধগম্য হয় কিন্তু তা আর বাস্তব থাকে না। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ বাদ দিলে ও সারা দেশে প্রতিদিনই ঘটতে থাকা অসংখ্য স্থানীয় বিদ্রোহ-বিক্ষোভের কথা না ধরলে যাকে আমরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বলি তার মুখ্য ধারার কর্মসূচি ছিল ব্রিটিশ নাগরিকের অধিকার অর্জনের আন্দোলন। ১৯৪৭-এর মাত্র পাঁচ বছর আগে প্রথম ইংরেজদের বলা হয়েছিল, 'ভারত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়ো'। তার দু-বছর আগেই ১৯৪০-এ আর-একটি সমান্তরাল মূল ধারার আন্দোলন থেকে দাবি উঠেছিল, মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র, সার্বভৌম রাষ্ট্র চাই। ততদিনে সাম্রাজ্য-আখ্যানও নতুন ভাষা আয়ত্ত করেছে। স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করা, বা তার কাছে পরাজয় নয়, যোগ্য প্রতিনিধিদের হাতে 'ক্ষমতা হস্তান্তর।' সাম্রাজ্য-আখ্যানের সেই পরিবর্তিত নতুন ভাষাও ভারতীয়রা দ্রুত আয়ত্ত করে ফেলে। আখ্যানের সেই সন্ধিতেই আমরা পৌঁছুতে চাই। শেষ পর্যন্ত।

সাম্রাজ্য-আখ্যানের এই দুই রচয়িতার, রাজা ও প্রজার, আমাদের বেলায় ইংরেজদের ও আমাদের, মধ্যে সাম্রাজ্যনির্মাণের ও রক্ষার কর্মসূচিতে পরিপূরকতার বা বিনিময়ের সহযোগের ধরণটা ছিল কী রকম? নিশ্চয়ই এক-এক দেশে এক-এক রকম। বহুভাষী বহুধর্মী নিরক্ষীয় দক্ষিণ আমেরিকায়, আর ইসলাম-অধ্যুষিত উত্তর আফ্রিকায়, আর প্রধানত হিন্দু ও অনেকাংশে নানা ধরণের মুসলিম, গৌণত আরো নানা আঞ্চলিক ধর্মের ও স্থানীয় নানা বিশ্বাসের বহুভাষী ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য-আখ্যানের পরিপূরকতা, বিনিময় ও সহযোগের একটাই মাত্র ধরণ নিশ্চয়ই থাকতে পারে না। ভারতবর্ষেই প্রদেশ থেকে প্রদেশে ছিল সে-বিনিময়ের প্রকৃতি পৃথক। এমনকী, একই প্রদেশের মধ্যেও তো ছিল অঞ্চলে-অঞ্চলে পার্থক্য। চিরস্থায়ী বন্দবস্তে বাংলার বেশির ভাগ অংশে ভূস্বামিত্বের এক ধরণের অধিকারকে প্রথার মর্যাদা দেয়া হল। আবার, বাংলার উত্তরাঞ্চলে, পূর্বতম অংশে ও আসামে 'আনরেগুলেটেড' নামে নতুন অভিধা তৈরি হল—অনেকটা চা-বাগিচার কথা মনে রেখেই। দক্ষিণতম অঞ্চলে এল লাটদাররা। চিরস্থায়ী বন্দবস্তের জমিদাররাই নিজেদের যেমন দেখতে চাইল সামন্ত-ভূস্বামিত্বের বংশানুক্রমিকতায়, তেমনি তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকেও দেখতে চাইল ক্ষমতার এক প্রথাসিদ্ধ ধারাবাহিকতায়। যেন ব্রিটিশরাও আক্রমণ করে, লুট করে, দেশ জয় করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেনি আর এই জমিদাররাও মাত্র সরকারি সনদের জোরেই জমিদার নয়। কালক্রমে বহু সংশোধন সহ চিরস্থায়ী বন্দবস্তের জমিদারির এমন কালনিরপেক্ষ সনাতনত্ব অর্জনের হয়তো, নিশ্চয়ই আরো অনেক কারণও ছিল, এই সব জমিদারিতে ব্যক্তিগত গৃহদেবতার নামে জমিদারির বিপুল অংশ রাখা হত। এ গৃহদেবতা হয়তো বালকৃষ্ণেরই এক রূপ, বা, শ্যামারই কোনো রূপান্তর। 'অন্নপূর্ণা', 'দুর্গা'র নানা রূপান্তরও ছিল। সে-রূপান্তর অবশ্যই হতে হবে একেবারেই পারিবারিক, বংশগত ও পৃথক। এদের আলাদা-আলাদা নাম ছিল, আলাদা-আলাদা উৎসব ছিল, আলাদা-আলাদা সব ক্ষমতাও ছিল—মামলা জেতানোর, বা সন্তানসৃষ্টির, বা মৃতবৎসার সন্তান বাঁচানোর, বা বংশরক্ষার, বা এমনকী কোনো কোনো ব্যাধিনিরাময়েরও। আর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই প্রতিদিনই প্রসারণশীল সাম্রাজ্য, বিশেষত দৈনন্দিন ব্রিটিশ শাসনের জন্যে প্রয়োজন হয় স্থানীয় রীতি ও প্রথার সঙ্গে কলোনিকে বেঁধে দেয়া, সাম্রাজ্যকে দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে গেঁথে ফেলা। ঐতিহ্য ও দীর্ঘ জীবন সাম্রাজ্যকে এক নৈতিক গ্রাহ্যতা দেবে। ১৮৭৬-এ ভিক্টোরিয়াকে ভারতসম্রাজ্ঞী ঘোষণা করা হল। তাঁর প্রতিনিধি, ভাইসরয়, লর্ড লিটন ভারত শফরে এলেন। সারা দেশ জুড়ে তাঁকে বিভিন্ন ভারতীয় পদ্ধতিতে অভ্যর্থনা জানানো হল—কোথাও কাল্পনিক হিন্দুযুগের পৌরাণিক রীতিতে, কোথাও সবেমাত্র অবসিত মুঘলাই রীতিতে। আর, দিল্লিতে বসল এক দরবার—সেখানে ব্রিটিশ-ভারতের ভারতীয়তার আচার-আচরণ সাব্যস্ত হয়ে গেল। ঠিক এর পর-পরই ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বন্ধও স্থির হতে লাগল। পরে তো দেশীয় রাজাদের সম্মানজ্ঞাপক বিভিন্ন সংখ্যক তোপধ্বনির রেওয়াজও তৈরি হয়। 'রাজ' কথাটি সাম্রাজ্য-আখ্যানের একটি প্রধান শব্দ হয়ে ওঠে। হিন্দু পৌরাণিক আদর্শে 'রাজা'ই পালক, অন্যতম পিতা, শাসক, নীতিনির্ধারক, সার্বভৌম। রাজদর্শন ইষ্টকর্ম। রাজদর্শন পুণ্যকর্ম—সেই পুণ্য পরলোকে সঞ্চিত থাকে। তাই 'অ্যান্টি সিডিশন' আইনকে বলা হত রাজদ্রোহবিরোধী আইন। ব্রিটিশ আইন অনুযায়ীই রাজদ্রোহ অপরাধ তা নয়, হিন্দুশাস্ত্র ও বিশ্বাস অনুযায়ীও পাপ। হিন্দু-ভারতীয় বিশ্বাস, মুঘলাই ঠাটঠমক আর ব্রিটিশ স্বার্থের মধ্যে বিনিময়ের মধ্য দিয়ে রচিত হচ্ছিল সাম্রাজ্য-আখ্যান।

সাম্রাজ্য শেষ হয়ে গেলেও সেই সব আচার ও প্রথা বদলানো হয়নি। ব্রিটিশ ভাইসরয়কে ও প্রাদেশিক গভর্নরদের যে-সব রীতিপদ্ধতি ও আচার মেনে চলতে হত, তাঁদের সঙ্গে ব্যবহারে বিভিন্ন পদবীর মানুষজনকে যে-আচরণে বাধ্য থাকতে হত, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদেরও সে-সব রীতিপদ্ধতি ও আচারের অনেকটাই মেনে চলতে হয় ও তাঁদের সঙ্গে ব্যবহারে এখনো বিভিন্ন পদবীর মানুষজনকে ঐতিহ্যনির্দিষ্ট আচরণ মেনে নিতে হয়। এর কিছু কৌতুককর কাহিনী পড়া যায় সি. এল দত্ত-র 'উইথ টু প্রেসিডেন্টস' বইটিতে বা এমনকী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বেঙ্কটরমণের আত্মজীবনীতেও। প্রথা একবার তৈরি হলে তার আশ্রয় ও প্রশ্রয় রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অভ্যস্ত হয়ে যায়। এমনই, যে একবার শিলিগুড়ির কাছে এক ফরেস্ট বাংলোতে থাকতে চেয়ে জেনেছিলাম, নাকী জুন মাসের ঐ কয়েকটি দিন ঐ বাংলো খালি রাখতে হয় কারণ প্রায় আশি বছর ধরে এই প্রথা চলে আসছে—ভাইসরয়, বা ছোটলাট, বা এখনকার রাজ্যপাল দার্জিলিঙে গ্রীষ্ম কাটিয়ে ঐ সময় নেমে ঐ বাংলোতে বিশ্রাম করে, সন্ধ্যার দার্জিলিঙ মেল ধরবেন। সে দার্জিলিঙ মেল নেই। যে-স্টেশন থেকে সেই ট্রেন ছাড়ত সেখানে এখন বাজার বসে। রাজ্যপাল প্লেন থাকতে ট্রেনে ফিরবেনেই-বা কেন। কিন্তু প্রথা আছে। এখনো।

যাঁরা সাম্রাজ্য বাড়াচ্ছেন, উপনিবেশ তৈরি করছেন, প্রশাসন গড়ে তুলছেন ও এই সব কিছুই ঘটছে দ্রুত, অকল্পনীয় নগদ টাকা লাভের সুযোগ অব্যাহত রাখতে, সুযোগ আরো বাড়াতে ও সেই সুযোগকে চিরস্থায়ী করে তুলতে তাঁরাই যে শুধু নিজেদের প্রয়োজনে প্রথার সঙ্গে, প্রচলনের সঙ্গে, ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে চাইছেন, তা নয়, বাঙালিরা ও ভারতীয়রাও চাইছেন এই নতুন ধরণের সরকারি রীতিনীতিকে আয়ত্ত করে নিতে। ১৮২০ থেকে প্রায় ৬০ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের খবরে মন্তব্যে এই সরকারি আদবকায়দার সংস্কৃত-পরিভাষা নির্মাণ করে সেই আদবকায়দাকে ভারতীয় ও দেশীয় করে নেয়াটাই ছিল একটা প্রধান কাজ। যেমন 'হিজ এক্সেলেন্সি' ধরণের পদবীর বাংলা করা হত 'শ্রীল শ্রীল শ্রীযুত', 'শ্রী শ্রীযুত', এরকম শব্দে। শাহেব কর্মচারীদের বিশিষ্টতা বোঝাতে নানারকম শব্দ তৈরি হয়েছে—'রাজকর্মাধ্যক্ষ' 'রাজপুরুষ', তেমনি 'বিধি নির্বন্ধ', 'আইনের পাণ্ডুলেখ্য', 'টেক্স সংগ্রাহক সরকার', 'টৌন হলে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে' 'সম্প্রদায়েরা'। ১৮৫৩-র চার্টারে ভারতীয়দের সরকারি কাজ পাওয়ার সুযোগ কিছু বাড়ার ফলে এই সব সরকারি আদবকায়দা রীতিনীতি আয়ত্তে এসে যায়।

ভারতের আদবকায়দা, রীতিনীতি ও প্রথা-ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারকে মিলিয়ে নেয়ার ভারতীয় চেষ্টার নিদর্শন প্রকট হয়ে ওঠে মির্জা গালিব সিপাহি বিদ্রোহের দিল্লিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেই গৃহবন্দী থেকে যখন সরকারি কর্তাদের কাছে আর্জি জানাচ্ছেন। রাজার প্রশস্তিসূচক কাব্যরচনা হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতির স্বীকৃত রীতি। সাম্রাজ্যের রাজাকে দেখা যায় না, কল্পনা করে নিতে হয় ও যে-কোনো রাজপুরুষকেই 'রাজা' বলে আনুগত্য দেখাতে হয়। গালিবের একটি চিঠিতে এখনো খুব স্পষ্ট পড়া যায়, গালিব বহুদিনের প্রাচ্য রীতিতে রাজশক্তিকে সম্বোধন করতে চাইছেন আর রাজশক্তির প্রতিনিধির জবাবের মধ্যে অর্থ খুঁজছেন। চিঠিটি ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮-তে লেখা। 'আমি মিঃ এডমনস্টোনকে চাক্ষুষ চিনি না, কারণ তাঁকে আমি কখনো দেখিনি ; তবে চিঠির মাধ্যমে তাঁর পরিচয় পেয়েছি, কারণ যখনই কোনো নতুন গভর্নর-জেনারেল আসেন আমি তাঁকে একটি প্রশস্তিগীত লিখে পাঠাই...যখন লর্ড ক্যানিং গভর্নর জেনারেল, আমি তাঁকে প্রথানুযায়ী একটি প্রশংসাগীত পাঠিয়ে দিই, এবং চিফ সেক্রেটারি মিঃ এডমনস্টোন যখন আমাকে উত্তর পাঠালেন, তখন দেখলাম যে আমাদের কখনো দেখা না হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাকে পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে সম্বোধন করছেন। এর আগে পর্যন্ত আমাকে সম্বোধন করা হত "খান শাহিব, আমাদের সহৃদয় শুভার্থী" ; কিন্তু মিঃ এডমনস্টোন নিজের যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন করেই এবার লিখলেন, "খান শাহিব, আমাদের সর্বাধিক সহৃদয় এবং স্নেহপরায়ণ বন্ধু" (প্রিয়দর্শী চক্রবর্তী, সংকলন ও অনুবাদ, 'কয়েকটি চিঠি ; মির্জাগালিব', সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৮)।

এই সাম্রাজ্য-আখ্যানের শুরু যেমন অস্পষ্ট, অনিশ্চিত, কুটিল, অথচ অবিচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক ও একমুখী, তেমনি এর অবসানও। আমরা এখনো জানিই না এই আখ্যানের অবসান আদৌ হয় কী না। চন্দননগরে বা পণ্ডিচেরিতে ফরাসিদের যে-সাম্রাজ্য-আখ্যান এক সঙ্কীর্ণ আয়তনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছিল ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সেই সাম্রাজ্যের এই ভূখণ্ড স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল, বা, আরো একটু পরে গোয়ায় পর্তুগিজদের সাম্রাজ্য শেষ হয়েছিল—সেই সাম্রাজ্য-আখ্যান ব্রিটিশ ভারতের সাম্রাজ্য-আখ্যান থেকে আলাদাভাবেই এখনো সজীব ও সক্রিয়।

মাত্র বছর আটেক আগে ১৯৯০-এর আগস্টে কলকাতার ৩০০ বছরের জন্মদিন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে খুব ঘটা করে পালিত হল। তারপর প্রতি বছরই ঐ দিনটিতে উৎসব হয়। প্রথম উৎসবে ঘোড়ায় টানা ট্রামও চালানো হয়েছিল। তাতে ১৬৯০-এর কাল্পনিক পোশাক পরিয়ে যাত্রীদের বসানো হয়েছিল। এই জন্মদিন খুঁজে বের করা তো সেই সাম্রাজ্য-আখ্যানের পোষকতা। এক, জব চার্নক কলকাতায় পা দেয়ার আগে যদি কলকাতা নাই থাকবে তাহলে তিনি কলকাতাতেই নামলেন কী করে আর কলকাতাসহ তিনটি গ্রামের জমিদারিই-বা পেলেন কী করে। দুই, কলকাতায় জব চার্নকের অবতরণের দিনটিকে কলকাতার জন্মদিন মেনে নেয়ার অর্থ সাম্রাজ্যশক্তির সাম্রাজ্য-আখ্যান স্বীকার করে নেয়া।

তখন এবং এখনো পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার বামপন্থী দলগুলির যৌথ সরকার, 'বামফ্রন্ট'-এর সরকার। এই সরকারের নেতৃত্বে আছেন সারা দেশের সবচেয়ে বড় বামপন্থী দল। এঁরা কেউ ব্যক্তিগত, দলগত বা ফ্রন্টগত দিক থেকে কম-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নন। অথচ সরকারের মত একটি প্রতিষ্ঠান যখন তার নিজস্ব আখ্যান তৈরিতে বাধ্য হয় তখন কলকাতার একটা জন্মদিনের প্রয়োজন হয় তাঁদের। এই প্রয়োজন যদি কেউ বোধ করে ফেলেন তবে তাঁকে, সেই দলকে, সেই ফ্রন্টকে, সেই সরকারকে, নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার, উপনিবেশ গড়া, সাম্রাজ্য গঠন ও উচ্চতর সভ্যতার বিকিরণ, সাম্রাজ্য-আখ্যানের এই প্রধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপাদানগুলিকে বাধ্যতই স্বীকার করে নিতে হয়। কলকাতার জন্মদিন এমন কোনো অপরিহার্য উপলক্ষ না হলেও, বা পরিহার্য উপলক্ষ হলেও, বাধ্যতাটা অনতিক্রম্য।

পাঁচ

আমরা লেখাটির 'দুই' অংশ শুরু করেছিলাম এই লাইনটি দিয়ে, 'ভারতীয়তার একটা পরিচয় ইংরেজরা ভারতীয়দের জন্যে সত্য করে তুলেছিল।' তারপর 'চার' অংশটির শুরুতেই লিখে বসি, 'সাম্রাজ্যের এই আখ্যান বাঙালি-ভারতীয়দেরও রচনা।' এই দুটো কথার মধ্যে যা কিছু প্রতিসরণ ঘটছে, তা আর ঢাকার উপায় নেই। তবু হয়তো এমন একটি যুক্তির আভাস ভেবে নিয়ে প্রতিসরণের তির্যকতা খানিকটা ঘোচানো যায় যে, সাম্রাজ্য-আখ্যানের মূল প্রণেতা ইংরেজরা হলেও, প্রায় প্রথম থেকেই বাঙালিরা সে-আখ্যানরচনার উৎসাহী সহযোগী। এমন ভেবে নিতে পারলে হয়তো যুক্তির বিশৃঙ্খলা খানিকটা কাটে।

এখন এই 'পাঁচ' অংশে এসে বুঝতে পারছি, যা ভাবতে-ভাবতে লিখছি আর লিখতে-লিখতে যে-ধারণা ও যুক্তি স্পষ্ট হচ্ছে, তৈরিও হচ্ছে, তার ভিতরেই একটা স্ববিরোধিতা আছে। এতক্ষণ আমরা যা বলেছি, এখন তার সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলার জন্যে তৈরি হচ্ছি। ভারতীয়দের, এক্ষেত্রে বাঙালিদের, একটা অন্য আখ্যান ছিল, গোপন। সাম্রাজ্যের উপনিবেশের কাল জুড়েই সে-আখ্যান তারা ছেদহীন তৈরি করে আসছে কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, এক ধরণের নকশায়, নিবন্ধে, যাকে আমরা সাহিত্য বলি তার নানারকম রূপে, এমনকী আত্মজীবনী ও ভ্রমণকাহিনীতেও। সেই আখ্যান, সাম্রাজ্যবিরোধী কোনো আখ্যান নয়। সে-আখ্যানে সহযোগিতা বা বিরোধিতা প্রাসঙ্গিকই নয়। সে-আখ্যান সাহিত্যের স্পষ্ট অর্থ দিয়েও তৈরি নয়। এইটুকুমাত্র বলা যায়, সেই গোপন, অস্পষ্ট, অন্বয়বিযুক্ত, অর্থ এড়ানো, আখ্যানের রচয়িতা ইংরেজ বা কোনো সাম্রাজ্যশক্তি নয়। নয়, এই কারণে নয় যে সাম্রাজ্যশক্তির পক্ষ থেকে প্রত্যাহার ছিল। সাম্রাজ্যশক্তি এমন কোনো আখ্যানের অস্তিত্বও ভাবতে পারে না, যা, তাদের কলোনির প্রজাদের কিছু অস্পষ্ট গোঙানি, কিছু বেতাল শ্বাস প্রশ্বাস, কিছু সুস্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন, কিছু হাজার-হাজার বছরের পুরনো অঙ্গভঙ্গি, জিভের কোনো আঞ্চলিক আলোড়ন, পায়ের তলায় বালি-কাঁকর বা কাদার ওপর নির্ভরশীল চলন, নিবিড়পক্ষ্ম চোখে এক রকমের তাকিয়ে থাকা, ঘুমনোর ভঙ্গি, বাচ্চাকে আদরের মুদ্রা, স্তন্য দেয়ার অভ্যাস, ব্যবহৃত শব্দের সীমা, কথা হারিয়ে ফেলা—এই সব দিয়ে তৈরি। সতের-আঠার, এমনকী উনিশ শতকের ইয়োরোপীয় অভিযাত্রীরা, সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার পরও তাদের প্রজাদের এই অবোধ্য ব্যক্তিত্বের, ভাষার ও সমষ্টির কাছে ঠেকে গেছে, রেগে গেছে, তাদের শাপশাপান্ত করে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছে।

এই আখ্যান কোনো 'জাতীয়' আখ্যান নয়। সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধপক্ষ হিশেবে 'জাতি'কেই কেন একমাত্র মেনে নিতে হবে, তাও এই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নয়, ইংরেজি 'নেশন'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিশেবে? এই আখ্যানকে 'জাতি-আখ্যান' বলতে ভাল লাগত যদি 'জাতি' শব্দটিকে জন্মের সঙ্গে যুক্ত মূল অর্থে ব্যবহার করা যেত। যে-আখ্যানের আভাস আমরা দিতে চাইছি, তা জন্মের সঙ্গেই যুক্ত, কয়েক-জন্মের জন্মের সঙ্গে যুক্ত, জন্মচক্রের সঙ্গে যুক্ত, সেই জন্মচক্রে জড়িয়ে থাকা সম্বন্ধগুলির সঙ্গে যুক্ত। 'জাতি' শব্দটি দিয়ে আর সে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থ তৈরি করে তোলা যায় না। ঐ শব্দ দুদিক থেকে নষ্ট—হিন্দুত্বের এক অন্ধ ধারণার আধার হয়ে আর ইংরেজি 'নেশন' শব্দের প্রতিশব্দ হয়ে। নেশন বা জাতি থেকেই সাম্রাজ্য, আবার নেশন বা জাতি থেকেই সাম্রাজ্যবিরোধী স্বাধীনতা—এই সমীকরণে সাম্রাজ্য ও স্বাধীনতা বিপরীতকোটি নয়। সেই কারণেই ঐ সমীকরণে সাম্রাজ্য-আখ্যান ও সাম্রাজ্যবিরোধী আখ্যান একটা দু-ছাপওয়ালা মুদ্রার মত অখণ্ডতা পেয়ে গেছে।

গত তিনদশকে আরো বেশি করে পেয়ে যাচ্ছে। কারণ, এই তিন দশকের বিভিন্ন সময়ে আফ্রিকার স্বাধীন-হওয়া দেশগুলিতে, সুদান-ইজিপ্ট-তিউনিসিয়া-আলজেরিয়া-লিবিয়া, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকার সেনেগাল-গিনি-সিয়েরা লিয়োন-লাইবেরিয়া-ঘানা, পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার নাইজেরিয়া-কঙ্গো-জাইরে-আঙ্গোলা-জিম্বাবোয়ে-সোমালিয়া, পশ্চিম এশিয়ায় ইরান-ইরাক-কুয়েত-লেবানন, পূর্ব এশিয়ায় মায়ানমার-থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া-লাওস-ফিলিপাইনস-ইন্দোনেশিয়া নানা ধরণের গৃহযুদ্ধে নিজেরাই নিজেদের আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ করছে। বিভিন্ন দল বা উপজাতি বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রক্ষমতার কর্তৃত্বের জন্যে দেশের ভিতরে যেমন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, তেমনি প্রতিবেশী দেশকে আক্রমণও করছে। তার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে বিশ্বকর্তৃত্বের কর্মসূচি নিয়ে সশস্ত্রতম দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইদি আমিন, আয়াতোল্লা খোমেইনি, সাদ্দাম হোসেন, পলপট—এই গত তিন দশকের এশিয়া-আফ্রিকার 'জাতীয়' সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই সব দেশই যে উপনিবেশ ছিল, তা নয়। অথচ উপনিবেশ মুক্তির উচ্ছ্বসিত প্রবল জোয়ারেই এই সব দেশে সামাজিক রূপান্তরের মন্থন শুরু হয়ে গেছে। সে-মন্থন গত তিরিশ বছরেই সাম্রাজ্য-আখ্যানের নতুন অংশ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এশিয়ায় স্বাধীন দেশের সংখ্যা বেড়েছে পাঁচ গুণ। ১৯৩৯-এ আফ্রিকায় স্বাধীন দেশ ছিল মাত্র একটি, এখন ৫০-এর মত। লাতিন আমেরিকায় বেড়েছে ১২টির মত স্বাধীন দেশ। সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্যবিরোধিতা, দেশ রাষ্ট্র ও জাতির অর্থ এত জটিল, বিচিত্র ও দুর্বোধ্য হয়ে গেছে যে সাম্রাজ্য-আখ্যানটাই প্রধান, প্রায় একমাত্র, আখ্যান হয়ে উঠছে। যাঁরা সাম্রাজ্যের বিরোধিতাকে একটি ঐতিহাসিক কার্যকারণে দেখে আসতে অভ্যস্ত বা নতুন করে দেখতে চাইছেন, তাঁদের বাধ্য হয়েই নিজেদের আস্থার সঙ্গে অন্বিত এমন এক তত্ত্ব তৈরি করে তুলতে হচ্ছে যে 'জাতীয়' বা 'স্বাধীনতা' সংগ্রামের চাইতে গভীরতর স্তরে অধস্তন জনগোষ্ঠীর অন্যতর ইতিহাস আছে, বা, সাম্রাজ্য-আখ্যান বলতে যা বোঝা হয়, তার সাংস্কৃতিক ব্যঞ্জনা ভিন্ন প্রকৃতির।

আমরা আমাদের বাঙালি অভিজ্ঞতার নিবিড়তায় আন্দাজ করতে চাইছি যে সাম্রাজ্যবিস্তার আর সাম্রাজ্যপ্রতিরোধের জন্যে সচেতন সমাবেশের মাঝখানে একটা সময় জুড়ে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিই হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যের বিপরীত কোটি। ভারতবর্ষের মত পুরনো দেশে, যেখানে শিল্প-সাহিত্যচর্চার প্রাচীন প্রমাণ আছে, শিল্প-সাহিত্যই হয়ে উঠতে পারে সেই ব্যক্তির সাম্রাজ্যবিরোধী বিপরীতকোটির আখ্যান লুকিয়ে ফেলার প্রধান আশ্রয়। পাণ্ডবরা বিরাটরাজ্যে ঢোকার আগে শমীবৃক্ষে তাঁদের সমস্ত অস্ত্র নানা আচ্ছাদনে জড়িয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেই ঘটনাকে এই শিল্পসাহিত্য রচনার ব্যক্তি উদ্যোগের উপমা হিশেবে ব্যবহার করা যেত। যায় না, কারণ পাণ্ডবগণ যেমন তাঁদের অস্ত্রগুলিকে চিনতেন ও তাঁদের যেমন একটা ভবিষ্যৎ যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল, এই ব্যক্তিলেখকদের তেমন কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সচেতনতা বা প্রস্তুতি ছিল না। থাকতে পারে না বলেই ছিল না।

আমাদের বাঙালি অভিজ্ঞতাতে আমরা জানি যে গত একশ-দেড়শ বছরের বাংলা ভাষার লেখকরা প্রথম দিকে ইংরেজি মারফৎ ইয়োরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে বাংলায় সাহিত্য লিখেছেন। তাহলে সেই অনুকৃত ফর্মে কী করে সম্ভব এমন এক আধেয়কে আকার দেয়া, বা গোপন করা, যা সাম্রাজ্যের আখ্যানের এক বিপরীতকোটিকে ব্যাপ্ত করে আছে? ব্যক্তির মনও তো সাম্রাজ্যের বহির্ভূত কিছু নয়। ব্যক্তির আখ্যানও সাম্রাজ্য-আখ্যানের বাইরে নয়। পরিবারের গঠনও সাম্রাজ্যের বিষয়কর্মের পদ্ধতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। এমনকী পরিবারের ভিতরে একজনের সঙ্গে আর-একজনের নিভৃত ব্যবহারও সাম্রাজ্য-আখ্যানের নিহিত নির্দেশের বাইরে যেতে পারে না। এমনকী পরিবারের ভিতরে কোনো-কোনো ব্যক্তির অঙ্গভঙ্গিও সাম্রাজ্য-আখ্যানের কল্পনা বা পৌঁছ-এর গণ্ডি পেরতে পারে না। সাম্রাজ্য-আখ্যানের কোনো বহিস্থ নেই।

তাহলে সাম্রাজ্য-আখ্যানের বিপরীতকোটির এক আখ্যান, ইংরেজদের সঙ্গে বিনিময়ের ফলে তৈরি হয়ে ওঠা বাংলা সাহিত্যে ঢুকে পড়েছিল, লুকিয়ে আছে, আমাদের এমন অনুমানের প্রমাণ কী? যে-অনুমান ন্যূনতম প্রমাণসহ নয়, তা তো আজগুবি কিছু, মেঘের চলন নিয়ে যেমন বানিয়ে তোলা যায় নানা গড়নের ভাবনা।

এ-অনুমানটিকে কতটা প্রমাণসহ করে তোলা যাবে, তা নিয়ে আমাদেরও সংশয় আছে। তবু, সে-চেষ্টা করতে হবে, এমনকী সেই চেষ্টার ফলে যদি স্ববিরোধিতার আরো জটিলতা তৈরি হয়, তবু সে-চেষ্টা করতে হবে হয়তো শুধু কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন গড়ে তুলতেই। নইলে, আমরা শিল্পগত সমস্যার সহজপ্রাপ্য সামাজিক ব্যাখ্যা দিয়ে যেতেই থাকব। যিনি মিলটন বা পেত্রার্কার অনুকরণে মহাকাব্য বা সনেট লেখেন, তিনি সেই মহাকাব্যে কেন ধরাতে চান না হিন্দুপৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বকেই, যেমন মিলটন খ্রিস্টীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে ধরাতে চান তাঁর মহাকাব্যে, বা, তাঁর সনেট কেন হয়ে ওঠে না প্রেমিকার উদ্দেশে নিবেদন, যেমন হয়েছে তাঁর আদর্শ পেত্রার্কা-র সনেটগুলি? মিলটনে যেমন স্যাটান নায়ক হয়ে ওঠে, 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ তেমনি রাবণ নায়ক হয়ে ওঠে এমন এক ইতিহাসবিরোধী, শিল্প-নন্দনবিরোধী ব্যাখ্যানে ঢাকা পড়ে আছে এই সত্য যে মিলটনের স্যাটান ইংল্যান্ডের অষ্টাদশ শতকীয় বিপ্লবের ওতপ্রোত নতুন ধর্মতত্ত্বে নিহিত জনকল্পনার কাব্যপুরুষ ও অনুরূপ কোনো ধর্মজিজ্ঞাসার ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক আলোড়ন ছাড়াই মধুসূদনের কাব্যের প্রথম চরণেই রাক্ষস ও শেষ চরণেও রাক্ষস। ইতালীয় দান্তের 'নরক'-এ ভার্জিলের লাতিন 'ইনিড'-এর নরক কোথাও-কোথাও অনূদিত হলেও, এক স্বতন্ত্র ও মৌলিক কল্পনার শৃঙ্খলায়, মাহাত্ম্যে ও স্রোতে সে-কাব্য মহীয়ান হয়ে উঠেছে। কাব্য তৈরির বাস্তব শক্তি ছাড়া ঐ কল্পনার অন্য কোনো মাধ্যম নেই। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর বহু পংক্তি বা উপমা বা প্রতিমা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন কাব্যের এমনকী অনুবাদ হলেও, কী সেই কল্পনা ও রচনাবল যা সেই কাব্যকে একই সঙ্গে এ[illegible]ঙালি-ভারতীয় ও এমনই দেশভাষা নিরপেক্ষ মহৎ করে তোলে? বাংলা কাব্যে 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা তো দূরের কথা, পড়ারই কোনো প্রস্তুতি ছিল না, সমর্থনও ছিল না, পরিবেশ তো ছিলই না।

'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'দুর্গেশনন্দিনী'র আগে বাংলায় কবিতায় ও গদ্যে যা কিছু লেখা হয়েছে, হুতোম, টেকচাঁদ, আরো অনেক নকশা, প্রহসন, প্রধানত ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা, কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রঙ্গলালের, তাতে কলকাতাই প্রধান। সেই 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), থেকে শিখ বা আফগান যুদ্ধে ব্রিটিশের জয়ে উল্লাস বা শাহেবপাড়ায় খ্রিস্টমাস-নববর্ষের নতুন উৎসবের ঈশ্বর গুপ্তীয় বিবরণ পর্যন্ত কলকাতার নাগরিকজীবনের অভাবিতপূর্ব অভিজ্ঞতাকে বাংলা ভাষায় তখন-অভ্যস্ত নানা ধরণের কবিগান-পাঁচালিতে আকার দেয়া হচ্ছিল যেমন, তেমনি, সেই অভিজ্ঞতার জন্যে নতুন ধরণের আধারও তৈরি করা হচ্ছিল, বিশেষত গদ্যে। প্রহসন তো গদ্যেরও আকার একরকম। ১৮৬৫-তেই ঘটল সাহিত্যের ফর্মের প্রাক্তন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, প্রাক্তনকে প্রত্যাখ্যান। কলকাতা বা কেন্দ্র থেকে মধুসূদন সরে যান পরিধিতে, লঙ্কায়, বঙ্কিমচন্দ্র সরে যান বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে। কাব্যের সময় বা উপন্যাসের সময়ের দিক থেকে যথাক্রমে অনির্দিষ্ট সহস্রাব্দগুলি পার হয়ে যাওয়া ও প্রায় এক সহস্রাব্দ পেছিয়ে যাওয়াও হয়তো এই সুযোগটি তৈরি করে তোলার জন্যেই—নইলে আধুনিক মহানাগরিকতা থেকে সরে আসা সম্ভব হত না। মধুসূদন কলকাতা নিয়ে প্রহসন লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রও অন্তত তাঁর দুটি উপন্যাস কলকাতাতেই ঘটিয়েছেন—'ইন্দিরা' ও 'রজনী'। 'একেই কি বলে সভ্যতা' বা 'ইন্দিরা-রজনী'র বাচন আয়রনি-তীব্র, চতুর, কুশলী, আবেগের প্রকাশ সেখানে সোজা নয়, বাঁকা। মহানগর এই প্রহসনে ও এই দুই উপন্যাসে তার নতুন আকার বা প্রকৃতি নিয়ে নথিভুক্ত নয় কিন্তু মহানগরের নতুন-নতুন বিস্তার, নতুন-নতুন এলাকা, গঙ্গার নতুন সব ঘাট, নগরের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র, উপকণ্ঠ, নানারকম বাড়িঘর, নানারকম পেশা ছাড়া 'একেই কি বলে সভ্যতা', বা 'ইন্দিরা-রজনী' ঘটে উঠতে পারত না। ১৮৬৫-র আগে সাহিত্যের আকার ছিল প্রধানত পুরনো, গৌণত একটু দ্বিধান্বিত নতুন। কিন্তু আধেয় প্রধানত নতুন। প্রহসন বা গদ্যনকশা, হুতোম বা আলাল, কোনো দূরসঞ্চারী কল্পনা থেকে তৈরি হয়নি, কোনো কল্পনাকে দূরসঞ্চারী করে তুলতে পারে না, সেই কল্পনার শব্দরূপ নির্মাণে ভাষাবোধের যে-নিশ্চয়তা দরকার এই সব লেখায় তা নেই। বরং আছে এক প্রস্তুত ও তৎপর ক্ষিপ্রতা। ১৮৬৫-তে 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর পর বাংলা সাহিত্যের আকার হয়ে উঠল নতুন আর আধেয়ে এল এক প্রাচীনতার আভাস। প্রাচীন সেই আখ্যান, তা রামায়ণ থেকেই হোক আর আকবরের আমলের বাংলা থেকেই হোক, বেছে নেয়ার ভিতর যেমন ছিল পাশ্চাত্যের কোনো এক ছকের, 'প্যারাডাইস লস্ট' বা 'আইভ্যানহো'-র দেশীয় প্রতিতুলনা নির্মাণের উচ্চাশা, তেমনি একই সঙ্গে ছিল যে-সাম্রাজ্য-আখ্যান তখন বর্তমান, তখন ঘটমান, সেই আখ্যানকে প্রত্যাখ্যানের এক অনিশ্চিত ভঙ্গি।

এখানেই এক ব্যক্তিগত সঙ্কটের কথা পাড়তে চাই। ১৯৮৮-তে একটি নিবন্ধে, 'বাংলা উপন্যাস', আমি বলেছিলাম যে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি উপন্যাসের একটি ধরণকে মডেল হিশেবে গ্রহণ করায় বাংলা মঙ্গলকাব্য-পাঁচালি-কথকতার নিজস্ব আখ্যানভঙ্গি হারিয়ে গেল ও যে-সমকালীন বাস্তবতা আলাল-হুতোম, বিভিন্ন প্রহসন, নকশায়, প্রস্তাবিত হয়েছিল, তা মহৎ শিল্পরূপে অন্বিত হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট হল। এই কথা থেকে যে আমি সম্পূর্ণ সরে এসেছি তা নয়। কিন্তু বারবার বঙ্কিমচন্দ্রে ফিরে গিয়ে এখন আমার মনে হচ্ছে যে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই ঔপন্যাসিকের এই দায় সম্পর্কে জাগরূক ছিলেন ও তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে নিজের ফর্মসন্ধানের এক নিরন্তর আত্মপ্রতিবাদী যাত্রার চিহ্ন আছে। আমার এই ধারণা যদি নিজের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে পারি ও সেই ধারণা অপরের প্রণিধানযোগ্য যদি করে তুলতে পারি, তাহলে কোনোদিন হয়তো আমার পুরনো কথা যথোচিত সংশোধন করতে পারব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপাতত এই সুযোগে এই ইঙ্গিতটুকুমাত্র দিতে চাই যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি যেমন একদিকে ইংরেজি উপন্যাসের একটি আদলে রচিত, তেমনি একই সঙ্গে এক বাঙালি-ভারতীয় বাস্তব তাঁর সেই আদলের সঙ্গে মিশে থেকেছে ও কখনো-কখনো সেই আদলকে ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছে। ঔপন্যাসিকের সচেতন চেষ্টাতেই যে এমনটি ঘটেছে—তা নয়। ঔপন্যাসিকের সচেতন চেষ্টার ভিতরে তাঁর অচেতন বা অবচেতন শিল্পবোধের ফলেই যে এমনটি ঘটেছে—তাও নয়। কারণ, শিল্প শেষ পর্যন্ত এমনই এক অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়ের কথাই কথা দিয়ে বলতে চায় বটে, যা কথা দিয়ে বলা যায় না, তবে চেতনার কোনো সচেতন, অবচেতন ও অচেতন বিভাজন নেই। তেমন ভেবে নিলে অনেক কিছু ব্যাখ্যা সহজ হয় বটে তবে চৈতন্য যে অখণ্ড এই সত্যটা নষ্ট হয়।

'মেঘনাদবধ কাব্য' পরিধির কাব্য, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পরিধির কাব্য। রামচন্দ্র এই কেন্দ্রের প্রতিনিধি, তিনি পরিধিকে কেন্দ্রের ভিতরে আনতে চান। রাবণ এই পরিধির প্রতিনিধি, তিনি কেন্দ্রের এই চেষ্টাকে প্রতিহত করতে সর্বস্ব হারান। এই প্রতিনিধিত্ব রাবণকে এক নৈতিকতা দিয়েছে। সে-নৈতিকতা ছাড়া মহাকাব্য বা উপন্যাসের কোনো নায়কই প্রামাণিক হয়ে ওঠে না। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর চতুর্থ সর্গে সীতা নিজে রাবণ কী করে তাঁকে লুণ্ঠন করেছিলেন, সে-কাহিনী সরমাকে বলেন। অভিযোগের এমন প্রত্যক্ষতা সত্ত্বেও রাবণ তাঁর নৈতিকতা হারান না। ভবিতব্য জেনেও তিনি যে তাঁর বীর পুত্রদের যুদ্ধে পাঠান, তাতে তাঁর আত্মপ্রতিশ্রুতি দীপ্রতর হয়ে ওঠে। এমনকী রাবণ যে কোনো অনৈতিক শ্লাঘা বা অভিমান থেকে লঙ্কাকে বীরশূন্য করে ফেলছেন, এমন অভিযোগ থেকেও আখ্যানের পরিণামমুখী গতিতে তিনি নিজেকে মুক্ত করে ফেলেন। এমন মুক্তির জন্যে তাঁকে কোনো চেষ্টা করতে হয় না। আখ্যানের অন্তস্তলে নৈতিকতার উৎসার তাঁকে কলুষমুক্ত করে দেয়। অসংখ্য অতৎসম বাংলা শব্দ, সম্বোধন, বচন, ও প্রবাদ মহাকাব্যিকতাকে এক গোপন লোকায়তের টানে পরিধিরও পরিধির দিকে নিয়ে যায়। মধুসূদন নিজে যখন এক সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে ছিলেন, ফ্রান্সে, তখন এই বাংলাই হয়ে উঠেছিল তাঁর পরিধি। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে আবার সেই পরিধির আখ্যান তৈরি হয়ে ওঠে—একটির পর একটি এমন চিহ্নে, যেগুলি একসঙ্গে আখ্যানের পৌর্বাপর্ব ও পরিধির বিস্তার রক্ষা করে ও ছকে দেয়। 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'কমলেকামিনী', 'কৃত্তিবাস' 'বউ কথা কও', 'আশ্বিন মাস', 'সায়ংকাল', 'বটবৃক্ষ', 'কপোতাক্ষ নদ', 'বঙ্গদেশে এক মান্যবন্ধু', 'বিজয়া-দশমী', 'কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা', 'উদ্যানে পুষ্করিণী', 'কোনো এক পুস্তকের ভূমিকা', 'দ্বাদশ শিবমন্দির' এই সব কিছুই সেই পরিধির চিহ্ন ও সে-চিহ্নগুলি এক গোপন সংযোগে গাঁথা।

সাম্রাজ্যের প্রজা হিশেবে কলোনির প্রচলিত ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির যে-কোনো চেষ্টাই এক সাম্রাজ্যবিরোধী চেষ্টা। সেই চেষ্টার মধ্যে যে-আত্মসন্ধান থাকে, তা, সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে, সে-কেন্দ্র কলকাতাই হোক আর প্যারিসই হোক, নিরবলম্ব হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যের প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থিতি সে-কেন্দ্রে এতই প্রকট, সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আদবকায়দা সেখানে স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি ও কথাবার্তা এমনই ভুলিয়ে দেয় যে আখ্যান এমনকী মানবিক বাস্তবও হয়ে ওঠে না, সামাজিক বাস্তব বা ব্যক্তিবাস্তব তো অনেক দূরের কথা। আবার, সেই পরিধি যখন মানবিক ও ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে, তখন সেই সব মানুষ, নিসর্গ ও দিনরাত্রি কেন্দ্রের বিপরীত এক অন্বয় অনিবার্যত পেয়ে যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ বাংলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-কোনো বাংলালেখার ভিতরই এই বিপরীত অন্বয় সঞ্চারিত হয়ে যায়।

পরিধির এই আখ্যানচিত্র আঁকতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার সম্পূর্ণ ভূগোলকেই গেঁথে ফেলেছেন। এমন গ্রন্থন তাঁর সচেতন পরিকল্পনার ফলে ঘটেছে কীনা এ-প্রশ্ন একেবারে অবান্তর। সেই উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে আমরা সমুদ্রের ভিতরে এগিয়ে যাওয়া স্থলভূমির গরানজঙ্গল ('কপালকুণ্ডলা') থেকে একেবারে উত্তরবঙ্গে পাহাড়সানুতে বৈকুণ্ঠপুরজঙ্গল ('দেবীচৌধুরাণী') পর্যন্ত চলে যাই। সেই আখ্যানযাত্রায় আমরা প্রান্তিকবঙ্গের বাঁকুড়া ('দুর্গেশনন্দিনী'), উপকূলবঙ্গের জনপদ তাম্রলিপ্ত ('কপালকুণ্ডলা', 'যুগলাঙ্গুরীয়'), ভাগীরথী যখন নদীয়াকে বেষ্টন করে বইত সেই সময়ের গৌড়-লক্ষ্মণাবতী ('মৃণালিনী') ও মুর্শিদাবাদ ('চন্দ্রশেখর'), আনুমানিক হুগলি-হাওড়া-নদীয়ার গাঙ্গেয় সমতল ('বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ'), পূর্ববঙ্গের সীমান্তের যশোহর ('সীতারাম')—এই সব বিচিত্র নিসর্গ ও কাহিনীর মধ্যে দিয়ে যাই। পরিধির এই বিপুল আখ্যানের সঞ্চয় স্বায়ত্ত এক স্বাতন্ত্র্য পেয়ে যায়। এই আখ্যান কেন্দ্রের সাম্রাজ্য-আখ্যানের বিপ্রতীপও হয়ে ওঠে না। সম্প্রসারণও হয়ে ওঠে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই পরিধি-আখ্যানে অনেক সময়ই এক দূরবর্তী কেন্দ্রের সংযোগ থাকে ও সেই সংযোগ এই আখ্যানকে নিয়ন্ত্রণ করে। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে জগৎসিংহ কেন্দ্র-দিল্লির যোগসূত্র নন। সে-যোগসূত্রের কাজ করেছেন অভিরাম স্বামী, বিমলা, আশমানি। 'কপালকুণ্ডলা'য় মতিবিবি তাম্রলিপ্তের পরিধিতে কেন্দ্রকে নিয়ে আসেন। 'মৃণালিনী'তে, দিল্লি, পরিধির অনেক ভিতর পর্যন্ত এসেছে। 'চন্দ্রশেখর'-এ চন্দ্রশেখরকে দিল্লির খবরের সূত্রেই মুর্শিদাবাদ যেতে হয়। 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী', 'সীতারাম'-এ কেন্দ্রশক্তি পরিধির ভিতর সশস্ত্র ঢুকে গেছে। কেন্দ্রপরিধির এই সম্পর্ক থেকে আরো স্পষ্ট হয় পরিধি-আখ্যানের কেন্দ্রবিপরীত এক বিস্তার।

পরিধিকে বেশির ভাগ সময়ই অনতিস্পষ্ট কেন্দ্রের বিপরীতে বিন্যস্ত করে কাহিনীকে উপন্যাসের অতিরিক্ত এক গোপন আখ্যানে সম্পাদিত করে তোলা বাংলা গল্প-উপন্যাসের একটি স্থায়ী প্রকৃতিগুণ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ 'গল্পগুচ্ছ'-এর গল্পগুলিতে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের নেপথ্যপরিধিতে যে-জীবন, কখনো কেন্দ্রস্পৃষ্ট, কখনো কেন্দ্রনিরপেক্ষ, তার আখ্যান তৈরি করেন। সে-আখ্যানে কেন্দ্র, পরিধির নিকটতর, বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যানের মত দূরের নয়। সে-আখ্যানে কেন্দ্রের প্রতিনিধি পোস্টমাস্টার পরিধির রতনকে পরিধিতেই ফেলে রেখে কেন্দ্রে ফিরে যেতে পারে, বা পরিধির প্রতিনিধি রাইচরণ এক শিশুমৃত্যুর দায়িত্ব নিয়ে কেন্দ্র থেকে পরিধিতে ফিরে আসতে পারে, শেষে, এক ঋণমুক্তির সান্ত্বনা নিয়ে অদৃশ্যতর পরিধিতে হারিয়ে যেতে, বা পরিধিই এক বালবিধবাকে পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরে আত্মহত্যা পর্যন্ত টেনে নেয় একান্ননির্ভর পরিবারের এক শিশুকে সে মাতৃস্নেহে জড়িয়ে ফেলে বলে, বা বাপ যৌতুকের টাকা ও গয়না পুরোটা দিতে পারেননি বলে তাঁর মেয়েকে জমিদার-শ্বশুরবাড়িতে যেন খুনই করা হয় ছেলেকে নগদ অগ্রিম বুঝে নিয়ে আর-একবার বিয়ে দিতে, বা এক মূর্খ ছোটভাই মৃত বড়ভাইয়ের উইলকে জাল প্রমাণ করতে মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারে না বলে সত্য বলার দুর্বহ দায়ে মারাই যায়।

'গোরা' (১৯১০)-তে পরিধি যতক্ষণ পর্যন্ত কাহিনীর ভিতর না এসেছে ততক্ষণ সেই কাহিনীর ভিতর যে-চরিত্রগুলি যাতায়াত করছে তারা তাদের পরস্পরের সম্পর্ক ঠাহর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে পারছে না। সেই পরিধিও কাহিনীর ব্যাপ্তির অন্তর্গত হল দুই বিপরীত অভিজ্ঞতায়—পরেশবাবুর পরিবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি নিমন্ত্রণে কলকাতার বাইরে যায় আর গোরা এক সত্তা খুঁজতে দেশের ভিতরের দেশান্তরে যায়। কেন্দ্র ও পরিধি শব্দদুটি ব্যবহারের ফলে বৃত্তের সম্পূর্ণতাবোধ বাংলা উপন্যাসের এই বিশিষ্ট লক্ষণের সঙ্গে ভুলভাবে জুড়ে যেতে পারে। কথাটা শুরু হয়েছিল, বাংলা উপন্যাস প্রথম থেকেই কলকাতাকে এড়িয়ে গেছে কেন, এই প্রশ্নটি তুলে। তাই কেন্দ্রপরিধি একটু বেশি দেগে দেয়া হয়েছিল হয়তো। কেন্দ্র নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য-আখ্যানের কেন্দ্র। কিন্তু পরিধি অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে, অজানা, বরং পরিধি কখনো ছড়িয়ে যায়, কখনো গুটিয়ে আসে আর সব সময়ই একটা অনির্দিষ্ট নেপথ্যভূমিতে মিলিয়ে যায়। এই রকম অস্থিতিশীল পরিধিকে কেন্দ্রের সঙ্গে যে-চরিত্রগুলি যুক্ত রাখে তার ভিতর নগেন্দ্রনাথ ('বিষবৃক্ষ') আছে, হরলাল ('কৃষ্ণকান্তের উইল') আছে, গোবিন্দলালও ('কৃষ্ণকান্তের উইল') আছে, ব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরের বাবা ('দেবীচৌধুরাণী') আছে, তেমনি রামকানাইয়ের ছেলে নবদ্বীপও ('রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'), ও এমনকী সন্দীপও ('ঘরে বাইরে') আছে।

পরিধিকে যদি কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সম্পূর্ণতা দেয়ার চেষ্টা করা যায় তাহলে যা ঘটতে পারে তার এক ধরণের উদাহরণ শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসগুলি, 'অরক্ষণীয়া-বামুনের মেয়ে' আর 'মহেশ-অভাগীর স্বর্গ'-এর ব্যতিক্রমসহ। শরৎচন্দ্র পরিধিতে এমন এক স্বয়ংসম্পূর্ণতা আরোপ করেন, যে-স্বয়ংসম্পূর্ণতা থাকলে পরিধি আর পরিধি থাকে না। শরৎচন্দ্রের কোনো গল্প-উপন্যাসেই তাই অদৃশ্য অথচ অনুপস্থিত কেন্দ্রের অপ্রতিরোধ্য টান নেই, এমনকী সেই উপন্যাসের ঘটনা কলকাতা শহরে ঘটলেও, যেমন 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন' বা 'পরিণীতা'। শরৎচন্দ্রের কোনো উপন্যাসে যদি কেন্দ্রের সংযোগ তৈরি করতে পারে, এমন লক্ষণ কোনো চরিত্রের বাইরের তথ্যে থাকে, তাহলেও, সে-চরিত্র ঐ পরিধির ভিতর এক ভুয়ো কেন্দ্রিকতা বানিয়ে তোলে—'পল্লীসমাজ'-এর রমেশ, 'দেনাপাওনা'র জীবানন্দ।

পরিধির ওপর অদৃশ্য অনুপস্থিত কেন্দ্রের এই অজস্র গ্রন্থির টানের কোনো হদিশ করতে পারে না বলেই বালবিধবা বৃদ্ধা জ্ঞাতিভগ্নী আর সদ্যোজাত শিশুপুত্র নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরে হরিহরের সংসার সব সময়ই যেন উন্মূল হওয়ার টানে কাঁপছে। টানটা যে কেন্দ্রেরই সে-হদিশ করতে পারলেও হরিহরের অবস্থা খুব একটা বদলাত না। শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' 'বড়দিদি', 'মেজদিদি', 'বিরাজবৌ', 'পণ্ডিতমশায়', 'নিষ্কৃতি', 'দত্তা', 'পল্লীসমাজ', 'দেনাপাওনা' ইত্যাদি গ্রামে-ঘটছে এমন সব উপন্যাসের বিপরীতে 'পথের পাঁচালী'-কে রেখে দেখা যায়—এক কল্পিত স্বয়ংসম্পূর্ণতার আরোপ কতটাই মিথ্যা হয়ে উঠতে পারে, আর দুর্গার এক গভীর স্বয়ংসম্পূর্ণতার অনুভব সেই সাম্রাজ্যের পরিধিতে ঐ গ্রামের লতাপাতা গাছপালাকে পর্যন্ত নামে-নামে ডেকে-ডেকে শুধু খিদে আর অনটনে কেমন অনিকেত হয়ে যায়। হরিহর-সর্বজয়ার সংসারের আর্থিক অভাব তত গভীর সত্য, দুর্গার প্রকৃতিলগ্নতা আর অপুর বিস্ময়বোধ যতটা সত্য। ইন্দির ঠাকরুনের বয়সক্লিষ্ট পেটটুকুর জন্যে খাবার জোটে না, সর্বজয়ার গৃহকর্মব্যস্ত পেটটুকুর জন্যে খাবার জোটে না, দুর্গার উঠতি বয়সের খিদের জন্যে খাবার জোটে না, অপুর শৈশব-বাল্যের ঐটুকু পেটের মত খাবারও জোটে না, হরিহর সেই পারিবারিক নিত্য-উপবাস থেকে পরিবারকে বাঁচাতে কোনো নিরুদ্দেশে যায়। এ কোন হিংস্র অপারাপারযোগ্য কঠিন শূন্য দেশ, যেখানে মেয়ে মরে গেলেও বাপকে সে-খবর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছুনো যায় না? কতদূরই-বা যেতে পারে হরিহর? কতদূর যাওয়ার আর্থিক ক্ষমতা আছে তার? নিশ্চিন্দিপুর থেকে সেই গোয়ারী কৃষ্ণনগর কতদূর—যেখানে দুমাস মত সময় অগত্যা কাটাতে হয় হরিহরকে? দূরত্বের এ কী পরিমাপ-বিভ্রাট যে দু-তিনটি মহাসমুদ্র ও মহাদেশ পার হয়ে আসা বিদেশীরা নিজেদের শক্তিতে, স্বাধিকারে ও প্রশ্নহীন স্বত্বে এই দেশকে নিজেদের ক্ষমতাভুক্ত 'দেশ' করে নেয়, আর নিশ্চিন্দিপুর থেকে গোয়ারী কৃষ্ণনগর পর্যন্ত দূরত্বে একমাত্র মেয়ের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছয় না?

এই 'পাঁচ' অংশের শুরুতে আমরা বলেছিলাম, আমরা পৌঁছুতে চাইছি সাম্রাজ্য-আখ্যানের অগোচর এক আখ্যানে যা গল্প-উপন্যাস-নাটকে নিহিত আছে, এমনকী হয়তো লেখকের অন্তর্লীন সচেতনতায়। আমরা সংশয়ী ছিলাম, এমন একটি অনুমিত আখ্যানকে কতটা প্রমাণগ্রাহ্য করা যাবে। এই অনুমান ও সংশয় সত্ত্বেও তো আমরা জানতাম, 'পথের পাঁচালী'তে আমরা পৌঁছুব; যেমন এখনো জানি, আমরা 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি' ও 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম'-এও পৌঁছুব। কিন্তু সেই-জানার মধ্যে এই-জানার কোনো আভাসও ছিল না, এই, যেখানে আমরা পৌঁছুলাম আগের প্যারাটির শেষে—সমুদ্র থেকে সমুদ্রের, মহাদেশ থেকে মহাদেশের দূরত্ব ঘুচে যায় দুঃসাহসী অভিযানে, কলোনি বিস্তারে, সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় আর নিশ্চিন্দিপুর থেকে গোয়ারী কৃষ্ণনগরের মাঝখানে সমুদ্র ও মহাদেশের দূরত্ব ছড়িয়ে যায়। যে-সাম্রাজ্য-আখ্যান-বহির্ভূত, অন্তরালের এক গহন আখ্যানের ইঙ্গিত আমরা গল্প-উপন্যাসে খুঁজছিলাম, 'পথের পাঁচালী'তে ও বিভূতিভূষণেরই কিছু ছোটগল্পে, সেই আখ্যান এখন সবচেয়ে স্পষ্ট অক্ষরে পড়ে নেয়া যায়। যেন তাঁর ছাপা লাইনগুলির ভিতর থেকে জলছবির মত নির্মলতায়, রাতের আকাশের মত আভায়, এই আখ্যান নিজেকে মেলে ধরছে—অবশ্যই যদি আমাদের সেই আখ্যান পড়ে নেয়ার মত বর্ণপরিচয় থাকে।

আমরা শুধু 'পুঁইমাচা' (১৯২৫?) গল্পটিই পড়ি। আমরা তো এখানে গল্পটির ভিতর ঢুকছি শুধু সেই চিহ্নগুলি দেখতে যে-চিহ্নগুলি সাম্রাজ্য-আখ্যানের অন্তর্গত হতে পারে না। সাম্রাজ্য-আখ্যানের বিরোধী কোনো আখ্যান খুঁজছি না। কারণ, তেমন আখ্যানেও তো সাম্রাজ্য-আখ্যানের প্রতিক্রিয়াই প্রধান। আমরা খুঁজছি সাম্রাজ্য-আখ্যানের প্রতি প্রশ্নহীন বশ্যতা অথবা সাম্রাজ্য-আখ্যানের বিরুদ্ধে প্রশ্নহীন বিদ্রোহের মাঝখানে এক ছকহীন মানচিত্রহীন পথহীন পরিমাপহীন মালিকানাহীন কোনো জায়গা, যেখানে সাম্রাজ্য-আখ্যানের প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও অস্তিত্বের এক নিরুপায় অসহায়তাও খুবই নিঃসাড়ে পড়ে আছে। কোথাও নিশ্চয়ই দেশজয় আছে, দেশশাসন আছে, সম্পদবৃদ্ধি আছে, একজন মানুষের পক্ষে যথেষ্টরও বেশি খাদ্য আছে, পরিবারের বড়-ছোটদের ভিতর স্থির সম্পর্ক আছে, পরিবারের কেউ একজন মরে গিয়ে থাকলে তার সম্পর্কে কথা বলার স্থিরীকৃত পদ্ধতি আছে। তেমন সেই কেন্দ্র থেকে কোনো অনির্দিষ্ট দূরে, পরিধিতে, ক্ষেন্তি নামে তের বছরের একটি মেয়ে ফেলে-দেয়া বুড়ো পুঁইশাক বয়ে নিয়ে আসে, মায়ের ভয়ে ফেলেও দেয়, উঠোনে পড়ে থাকা দুটি-একটি ডগা নিয়ে ঈষৎ অনুতপ্তা মা রেঁধেও দেয় আর ভবিষ্যতে কচি পুঁই খাওয়ার লোভে সেই ক্ষেন্তি, দু-একটি ডগা পুঁতেও দেয়। 'বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচানে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে...সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর!' ...মাত্র দু-এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছরে পুঁইয়ের ডগা মাচা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু ক্ষেন্তি বেঁচে থাকতে পারে না মাত্র এইটুকু কারণে যে মানুষের মেয়ের বেঁচে থাকার পক্ষে 'বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির'ই যথেষ্ট নয়। শ্বশুরবাড়িতে পণের বাকি টাকা তার হাভাতে খিদেকে আরো অনধিকারী ও অন্যায় করে তোলে। হ্যাঁ, পরিধিতে খিদেরও তো অধিকার-অনধিকার, ন্যায়-অন্যায় থাকে। ক্ষেন্তির বাবা সহায়হরি তাঁর এক প্রতিবেশীকে নেহাতই অন্য দিনের আটপৌরে কথাবার্তার সুরে মেয়েটির মৃত্যুসংবাদ দেন। 'বসন্ত গায়ে বেরুতেই...ফেলে রেখে গেল। ...না একটা সংবাদ, না কিছু। ...গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে...।' যার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনিও তাঁর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করছেন। মেয়ের বিয়ে দিলে কী হয় তার একটু আঁচ পেতে চাইছেন। মানুষের ভাষা যে-সংবাদ বহনে অপারগ সেই সংবাদটুকু অমন অসম্বন্ধ শব্দে বা বাক্যে শ্রোতাকে জানিয়ে দিয়ে ক্ষেন্তির বাবা তাঁর ভাষার যোগ্য ব্যবহার খুঁজে পান এক নিশ্বাসেই, 'চার কি ঠিক করলে?...পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধে হবে না।...।' এ সেই মাতৃভাষা ভুলে যাওয়া, জিভে হঠাৎ জড়তা আসা, শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিজের শরীরের পক্ষে অতিরিক্ত ভেবে ফেলা, বাঁচার অব্যবহিত কারণটি হঠাৎ সরল করে ফেলা, খেই হারিয়ে ফেলা, পৌষসংক্রান্তির পিঠে খাওয়াটুকুকেও অপরাধ ও অনধিকার ভেবে ফেলা, ব্রত পালন করে সেই অধিকার পাওয়ার চেষ্টা, পৌষ-জ্যোৎস্নায় খিড়কি থেকে শিয়ালের পালানো।

'পদ্মানদীর মাঝি' আর 'পুতুলনাচের ইতিকথা' যদি একসঙ্গে পড়ি, এই পরিধির আখ্যান হিশেবে, তাহলে জেলেদের জীবনবিবরণ বা গাওদিয়া গাঁয়ের মানুষজনের ভিতরকার নানা বুনটের চাইতে প্রধান হয়ে ওঠে এই দুই উপন্যাসেই এক ভুলভুলাইয়ার ঘোর। সেই ঘোর থেকে যে-কোনো মুহূর্তে পরিত্রাণ জুটতে পারে শশীর। গাওদিয়ার কারো সঙ্গে তার সম্পর্কের এমন কোনো গিঁঠ নেই যে-গিঁঠ সে খুলতে পারছে না। গাওদিয়ার প্রকৃতির সঙ্গে ও তার ভিতরে কোনো নস্টালজিয়ার কোনো সংক্রমণ নেই। গাওদিয়ায় কোনো কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় না, অথচ সব কিছুই পূর্বনির্দিষ্ট। গোপাল-সেনদিদি সম্পর্কের শরীরিতা, শশী-কুসুমের সম্পর্কের অনতিস্পষ্টতা, গোপালের মৃত্যু, মতির পলায়ন। এ-পরিধিতে কার্যকারণের সংযোগ নেই, উদ্দেশ্য-ক্রিয়ার পৌর্বাপর্য নেই। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাস হয়ে উঠেছে এই নিরবলম্বতায়। সারা উপন্যাস জুড়েই শুধু এমন এক বিলাপ শ্বাসিত হয়ে ওঠে, যদি শশীর ইচ্ছের একটু জোর থাকত। তেমন এক রকমের জোর তো ডাক্তার হিশেবে শশীর বা জেলে হিশেবে কুবেরের ছিলই। সেই জোর তো কুবেরের আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সে তার গ্রাম থেকে যেতে চায় না অথচ যেতে বাধ্য হয়। সারা উপন্যাস জুড়েই এমন বিলাপ জড়িয়ে থাকে, যদি কুবেরের অনিচ্ছের একটু জোর থাকত। হোসেন মিয়া পরিধির আর-এক টুকরোকেই কেন্দ্রের কাছাকাছি কিছু ভেবে নিতে পারে। কুবেরের ভাবনার অতটা জোরই নেই। তার শুধু আছে, শশীর তাও নেই, শরীরের বেঁচে থাকা।

১৯৪০-৪২-এ আমরা 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম'-এ পৌঁছে যাচ্ছি এমন এক ধারণা নিয়ে, বুঝি আমাদের সাম্রাজ্য-বিরোধী আখ্যান, বা, আরো ঠিকঠাক বলতে গেলে, সাম্রাজ্য-আখ্যানের বিরোধী আখ্যান, শুরু হয়ে গেল। বোধহয় হয়ও। এ-উপন্যাসে একই সঙ্গে ক্ষমতার কেন্দ্রের সঙ্গে জনমানবের সংঘাত আছে, পরিধির অনেকটা ভিতরে ক্ষমতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন্দ্রের ঢুকে পড়া আছে, ক্ষমতার কেন্দ্রের সঙ্গে জড়ানো নানা রকমের রাজনীতিক সমাবেশ আছে, আবার সঙ্গে-সঙ্গে, পরিধির জনমানব বলতে বিভিন্ন ধর্মের, হিন্দুদের বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন পেশার যে-মানুষজনকে বোঝায়, ভল্লা-বাগদি-মুচি-কাহার নিম্নবর্ণের এই যে-মানুষজনকে বোঝায়, তাদের কর্মময় এক স্বরূপ আছে। চল্লিশের দশক জুড়ে তারাশঙ্কর বাংলা গল্প-উপন্যাসে পরিধিকেই কেন্দ্রে নিয়ে এলেন। ১৯৪৭-এর 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' সে-অভিযানের এক চরমবিন্দু হয়তো।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে এই 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' পর্যন্ত বাংলা গল্প-উপন্যাসকে তো কত রকম ভাবেই পড়া যায়, ছকা যায়, আঁকা যায়। আমরা শুধু দেখতে চেয়েছিলাম, সেই প্রথম থেকেই প্রকাশ্য উপন্যাসের আড়ালে একটা অপ্রকাশ্য ইঙ্গিত ছড়িয়ে থাকে কীনা, পরিধির অস্পষ্টতাই বাংলা গল্প-উপন্যাসের প্রেয় ভূমি কীনা, সাম্রাজ্য-আখ্যান-নিরপেক্ষ এক ব্যক্তিগত শ্বাসরুদ্ধতা বাংলা গল্প-উপন্যাসের ভিতর অনুচ্চার কোনো আর্তিকে চাপা দিয়ে ঘুমের ভিতরও কথা বলে উঠতে চাইছে কীনা। সাম্রাজ্যের পেষণ অন্য কোনো কলোনির গল্প-উপন্যাসকে এমন গূঢ়চারী, কেন্দ্রবিমুখ, আত্মমগ্ন করেনি।

ছয়

তাহলে বাংলা গল্প-উপন্যাস এমন স্তব্ধ হয়ে গেল কেন দেশভাগ-স্বাধীনতার ঘটনায়? অথবা স্তব্ধ হয়ে যায়নি? বাংলা গল্প-উপন্যাস তখন তার কিঞ্চিৎ-ন্যূন একশ বছরের অভিজ্ঞতায় কেন্দ্রীয় কাহিনীর পরিধিতে অন্য এক অন্তর-কাহিনী লেখার যে-প্রকৃতি অর্জন করেছিল, সেই প্রকৃতির বশে, স্বভাবের টানে, বাঙালির ইতিহাস, অস্তিত্ব ও ভবিতব্যকে অক্ষচ্যুত করেছিল যে-ঘটনা, তা থেকে চোখ সচেতনভাবেই একটু সরিয়ে রেখেছিল? সেই মৃত্যু কি ফিরে এসেছিল বা আসছে, আর-এক জন্ম হয়ে? অথবা, এই নীরবতা সত্যি-সত্যিই এক চর্চিত বিস্মৃতি?

এই একটি প্রশ্নের সামনেই আমরা পড়ে গেছি এই সঙ্কলনের জন্যে গল্প খুঁজতে সেই ৪৬-৪৭ সাল থেকে একেবারে হালের বাংলা গল্প ও উপন্যাস পড়তে-পড়তে। এটা হয়তো একটাই প্রশ্ন। বা, হয়তো এমন প্রশ্ন কখনোই একক হয় না, সবসময়ই বহুমূল। হয়তো এ-প্রশ্নের একটাই উত্তর হয়। হয়তো এ-প্রশ্নের একটা কোনো উত্তর নেই।

উত্তর তো অনেক পরের কথা। আমরা উত্তর খুঁজতে চাইইনি বুঝি। আমরা শুধু তৈরি করে তুলতে চেয়েছিলাম, আমাদের প্রশ্নটিকেই। সেই প্রশ্নটিকে ভ্রূণ থেকে আকার দিতে, গড়ন দিতে, শরীর দিতেই আমরা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে তারাশঙ্কর পর্যন্ত বাংলা গল্প-উপন্যাসের ইতিহাসের ভিতর দিয়ে এলাম। সাহিত্যের শিল্পের ইতিহাসে নীরবতার বিষয় ও পর্বগুলি রহস্যময়। সে-রহস্যের ভিতর দিয়ে না-এলে তার সৃষ্টিসুখের উল্লাসের স্বরগ্রাম শোনা যায় না। আবার উল্টোদিকে তার সৃষ্টির গোপন-গোপনতর স্রোত আঁচ করতে না পারলে তার নীরবতাগুলিকেও শোনা যায় না।

প্রশ্নটিকে নাকচ করে দেয়ার কত স্পষ্ট যুক্তিই তো আছে। ইংরেজি উপন্যাসের ছকে তৈরি গল্প-উপন্যাসের এই ফর্মে কী করে আকার দেয়া যাবে এমন গভীর, কঠিন, শরীরচ্ছেদী অভিজ্ঞতাকে? আমাদের গল্প-উপন্যাস কি কখনোই পরাধীনতাকে প্রধান আধার করে তুলেছে? কটি বাংলা উপন্যাসের বা গল্পের চরিত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের অজস্র মত

উপন্যাস নিয়ে দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও পথের প্রতিনিধি? কটি বাংলা উপন্যাসের বা গল্পের ভিতরকার মানুষজনের সম্পর্ক আমাদের পরাধীন কলোনি জীবনের কার্যকারণে নিয়ন্ত্রিত? চিরস্থায়ী বন্দবস্ত, সরকারি চাকরি আর ডাক্তারি-ওকালতির মত পেশায় লালিত-পালিত আমাদের সামাজিক চৈতন্যে কী করে দেশভাগ-স্বাধীনতার মত ঘটনা বাঁচামরার মত একটি প্রশ্ন হয়ে উঠবে?

এই যুক্তিগুলির ন্যায্যতা স্বীকার করেও কোথাও একটা কাঁটা ফুটে থাকে। এ যুক্তিগুলি যেন বড় বেশি যুক্তিযুক্ত। এ যুক্তিগুলি যেন একটা ঘটে যাওয়া ঘটনাকে অনিবার্য প্রমাণ করতে চায়। এ যুক্তিগুলি যেন যুক্তিশাস্ত্র অনুযায়ী পরম্পরায় সাজানো। সে-পরম্পরা নিশ্চিতভাবে পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তেই পৌঁছয়। এ যুক্তিগুলি যেন অনন্যোপায় মান্যতা আদায় করে নেয়। সম্মতির তোয়াক্কা করে না।

এমন যুক্তি দিয়ে দেশভাগ-স্বাধীনতার সামনে আমাদের গল্প-উপন্যাসের নীরবতাকে স্পর্শ করা যায় না। এতে তো প্রমাণ হয়ে যায় বাংলা গল্প-উপন্যাস এমন সব ব্যাপারে প্রকৃতিগতভাবেই বাকশক্তিহীন। যে শরীরের দোষে মূক, তার নীরবতার কারণ ব্যাখ্যার জন্যে তো অন্য কোনো কারণ খোঁজার দরকার নেই।

কিন্তু মেনে নিতে কোথাও একটা আপত্তি ছিল। সেই কারণেই গল্প-উপন্যাসের নিরিখ ছেড়ে 'আখ্যান' শব্দটির কাছে পৌঁছুনো। সেই কারণেই সাম্রাজ্য-আখ্যানের সর্বগ্রাসী ব্যাপ্তি স্বীকার করে নেয়া। সেই কারণেই সেই আখ্যানেরও কেন্দ্র ও পরিধি কল্পনা করার চেষ্টা। ঐ যুক্তিশাস্ত্রের যুক্তি-অনুযায়ী ইতিহাসের যুক্তির প্রত্যক্ষতা স্পষ্টতই এড়িয়ে যেতে চেয়েছি। যুক্তিশাস্ত্র দিয়ে, ইতিহাসের সূত্র দিয়ে, সমাজবিজ্ঞান দিয়ে শিল্পসাহিত্য অনুভব করা যায় না, এমনকী 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল'র মত ছন্দে লেখা কাব্যও নয়। আর এই রুমালচোর খেলাতেও আমাদের সামর্থ্য বা সমর্থন নেই—শিল্পসাহিত্য থেকে সমাজবিজ্ঞান-ইতিহাসের তথ্যপ্রমাণ টেনে বের করে, সেগুলো থেকে সূত্র বানিয়ে, সেই সূত্র দিয়েই শিল্পসাহিত্যকে যাচাই করা।

এইবার আমরা এই তথ্যটিকে বুঝে নিতে চাই। সেই ১৯৪৭-এ বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক এই তিন বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে সতীনাথও তো সৃষ্টিমান, প্রত্যেকেই তখনো দুর্দমনীয়। বিভূতিভূষণ 'ইছামতী' লিখেছেন ৫০-এ, তারাশঙ্কর 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' লিখেছেন ৪৭-এ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'অহিংসা' লিখেছেন ৪১-এ, সতীনাথ 'জাগরী' লিখেছেন ৪৫-এ। তাহলে, এমন নয় যে দেশভাগ-স্বাধীনতার ঘটনাটিকে শিল্প-অভিজ্ঞতায় পরিবর্তিত করে নেয়ার মত শিল্পচেতন ও ক্ষমতাবান গল্পকার-ঔপন্যাসিকের কিছু অভাব ছিল? তাহলে, এমনও তো হতে পারে দেশভাগ-স্বাধীনতার সেই আসন্নতাতেই বিভূতিভূষণ ইতিহাসযাত্রার সময় বেছে নিয়েছিলেন, তারাশঙ্কর বেছে নিয়েছিলেন দেশ ও মানুষের এক মৃত্তিকাপ্রোথিত আখ্যান উদ্ধারের সময়, মানিক বেছে নিয়েছিলেন আমাদের অস্তিত্বনীতির তত্ত্ব নিয়ে এক উপন্যাসনের সময় ও সতীনাথ তাঁর স্বাধীনতা-আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে প্রশ্নতীক্ষ্ণ উত্থাপনের সময়।

তাহলেও অবিশ্যি এই তথ্যটি বদলায় না যে এই চারজনের কেউই, বা প্রথম মহাযুদ্ধের কাছাকাছি সময় থেকে তিরিশ সাল নাগাদ যাঁদের জন্ম, যাঁরা এই ৪৭ সালেরই কিছু আগে গল্প-উপন্যাস লেখা নিজেদের মত করে শুরু করেছিলেন সেই নবীনরাও কেউই, দেশভাগ-স্বাধীনতাকে একটা পরিণতিবিন্দু বা আরম্ভবিন্দু হিশেবে আবিষ্কার করেননি। করেননি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁরাও, যাঁরা বিশের দশকে আধুনিকতার একটা ধারণা থেকে গল্প-উপন্যাস লিখছিলেন। অথচ এই তিন-বয়সী লেখকরা প্রায় প্রত্যেকেই মাত্র এক বছর আগের (১৯৪৬) দাঙ্গা নিয়ে, মাত্র চার বছর আগের দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩) নিয়ে, এমনকী ৪৫ থেকে ৪৭ পর্যন্ত দু-বছরের নানা রকমের তুঙ্গ রাজনৈতিক আন্দোলন (রশিদ আলি দিবস, নৌবিদ্রোহ, সরকারি কর্মী ধর্মঘট) নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখছিলেন। অথচ তাঁরা কেউই দেশভাগের মত ঘটনার যে-অচিন্ত্যপূর্বতা, লক্ষ-লক্ষ মানুষের যে-উদ্বাসন, পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাসে সে যে অভাবিত আলোড়ন সেই আঁকাড়া বাস্তবকে গল্পকার-ঔপন্যাসিকের দাপটে আঁকড়ে ধরলেন না। দুটো-একটা গল্প বা উপন্যাসের চেষ্টা হল কী হল না সেটা বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য এই অভিজ্ঞতাটুকু যে যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গায় বাংলা গল্প-উপন্যাস যে নৈতিক জিজ্ঞাসায় কাতর হয়ে আধেয়-কল্পনার মৌলিক বদল ঘটিয়েছিল, দেশভাগ-স্বাধীনতায় তা ঘটল না। এই নীরবতার কারণ নানাজন নানাভাবে খুঁজতে পারেন। সত্য হয়তো ছড়িয়ে আছে সেই সব সন্ধানের মধ্যেই। আমাদের শুধু এই সত্যটুকু স্বীকার করে নেয়া—সেই মুহূর্তে বাংলা গল্প-উপন্যাস বস্তুত নীরবই ছিল।

এই যে-নীরবতার কথা আমরা বলছি, সেই তথ্যপ্রমাণকে এড়ানোও যায়। গল্প-উপন্যাসকে তার অব্যবহিত রাজনৈতিক-সামাজিক-ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করতেই হবে—এমন কোনো নান্দনিক বাধ্যতা তো সত্যিই নেই, যদিও গল্প-উপন্যাসের বেলায় শেষ পর্যন্ত বাস্তবের একটা দায় থেকেই যায়। তবু সে-দায় মেটানোর প্রক্রিয়া তো হতে পারে জটিল, সন্ধিসঙ্কুল ও দুরত্যয়ী। দেশভাগ-স্বাধীনতার প্রতিফলন তাহলে কেন আমাদের খুঁজতে হবে ঐ সময়েরই গল্প-উপন্যাসে?

এমন পাল্টা প্রশ্ন তুলে তথ্যপ্রমাণিত এই নীরবতাকে নাকচ করার পক্ষে উদাহরণও কিছু কম নেই, এত বড় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে ইয়োরোপের কোনো ভাষায় কি ঘটেছে আখ্যানের নতুন আবিষ্কার? ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান ও রুশ ভাষা থেকে কিছু উপন্যাসের বা কাহিনীর নাম হয়তো করা যায়, তবু, তার সংখ্যাও অঙ্গুলিমেয়। এক আঙুলে না কুলোলে বড় জোর দু আঙুলে গোনা যাবে। হিরোশিমার অভিজ্ঞতায় যাঁরা এখনো পুড়ছেন, সেই জাপানের গল্পকার-ঔপন্যাসিকরা কি ঐ অভিজ্ঞতা থেকে আখ্যানের কোনো ভুবনান্তর ঘটাতে পারলেন? জার্মানিতে যে-ফ্যাসিবাদ ইয়োরোপীয় আলোকপর্বকে নিকষ আঁধারে ঢেকে ফেলেছিল তার অভিজ্ঞতা কি সেই ভাষার গল্প-উপন্যাসে এমন নতুন নির্মাণে সংলগ্ন হল যেমনটি আগে হয়নি? ইহুদিহত্যার বীভৎসতা থেকে তৈরি হল কোনো নতুন আখ্যান?

এই সব প্রশ্নই খুব সঙ্গত। দেশভাগ-স্বাধীনতার মুহূর্তে বাংলা গল্প-উপন্যাসের নীরবতার একটা আনুষঙ্গিকতাও হয়তো এই সব প্রশ্নে মেলে। সেই আনুষঙ্গিকতাকে যতটা পারা যায় সম্পূর্ণ করতে এই তথ্যগুলোও সাজিয়ে নেয়া যায় যে সাম্রাজ্যের উপনিবেশ থেকে মুক্তির ঘটনা আফ্রিকার ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিশেষত গল্প-উপন্যাসের এক নতুন কল্পনা ও বিন্যাসকে সত্য করে তুলেছে। ইজিপ্টের নাগিব মেহফুজ থেকে আফ্রিকার চিনুয়া আচেবে, সোয়িঙ্কা ও দক্ষিণ আমেরিকার হুয়ান রুলফো, কার্পেন্তিয়ার, কোর্তাজার, ফুয়েন্তিস, মার্কোয়েজ গল্প-উপন্যাসের ধারণা বদলে দিয়েছেন।

সঙ্গে-সঙ্গে টমাস মানকেও মনে পড়ে। এই জার্মান সাহিত্যিক ও বিশ্বনাগরিক সারাটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জুড়ে প্রথমে লিখে গেছেন মানুষের স্বভূমি আবিষ্কারের এক পৌরাণিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মিক কাহিনী, এক নতুন ওল্ড টেস্টামেন্ট, 'জোসেফ আর তার সব ভাই'। যুদ্ধের শেষে লিখে গেছেন সেই সব মিথ নিয়ে উপন্যাস, ইয়োরোপের প্যাগান বিচ্ছিন্নতা ও খ্রিষ্টীয় ঐক্য দু-হাজার বছর ধরে সংজ্ঞার্থ খুঁজেছিল যে-মিথগুলির আধারে—'ডক্টর ফস্টাস', 'মহর্ষিপাতক', তাঁর জীবনের শেষ বছরে, ১৯৫৫-তে, মান এক প্রবল অট্টহাসিতে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন হিটলারি জার্মানির সব বীভৎসতা, 'ফেলিক্স স্ক্রুলের স্বীকারোক্তি'।

আফ্রিকা-দক্ষিণ আমেরিকার মত মহাদেশগুলির বা টমাস মান-এর মত ব্যক্তির কীর্তি আমাদের এই নীরবতার কোনো বিকল্প নয়, তুলনীয় কোনো ব্যর্থতা মেনে নেয়াও নয়। আমরা নীরবতাটিকেই মেনে নিতে চাই তর্ক-বিতর্কের এই সব সম্ভাবনা জেনেই যে, এমন নীরবতা যেমন অন্যত্রও ঘটেছে, সেই নীরবতা অন্য অন্যত্রে তেমনি ভাঙাও হয়েছে। এর কোনো ছক নেই, কোনো নকশা নেই, কোনো আদল নেই। সাতচল্লিশে সেই সময়ের সামনে আমাদের নীরবতা, আমাদের বাংলা গল্প-উপন্যাসেরই নীরবতা। আমাদেরই নিজস্ব কারণে, শিল্পগত কারণে।

কোনো-কোনো সময় এমন আসে শিল্প-সাহিত্যের এক-একটি ফর্মে, যখন সেই ফর্ম শতবাহু বিস্তার করে তার সময়কে গ্রহণ করে। আবার কোনো-কোনো সময় এমনও আসে শিল্প-সাহিত্যের এক-একটি ফর্মে, যখন সেই ফর্ম তার দুটিমাত্র হাতকেও গুটিয়ে ফেলে তার সময়কে প্রত্যাখ্যান করতে। মহত্তর নৈতিকতার গর্ভ ছাড়া শিল্পসাহিত্যের কোনো ফর্মেরই অন্য কোনো জন্মস্থান নেই। এমন তো হতেই পারে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গায় সেই নৈতিকতা যতটা সহজবোধের নাগালে ছিল, দেশভাগের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত দেশভাগে ততটা নাগালে ছিল না। এমনও তো হতে পারে, ঐ-বাস্তবকে আঁকাড়া গল্প-উপন্যাসে আনলে সেই নৈতিকতাকে লঙ্ঘন করতে হত, কারণ, দেশভাগ ও স্বাধীনতার সময় সারা ভারতের, বিশেষত পাঞ্জাব ও বাংলার মানুষকে, প্রকৃতিকে, জীবনযাপনকে ও ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কবিতার ফর্মে সেই নৈতিকতার পুনরুচ্চারণই একটা কাজ—বাংলা কবিতায় তখন সে-কাজ হয়েছে। গল্প-উপন্যাসে বাস্তবের ভিত ছাড়া নৈতিকতাক উচ্চারণ ফাঁপা ফাঁকা বুলি হয়ে যায়।

শিল্প-সাহিত্যে নীরবতা ঘূর্ণির মত পাক খেয়ে ভিতরের দিকে টান দেয়। অনেক সময়। আবার সেই নীরবতাই স্থায়ী হয়ে যেতেও পারে। পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলা গল্পে ও উপন্যাসে সেই নীরবতা কি আমাদের লেখকদের মধ্যে তেমন কোনো টান দিয়েছে জলের অতল মাটির দিকে? অথবা, আমরা সেই নীরবতাকেও ভুলে গেছি, ভুলে আছি?

তেমন একটি আন্দাজের জন্যে বোধহয় ১৯৭০-৭১ বছরটিকে ধরা যায়। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বপাকিস্তান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ হওয়ার পর বাংলা গল্প-উপন্যাসে দেশভাগ, স্বাধীনতা ও দুই বাংলার ভিতরের সম্পর্কে নতুনভাবে কোনো-কোনো গল্পকার-ঔপন্যাসিক তাঁদের আখ্যানকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছেন।

তার আগে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত বছর তেইশ সময়ের মধ্যে চারজন গল্পকার-ঔপন্যাসিক দেশভাগ-স্বাধীনতা ও দুই বাংলার অন্তর্সম্পর্ককে সমকালীন অন্য লেখকদের চাইতে একটু পৃথকভাবে ধারণার ভিতর আনতে চাইছিলেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-৭৫) অসীম রায় (১৯২৭-৮৬), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪) ও প্রফুল্ল রায়।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র-এর আখ্যানস্বভাবের সঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর এই একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিল উল্লেখ করলে হয়তো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে দেশভাগ-স্বাধীনতার ঘটনাটি নরেন্দ্রনাথ নানা ছায়া-রোদের নকশায় কী জটিলতায় ধরতে চাইছিলেন। বিভূতিভূষণের মতই তিনি বেশি লিখতেন বোধহয় এই একটি কারণেই যে তাঁরা তাঁদের একটি গল্পকে সেই গল্পের মধ্যেই ভাবতেন না। কোনো এক প্রাচুর্যের নেপথ্য থেকে তাঁদের গল্পের লোকজন, ঘটনা, কথাবার্তা একটি গল্পের মধ্যে বয়ে আসত আর সেই গল্পটি শেষ হওয়ার পরও তারা অন্য এক অনির্দিষ্ট কিন্তু নিশ্চিত আখ্যানের দিকে উছলে যেত। এই রকমই যাঁদের লেখার স্বভাব, তাঁদের একটু বেশি না লিখে উপায় থাকে না। নইলে তাঁরা প্রাচুর্যের সেই নেপথ্য তৈরি করবেন কী করে? আবার এই বহুকথনের ফলেই এই যে-একটি সুতো তাঁদের গল্পগুলিকে গেঁথে-গেঁথে যেত তা অব্যবহিত পাঠকের চোখ এড়িয়ে যাওয়ার ভয় ছিল। একটি বিপরীতের খেলাও তাঁরা দুজনেই খেলতেন। তাঁদের গল্পে অনেক সময়ই 'আমি' বা ঐ-রকমই একটা চরিত্র থাকে। তাতে এমন মনে হতে পারে বুঝি তাঁদের অভিজ্ঞতাকেই তাঁরা গল্পের একটা চেহারা দিচ্ছেন। এই ছলনার ভঙ্গিতে তাঁরা দুজনই গল্প থেকে ঝরিয়ে দিতেন ফর্মের সব চেনাজানা পরিচ্ছদ। আবার, এই আমির আমিত্ব দিয়ে ঢেকে দিতেন যাকে বলে তত্ত্বদৃষ্টি, বিশ্বদৃষ্টি। এঁদের দুজনের গল্পই দুরন্বয়ী। গল্পের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় কী না হয়, বৃহত্তর পরিধির আর-এক বৃত্তে মিশে যায়, আবার বৃত্তান্তরে চলে যায়।

বিভূতিভূষণ ও নরেন্দ্রনাথের ভিতর আরো অনেক মিল হয়তো খোঁজা যায়, এখন, আমরা বিভূতিভূষণের তুলনা এনেছি নরেন্দ্রনাথ কী করে তাঁর মাত্র কয়েকটি গল্পে ৪৬-৪৭-এর প্রাক-দেশভাগ অনিশ্চয়তা, ৪৭ থেকে ৫০-এর দেশভাগ-স্বাধীনতার পরের উদ্বাসন, ৫০-এর দাঙ্গা, ৫২-র পাসপোর্ট, ও তারও পরে, পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষত কলকাতার, জীবনযাত্রায় জায়গা খুঁজে নিতে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষজনের, মেয়েদের, প্রস্তুতি—এই প্রধান ঘটনাগুলির ব্যক্তিসঙ্কেত দিয়েছেন, সেটা পড়তে। বিভূতিভূষণের গল্পের কথা মনে আনার পেছনে আমাদের হয়তো এমন একটা ধারাবাহিকতা তৈরির চেষ্টাও আছে যে 'পথের পাঁচালী' ও 'পুঁইমাচা' ইত্যাদি যেমন সাম্রাজ্য আখ্যান নিরপেক্ষ এক উপস্থাপন, নরেন্দ্রনাথের এইসব গল্প ও আরো কিছু গল্প তেমনি এক ভিন্ন আখ্যানের আভাস।

আমরা এখানে 'ভুবনডাক্তার', 'পালঙ্ক', 'বিদ্যুৎলতা', 'কাঠগোলাপ', 'দ্বিচারিণী', এই সব গল্পের কথা বলছি। একটু ছড়িয়ে 'রস', 'হেডমাস্টার', 'চড়াই উৎরাই' এই সব গল্পের কথাও ভাবা যায়, যদিও এই গল্পগুলিতে ঘটনা হিশেবে দেশভাগ-স্বাধীনতার তেমন আবছা কথাও হয়তো নেই। আবার হয়তো আছেও। তেমন তো হতেই পারে। একই পর্বে লেখা এই গল্পগুলি একসঙ্গে পড়লে প্রথমত পূর্ববঙ্গের মুসলমান জীবনের শ্রমময় এক নৈতিকতায় উত্তীর্ণ হই আমরা। যখন মুসলিম লিগ-মুসলমান সমাজ আর পাকিস্তান একার্থক হয়ে উঠেছে, তখন একজন গল্পকার, মুসলমান-বাঙালির বৃত্তির ও বেঁচে থাকার সদর্থ খুঁজছেন—'ভুবন ডাক্তার', 'পালঙ্ক', 'রস'—একেই তো আমরা বলতে চাইছি বিপরীত আখ্যান। সেই দৈনন্দিন বেঁচে থাকা ও বৃত্তি তো পৃথক কিছু নয়, তাই এই বিপরীত আখ্যানে বাঙাল বাচনের নাটুকে তির্যকতা, চকিত দীপ্তি ও কঠিন সংক্ষিপ্ত কাব্য এক এমন জীবনকে প্রামাণিক করে তোলে যা দেশবিভাজনের ঘটনার চাইতেও যেন সত্যতর। কৌতুকে-আয়রনিতে জীবন জীবনেরই মত ঝলমলে। দ্বিতীয়ত, উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষজন কলকাতার মধ্যবিত্ত সংজ্ঞার মধ্যে যেমন একটু জায়গা খুঁজছে—'কাঠগোলাপ', 'দ্বিচারিণী',

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হেডমাস্টার', 'চড়াই উৎরাই'—তেমনি সেই জায়গা পাওয়ার তাড়ায় মেয়েদের বেঁচে থাকা থেকে খসে যায় আত্মরক্ষার সঙ্কোচ, গৃহনির্মাণের শ্রমের আবেষ্টন থেকে তারা মুক্তি খোঁজে জীবিকার শ্রমে। শ্রমের ভিতর দিয়ে মুক্তির সেই আকাঙ্ক্ষা এই গল্পগুলিকে এমন নৈতিকতায় মুড়ে দেয় যা শুধু কঠিন বেঁচে থাকা থেকে উৎসারিত হয়। আর সে-উৎসারণও ঘটে এক পরম কৌতুকে। দেশভাগ-স্বাধীনতা একটু পরোক্ষ, এমন গল্পেও সেই সময় ঢুকে যাচ্ছে।

তাঁর আখ্যানকল্পনাতেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র-এর বিপরীত কোটিতে অসীম রায়। 'দেশদ্রোহী'তে (১৯৬৭) বাঙালি অস্তিত্বের তাত্ত্বিক-দার্শনিক অস্থিরতাই আখ্যানের অক্ষ, নায়ক ভবানীপ্রসাদ সেই অক্ষের চিহ্ন। বা, একটু কৃত্রিম ছবি তৈরি করে বলা যায়, দেশবিভাজন ও স্বাধীনতার চক্রনেমি ঘোরে ভবানীপ্রসাদকে ঘিরে। বা, ভবানীপ্রসাদই ঘোরেন ঐ দেশবিভাজন-স্বাধীনতাকে সত্য করে তুলতে। অসীম রায় তাঁর তত্ত্ব, তাঁর বিশ্ব, তাঁর ইতিহাসকে প্রধান অবলম্বন করে তোলেন। সেই শোকপালনের অশৌচে জীবন ব্যথাময়, সে-ব্যথা কবিত্বময়ও, কিন্তু কখনোই এমন কৌতুকময় নয়, যে-কৌতুক ছাড়া জীবন জীবন থাকে না। অসীম রায় এক নিষ্ঠুর পরিত্রাণহীন ট্র্যাজেডির অনালোক অন্ধকার তৈরি করে তুলতে চাইছিলেন। সে-অন্ধকার থেকে কোনো উদ্ধার নেই। অথচ সে-অন্ধকারও স্মৃতিগন্ধমেদুর। তাই 'দেশদ্রোহী'র উপসংহার ঘটে কলকাতা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের দিকে যাওয়া যশোর রোডটি প্রতীক হয়ে ওঠার মধ্যে। 'আবহমানকাল' (১৯৭৮)-এ তত্ত্ব বা বিশ্ব বা প্রতীক, পূর্ব বাংলার নিসর্গ ও মানুষের প্রাধান্যে একটু যে কম বেদনামথিত তার কারণ মাঝখানে ১৯৭০-৭১-এ বাংলাদেশ ঘটে গেছে। তবু, 'আবহমানকাল'-এও মানুষজন ও তাদের সব সম্পর্ক ইতিহাস-সমাজের আর্তিতেই বাঁধা। ইতিহাসই সেখানে প্রত্যক্ষ। যে-নিরালোক নিরুদ্ধার ট্র্যাজেডিকে অসীম রায় আখ্যায়িত করে তুলতে চাইছিলেন তা যতটা তাঁর বিশ্বদৃষ্টি বা বিশ্বতত্ত্বের যুক্তিসংলগ্ন ততটা তাঁর অনুভব-অভিজ্ঞতার সংলগ্ন ছিল না। তাঁর পূর্ববাংলা বা অখণ্ড বাংলা যতটা কাল্পনিক, ততটা বাস্তবিক নয়। শিল্পসাহিত্যে বিশ্বদৃষ্টি বা বিশ্বতত্ত্ব, বাইরের কোনো উপাদান নয়, এমনকী লেখকের সচেতন কোনো উপাদানও না হতে পারে। গল্প-উপন্যাস লেখা মননচর্চার অংশ নয়, বরং যুক্তি ও মননের বিপরীতে কোনো বোধ বা অনুভূতির ইশারাই কখনো কোনো এক জীবনকে চকিতে ভয়ঙ্কর বাস্তব করে তোলে—যেমন হয় বঙ্কিমচন্দ্রে, রবীন্দ্রনাথে, বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিকে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মত লেখক ইতিহাসকে বা রাজনীতিকে চোখ ঠেরে এক আপাত ইতিহাসনিরপেক্ষ জীবনের ভিতর থেকে দেশবিভাজন-স্বাধীনতাকে দেখছিলেন আর অসীম রায়ের মত লেখক জীবনের দৈনন্দিনকে আপাতত সরিয়ে রেখে ইতিহাস বা রাজনীতিতে দেশবিভাজন-স্বাধীনতাকে দেখছিলেন। এই দুই লেখককে মিলিয়ে দেখলে আমরা অনুমান করতে পারি আমাদের গল্পকার-ঔপন্যাসিকরা নানা পথে এই ঘটনার ভিতর ঢুকে পড়েছিলেন।

আমরা যে ১৯৭০-৭১-কে দেশবিভাজন-স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের আখ্যান ভাবনার একটা অদলবদলের সময় বলেছিলাম, তার খুব একটা লাগসই সাক্ষ্য অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। এই বইটির প্রথম খণ্ড বেরয় ৬৭-তে আর দ্বিতীয় খণ্ড ৭১-এ। উপন্যাসটি দেশভাগে শেষ হয় না, শেষ হয় পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোষণা করে জিন্নার বক্তৃতায়, সামুর প্রতিবাদে, তারও পরে একুশে ফেব্রুয়ারিতে, তারও পরে ঈশমের মৃত্যুতে। হয়তো এই উপসংহার ভাবা হত না ৭০-৭১-এ বাংলাদেশের জন্ম ছাড়া। কিন্তু জিন্নার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর একুশে ফেব্রুয়ারি, বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় খোঁজার এক নতুন মোড়। পশ্চিমবাংলার ঔপন্যাসিক সেই কথা বলে পঁচিশ বছরের নীরবতা ভাঙলেন? এই উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে হিন্দু-মুসলমানদের এক যৌথ গ্রামজীবনের অনেক কাহিনী, ঘটনা, চরিত্রের নানা সন্ধি ও বিচ্ছেদের জোড় লাগিয়ে, ও জোড় খুলে-খুলেও। লিগের ও পাকিস্তানের টান বাঙালি মুসলমানের কাছে কত গভীর অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সামসুদ্দিনে তার সেই ব্যক্তিগত হদিশ খুঁজেছেন, যে-ব্যক্তিগত ছাড়া উপন্যাস শিল্প হয় না। এ উপন্যাস কলকাতায় শেষ হল না, নায়ক সোনার জাহাজের কাজ নেয়াতেও শেষ হল না, ঢাকায় জিন্নার বক্তৃতা ও একুশে ফেব্রুয়ারিতেও শেষ হল না—শেষ হল ঈশমের মৃত্যু, সামসুদ্দিনের গ্রামে ফেরা, ফতিমার কান্না আর অর্জুন গাছের গায়ে লেখা সোনার বৃক্ষলিপির পাঠোদ্ধার মেলানো একটি ঘটনায়। পুরুষানুক্রমিক বসবাসে ও জীবনরচনায় সেই গ্রামই সামসুদ্দিন-মালতীর অশেষ বাল্যপ্রণয়ের ভূমি, সামসুদ্দিন-কন্যা ফতিমা ও সোনার বাল্যরূপকথার ভূমি, সামসুদ্দিনের মুসলমান চৈতন্য জাগরণের ভূমি ও তার বাঙালিচৈতন্য সৃষ্টির ভিত, জেঠামশাই ও ঈশমের মানুষ থেকে প্রতীক হয়ে যাওয়ার ভূমি। এই নিশ্চয়তাবোধই উপন্যাসটির পরিণতিকে এমন অর্থবান করে তোলে—সেই পরিণতিতে পৌঁছনোর ছকটা যদি একটু বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠে থাকে, তাও। বোধের এই স্পষ্টতা ছাড়া দেশভাগ-স্বাধীনতার আখ্যান তৈরি করে তোলা যায় না। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পরস্পর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক সব রীতিবিধি ও বিশ্বাস আবার একই গ্রামের একই পরিবেশের অন্তর্গত এই দুই ধর্মের মানুষজনের বেঁচে থাকার এক সমবায় ; পারস্পরিক বিনিময়, আর ব্যক্তিগত সব সম্পর্ক গড়ে তোলার মানবিক টানে ধর্ম আর সমাজের বিধিনিষেধ উপড়ে যাওয়া—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিজ্ঞতাকে এই রকম করেই উপন্যস্ত করেছেন। ১৯৪৭-এ আমরা নীরব হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ, আমাদের তখন মনে হয়েছিল, আমাদের গল্পটা আগে থেকে কারো লিখে রাখা, সিনেমার স্ক্রিপ্টের মত, আমরা শুধু সেটাকে সত্য করে তুলছি? ১৯৪৭-এ আমরা নীরবই ছিলাম, কারণ, তখন 'আমরা' শব্দটি কেমন ভেঙেচুরে গেল, সেদিন পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতে 'আমরা' বলতে সেই মুসলমানদেরও কি বোঝাত যাঁরা পাকিস্তানে গেলেন না? অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর এই উপন্যাসটিতে খুব গোপনে এক ব্রতপালনের দিকে আমাদের ঠেলে দেয়া হল—নীরবতা যদি ভাঙতে হয় তাহলে বেঁচে থাকার সেই একটি সমবায়কে, টুকরো টুকরো সব সমাজকে, বিচ্ছিন্ন ধর্মকে পুনর্নির্মাণ করতে হবে। গল্প-উপন্যাসে। তার ভিতর দিয়ে আর-একবার বেঁচে আসতে হবে আমাদের, সেদিন, সেই দেশ-বিভাজন আর স্বাধীনতা পর্যন্ত সময়টিতে, কী ভুল বেঁচে ছিলাম আমরা, বা কী ভুল বাঁচতে হয়েছিল আমাদের, জানতে।

১৯৭০-৭১-এর আগে বাংলা দুটো আলাদা দেশ হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি কবিতায় নানা রকম সব সঙ্কেত তৈরি করে তুলেছিল, নানা ব্রতপালনের আনুষঙ্গিক সব সঙ্কেত, পূর্ববাংলার নিসর্গের নানা সঙ্কেত, রূপকথারও নানা সঙ্কেত। ঐ সময়ের আগে লেখা গল্প-উপন্যাসে এমন সব সঙ্কেতই হয়ে উঠছিল বোধের আভাস। যা ছিল একেবারে নিজের তা চিরকালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে হারিয়ে ফেলার বোধের আভাস—অসীম রায়-এর যশোর রোড, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নীলকণ্ঠ পাখি বা প্রফুল্ল রায়-এর কেয়াপাতার নৌকো।

বাংলাদেশ মুক্তি আন্দোলন নিরপেক্ষ লেখা প্রফুল্ল রায়-এর 'কেয়াপাতার নৌকো'—দুখণ্ডই ৬৯-এ বেরিয়ে গেছে। দেশভাগের আসন্নতা থেকেই বাঙালি জীবনের আত্মকথা ভেঙে যাচ্ছিল হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে, আবার এক আত্মকথা তৈরিও হয়ে উঠছিল মুসলমান বাঙালিদের মধ্যে। এই স্ববিরোধিতার একরকমের সমাধান অন্তত আপাতত ঘটেছিল বাংলাদেশ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হওয়ার ফলে। তেমন কোনো সমাধানের সঙ্কেত ছাড়াই প্রফুল্ল রায় এই উপন্যাসটি লিখেছিলেন। প্রফুল্ল রায়-এর উপন্যাস-কল্পনা এখানেই আলাদা যে তিনি কলকাতা থেকে আসা একটি বার বছরের ছেলেকে দিয়ে পুব বাংলাকে আবিষ্কার করিয়েছেন, ১৯৪০ থেকে ৫০-এর পুব বাংলাকে। তাঁর এই লেখায় তাই স্মৃতির চাইতে আবিষ্কার মুখ্য—যুগনের পেছন-পেছন বিনুর সেই দেশ-আবিষ্কার একটা অভিযানই যেন। উপন্যাসটি শেষ হয় যদিও দাঙ্গায়, দেশভাগে ও বিনুর দেশত্যাগে, তবু, এই ঘটনাগুলির আর তেমন প্রয়োজন থাকে না শুধু এই আয়রনিটুকু ছাড়া, ঐ দেশটি বিনুর দেশ হয়ে গিয়েছিল তাহলে? পুববাংলার কথ্যভাষায় ঝলক, যা বহু ব্যবহারেও তার দীপ্তি হারায় না, কোনো কথ্যভাষাই হারায় না, একটু-আধটু লোকচলিত গান আর সেই নিসর্গ তো প্রত্যাশিতই। ঔপন্যাসিক অপ্রত্যাশিতকে এনে দেন তাঁর বস্তুজ্ঞানে, 'অঘ্রান মাসের শুরু থেকেই এদেশের পুকুরগুলো খারাপ হয়ে যায়', বা, তালেব মিয়া জমির মালিকদের কাছে অনুমতি চায় ধানকাটার পর মাটি-মাখামাখি আর মেটে ইঁদুরের গর্তের ধানগুলো কুড়িয়ে নিতে, বা, কত রকমারি জালে জল আটকে বা বেঁধে সেই জলের দেশে মাছ ধরা হয়, বা এমনকী একেবারে শেষেও এমন লাইন চমকে দেয়, 'সবে কার্তিকের শুরু। এখনও মাঠে প্রচুর জল। ধানখেত আর শাপলাবন ঠেলে...'। কার্তিক মাসে মৌসুমিতাড়িত ভাটির বাংলাতেই এত জল থাকে।

ভারত-পাকিস্তান জোড়া যে-ভারতবর্ষ ছিল ৪৭-এর আগে, ১৯৭০-৭১-এ সেই ভূখণ্ডে রাজনীতির দাবি নিয়ে আন্দোলন, শাসকদের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে সমাবেশ, সশস্ত্র হয়ে শাসকদেরই আক্রমণ করা, বিভিন্ন দেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে প্রকাশ্য ও ঘোষিত যুদ্ধ—এ সব যদি না ঘটত তাহলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'পূর্ব-পশ্চিম' লেখা হত না। এই এমন একটি এত বড় উপন্যাস ও শান্তা সেন-এর খুবই ছোট রচনা 'পিতামহী'র কথা মনে রেখেই আমরা বলেছিলাম, ১৯৭০-৭১-এ বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম, ঐ পুরনো ভূখণ্ডেই, বা আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার ফলে আর তা পূর্ব পাকিস্তানেই ঘটার ফলে, বাংলা গল্প-উপন্যাসে দেশভাগ-স্বাধীনতাকে নতুন করে ভাবা, দেখা ও আরো পিছিয়ে গিয়ে বা এগিয়ে এসে, তার এক ঐতিহাসিক স্থানাঙ্ক বা আমাদের অস্তিত্বের বোধে তার চারিয়ে যাওয়া, নতুন করে হয়তো আমরা মাপতে চাইছি।

'পূর্ব-পশ্চিম' কোনো স্মৃতিপ্রতীককে কাহিনীর কেন্দ্রে জায়গা করে দেয়নি। হিশেব করে বলা যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' শেষ হল ঢাকায় জিন্নার যে-মিটিঙে, যেন সেই মিটিঙ থেকেই 'পূর্ব-পশ্চিম' শুরু হল। আবার, হলও না। ১৯৫৪—এর ঘটনা আবার পেছিয়ে গেল সেই তিরিশের দশকের মাঝামাঝি। 'পূর্ব-পশ্চিম'-এর অভীষ্ট সময় তাই ১৯৩৫ থেকে ১৯৮০ই বলা যায়। এই প্রায় পঞ্চাশ বছরের বাঙালি জীবন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দুমুসলমানের বাঙালি জীবন। আরো ঠিক করে বলতে গেলে, হিন্দুমুসলমানের বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবন। ঔপন্যাসিক সে-জীবনকে এখনকার 'বিশাল ভারতীয় মধ্যবিত্ত' জীবনের অংশ হিশেবেই বুঝতে চেয়েছেন।

উপন্যাসের শেষের দিকে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবাংলা থেকে খেদিয়ে তাড়িয়ে দেয়া, আর, এক হাতে আটলান্টিক অন্যহাতে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোলোরাডো রাজ্যের প্রধান শহর ডেনভারে, এ-উপন্যাসের প্রথম পাতার প্রায় আট বছরের বালক আমেরিকান পাশপোর্ট নিয়ে ভারতের ভিসার অভাবে ছাব্বিশ বছর বয়সে দেশহীন পড়ে আছে। এই দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে মিলিয়ে ভাবলে অর্থান্তর তৈরি হয়। তেমনি এর এক পাল্টা অর্থান্তরও তৈরি হয়, এ-উপন্যাসের আর-এক মানুষ, তাকে নায়কই বলা যায়, সে-ও উপন্যাসের প্রথম থেকেই আছে ও শেষ পর্যন্তই আছে, মামুন, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুনেতা হারীত মণ্ডলের পালিত পুত্রকে নিজের বলে মানুষ করতে বাংলাদেশে নিয়ে যায়—এই ঘটনায়। মামুনের ঘটনা কেন বিপরীত অর্থান্তর? তার আকৈশোর বন্ধু প্রতাপ মৃত্যুশয্যায়, তার ছেলে এসে পৌঁছুতে পারে না। অথচ মামুন তার পিতৃত্বে তার সন্তানের কাছে পৌঁছয়।

উপন্যাসের গল্প এতটাই ছড়িয়ে যেতে থাকলে তার ভরকেন্দ্র হয়তো টলে যায়। সব কিছু দায় নিয়েই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই দুই বাংলার মানুষজনের পঞ্চাশ বছরের জীবনকেই তাঁর উপন্যাসের জিজ্ঞাসা করে তুলতে চেয়েছেন।

এটা আমার কাছে বেশ একটু কৌতুকেরই লাগছে, যে আমি বলতে চাইছি ৭০-৭১-এ বাংলাদেশের ঘটনা না-ঘটলে হয়তো শান্তা সেনও 'পিতামহী' লিখতেন না। 'পূর্ব-পশ্চিম'-এর আকারের পাশে 'পিতামহী' তো মাত্র কয়েকটা পাতা। পিতামহীর ঘটনা ঘটেছিল ১৯৫০-এ। সেই ঘটনা শান্তা সেন ১৯৯৩-এ লিখলেন—'টুলটুলির পথ', 'সাতপুরুষের পথ', 'মাগোর পথ' এই তিন টুকরোয় ছড়িয়ে। প্রায় তেতাল্লিশ বছর আগের একটি ঘটনা না-লিখে তিনি পারছিলেন না। বাংলাদেশের মুক্তিতে এই স্মৃতির এক ভুবন যেন নির্ঝরের মত ঝরে পড়তে লাগল। এই মুক্তিতে আমারও কোনো শোক লেগে আছে—এমনই এক সান্ত্বনার খোঁজে শান্তা তাঁর সারা দিনের ব্যস্ততা ঘুচিয়ে মধ্যরাতের কলকাতার এক বাড়ির এক ঘরে গোপনে এই কাহিনী লিখতেন। এই কাহিনী না-লিখে তাঁর কোনো উপায় ছিল না। তিনি কোনো শিল্পের অবয়ব তৈরি করে তুলতে চাননি এ-লেখায়। এক বালিকার স্মৃতি, বংশানুক্রমিক রীতি আর বাংলার-বাঙালির ঠাকুমা মিলে এ-কাহিনীর ভিতরের-ভিতরের অপার বিচ্ছেদের কাছে পৌঁছুতে চাইছিলেন হয়তো শান্তা। তেমন পৌঁছুনোর একটা পথ যে খোঁজা যায় এ-উদ্যোগ তাঁর মনেও আসত না, যদি ৭০-৭১ থেকে এই কাহিনী লেখার সময়, ধরা যাক, ৯১-৯২ পর্যন্ত, বিশ বছর ধরে মুক্ত বাংলাদেশের শিশু-তরুণ-প্রৌঢ় অনেক মানুষজনকে তিনি তাঁর বাড়িতে, নিজের বাড়ির লোক করে না-নিতেন। সেই সম্পর্কই ঐ অপার বিচ্ছেদের বেদনা ব্যথিয়ে তুলেছে আর জিইয়ে তুলেছে এই বোধ, যে বিচ্ছেদেই বুঝি সান্ত্বনা। 'পূর্ব-পশ্চিম' স্থানের এক বিস্তার, 'পিতামহী' সময়ের এক বিস্তার। কোনো একটা বিস্তারও সম্ভব হত না ৭০-৭১-এর বাংলাদেশ ছাড়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

এমন অধ্যায়ে-অধ্যায়ে ভাগ ভূমিকা আর নানা নামে গুচ্ছ-গুচ্ছ সাজানো একতিরিশটি গল্পের সংকলন থেকে কারো এমন ভুল হতে পারে যে বুঝি আমরা এই সব বুঝেসুঝে, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে এই নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বাংলা গল্প-উপন্যাসের নানা উপত্যকা-অধিত্যকার মানচিত্র ছকে নিয়ে, থার্মোমিটার বা গজকাঠি বা দাঁড়িপাল্লায় মেপেজুখে, ওজন করে, তবে এই বইটি তৈরি করে তুলেছি।

আসলে ঘটেছে ঠিক এর উল্টো। আমরা গল্পের মধ্যেই বেশি করে, কখনো-সখনো উপন্যাসেও, হদিশ হারিয়ে ফেলেছি। এত সব লেখার ভিতরে দেশভাগ-স্বাধীনতা নিয়ে এতই কম লেখা হয়েছে দেখে কখনো বোকাও হয়েছি। পেছিয়ে গেছি, এগিয়ে গেছি। ঠিক একটা ফরমূলা তৈরি করে তার সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে গল্প বাছতে একেবারেই চাইনি। অথচ বাছাই মানেই তো কোনো একটা চালুনি চলতেই থাকে। যখনই মনে হয়েছে, চালুনিই আমাদের হাতটা নাড়াচ্ছে তখনই চালুনি বদলেছি। এমন খোঁড়াতে-খোঁড়াতে, হাতড়াতে-হাতড়াতে, ঠাহর পেতে-পেতে এই সংকলনটি গাঁথা হল। এর ভিতর কোনো যুক্তি নেই। বরং অযৌক্তিক কিছু থাকতেও পারে। এই নীরবতাটা এতটা গভীর ও ব্যাপক টের পাওয়ার পর নীরবতার নিশানা খুঁজতে চাইছিলাম—বড় নদীতে স্টিমার বা বড় নৌকোর জন্যে স্রোতের নীচের মাটি বা চরের নিশানা দিয়ে বাঁশ পোঁতা থাকে।

তেমন নিশানা প্রথম দেখতে পেলাম একটু কম-বয়েসিদের গল্পেই—আফসার আমেদ, রবিশংকর বল, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, অমর মিত্র। কোথাও বেঁচে থাকার জন্যে দুঃসাধ্য সব বৃত্তিতে সমুদ্রের সেই গভীরে দুই বাংলার জেলেরা এক মাটিতে মাছ শুকোয়, সেখানে যেন দেশভাগ ঘটেনি, কিন্তু স্বাধীনতা ঘটেছে। বা, আমাদের নাগরিক বেঁচে থাকার ভিতরে সঞ্চারিত হয় এক নিয়ত পুরাণ। তা, কখনো-বা স্মৃতিই, স্মৃতির দিকে বা স্মৃতি থেকে এক ঢেউ। কল্যাণব্রতের গল্পে বাংলাভাষী অন্য এক ভূখণ্ডের, ত্রিপুরার, নিসর্গ ও মানুষজন। প্রবীণ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সেই স্মৃতি-পুরাণ এগিয়ে নিয়ে আসেন এখনকার বাংলাদেশেও।

তাহলে কি দেশভাগ-স্বাধীনতা নিয়ে আমরা একটা পুরাণের দিকেই অনিশ্চিত চলে যেতে চাই বারবার?

এমন প্রশ্ন, প্রশ্নই থাকে মাত্র, উত্তরের কিছু আভাস নিয়ে। তেমন কল্পনা ভেঙে তছনছ হয়ে যায় যখন শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নিষ্ঠুর হাতে তুলে দেখান ১৯৬৫-এর দাঙ্গার স্মারক, এই কলকাতায় ও আশেপাশে, যেন ৪৬ বা ৫০ কখনোই দূর অতীত হয় না। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ে আমাদের, এই ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত বাঙালি হিশেবে ব্যাবসাপাতি আর উন্নয়নের সুবাদে, বদলে যাওয়া অর্থবান জীবনের কাছে, অতীত, কৈফিয়ৎ চায়। আমাদের বেঁচে থাকাটাতে কোথাও দোষ স্পর্শ করেছে। ৭১-এর বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা হিন্দু বাঙালি ভদ্রলোক হারিয়ে ফেলেন তাঁর এতদিন ধরে সংখ্যালঘু হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে টিকে থাকার জেদ—অমলেন্দু চক্রবর্তীর গল্পে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পের প্রথম দিকে চকিতে একবার মরিচঝাঁপির উল্লেখ করেন আর গল্পের সেই পাগলিনী এক কঠিন প্রতিমা হয়ে ওঠে।

এর আগে রমেশচন্দ্র সেন, দিনেশচন্দ্র রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, দিব্যেন্দু পালিত, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, মহাশ্বেতা দেবী, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অসীম রায়-এর ১১টি গল্পে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উদ্বাসন ও সেই উচ্ছিন্ন মানুষজনের পায়ের তলায় একটু মাটি পাবার জীবনপণ চেষ্টা পুরাণের কল্পনাকে ছাপিয়ে গেছে। মহাশ্বেতা দেবীর 'স্তনদায়িনী' গল্পটিই প্রায় নিয়ে নিয়েছিলাম—গল্পটিতে বাঙাল মালিক আর তার বিপরীতে শহরবাসিনী যশোদার বিপ্রতীপে দেশভাগের পরিবেশের আভাসও ছিল। পরে মনে হল, স্তনদায়িনীর কল্পনায় এমন এক দুর্লভ সহজ প্রতিমাগম্যতা আছে যে ইতিমধ্যেই গল্পটিকে সাহিত্য-অতিরিক্ত দুর্ভার বইতে হয়েছে। সে-ভার আর নাইবা বাড়ালাম। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়-এর গল্পটিতে সেই উদ্বাসন যে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়ে গিয়েছিল তার এক কাহিনী পাওয়া গেল। গল্পটির খবর দিয়েছিলেন প্রাবন্ধিক অধ্যাপক বন্ধু বিষ্ণু বসু।

এই গুচ্ছের আগে জীবনানন্দ দাশ ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে দেশভাগের ভবিতব্যতা পূর্ব বাংলাতে কেমন সত্য হয়ে উঠছিল, বিশেষ করে মুসলমান মানুষজনের মধ্যে, তার নিয়তিতাড়িত বিবরণের সঙ্গে, দেশভাগের পরও দেশভাগ কেমন অবাস্তব ছিল নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে তারই এক ব্যক্তিগত বিবরণ। সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ননী ভৌমিক ও রবি সেনের গল্পে স্বাধীনতা পাওয়ার মুহূর্তে, তার অব্যবহিত পরে ও তার অনেক পরে স্বাধীনতা শব্দটি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছে। জীবনানন্দ দাশ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের গল্প দুটি তাঁদের দুটি উপন্যাস থেকে চয়িত। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বই পাওয়া এখন কঠিন, কবিবন্ধু ভূমেন্দ্র গুহ আমার ইচ্ছের কথা জানতে পেরে বইপত্র জোগাড়ে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। এমন পাশাপাশি ছিলেন গল্পকার গৌতম সেনগুপ্ত, সমালোচক শিলাদিত্য সেন, প্রাবন্ধিক অধ্যাপক কবিতা চন্দ ও তরুণ শিল্পশিক্ষার্থী অভ্রদীপ সরকার।

আদিগুচ্ছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর বুদ্ধদেব বসু-র তিনটি রচনায় যেন সেই সময়কে উৎরে গিয়ে একটা বড় সময়ের সঞ্চার ঘটেছে। তারাশঙ্করের 'কান্না' গল্পটির দিকেও আমাদের টান ছিল। ইংরেজরা সবে চলে গেছে এমন এক কলকাতার কথা আর খ্রিস্টীয় পুরাণের আদলের সে-টান ঠেকানো কঠিনই হত। বিভূতিভূষণের গোটা তিনেক গল্পে দেশভাগের সামান্য উল্লেখ আছে আর সেই তিনটি গল্পেই তিনি কেমন অনায়াসে বিশ-বাইশ বছরের এক পুরনো চিঠিতে অত বছর আগে মৃত প্রথম স্ত্রীর স্মৃতি, ফেলে যাওয়া সন্তানের টানে মৃত মায়ের ফিরে-ফিরে আসা, আর এক মহাকবির কথা বলেন। বুদ্ধদেব বসু-র রচনাটি ছোটগল্প হিশেবে লেখা নয় কিন্তু এও তো এক আখ্যান।

প্রকাশের কালানুক্রমে বা লেখকদের বয়স অনুসারে গল্পগুলি সাজানো হয়নি। তার একটা তুচ্ছ কারণ গল্পগুলি প্রথম প্রকাশের তারিখ ঠিকঠাক জানা গেল না। বয়স অবিশ্যি সবারই জানা। এ-সংকলন যেহেতু একটিমাত্র প্রসঙ্গকে ঘিরেই, তাই বয়সটা বিবেচ্য ঠেকে নি।

প্রথম গল্পটি থেকে শেষ গল্প যদি পরপর পড়ে যাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে, এই গল্পগুলি বিন্যাসের ভিতর দিয়ে আমি একটি আখ্যান গড়ে তুলতে চেয়েছি। গল্পগুলি এমন করে সাজানো হল যাতে সেই ১৯৪৬-৪৭ থেকে এই ৯০-এর দশক পর্যন্ত সময়ের প্রবহমাণতা স্পষ্ট হয়। সেই আখ্যানটিকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যেই পুরাণ, প্রতিশ্রুতি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রব্রজন, পুনরাবর্ত, পুরাণ এই পাঁচ গুচ্ছে গল্পগুলিকে সাজিয়েছি। এই গুচ্ছরচনায় যেমন দেশভাগ-স্বাধীনতার আখ্যানের বহুবাচনের দিকে একটা ইশারা দেয়া হয়েছে, তেমনি, এই ৫০-৫১ বছরের সময়টিকেও একটা প্রবহণে বোঝার চেষ্টা আছে। ৪৬ থেকে ৪৮-এ দেশভাগ-স্বাধীনতাকে এক মহত্তর পুরাণে সংলগ্ন করার চেষ্টা ছিল। ৪৭ থেকে ৫০-৫২ পর্যন্ত দেশভাগ-স্বাধীনতার অর্থ বুঝে নেয়ার পর্ব গেছে। ৫০-৫২ থেকে বা তার একটু আগেই উদ্বাসনযাত্রা, জীবিকা খোঁজাখুঁজি, পশ্চিমবঙ্গে রিফিউজি কলোনি তৈরি। তারপরও দাঙ্গা সত্ত্বেও বাংলাদেশ। তারপর আবার এক পুরাণ খোঁজার পালা। এই আখ্যানটিকে তৈরি করে তুলতে চেয়েছি বলেই এ সংকলনের শুরুতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শবরী' আর শেষে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু'—রামায়ণের দুই পরাক্রান্ত, জন্মান্তরগ্রস্ত, শপ্ত, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, দীর্ঘায়ত, তিতিক্ষাময় চরিত্রের নামাঙ্কিত দুটি গল্প। আমরা হয়তো আমাদের এই জীবনের আখ্যান নিয়ে মহাকাব্য লিখে উঠতে পারিনি কিন্তু দেশভাগ-স্বাধীনতা থেকে আমাদের এই যাত্রা এমনই মহাকাব্যিক যে তা নিয়ে যা লেখা হয় তাতেই মহাকাব্যের ছোঁয়া লেগে যায়। আমি চেয়েছিলাম, এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পগুলি যেন তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভেঙে ফেলে এক মহত্তর আখ্যান গড়ে তোলে। 'আখ্যান' শব্দটির অর্থ বিপরীতময়, সংঘর্ষসঙ্কুল, রহস্যাকীর্ণ—নামপরিচয়, সংজ্ঞাপরিচয়, ইতিহাস, গল্পকথা, পুরাণ। আমাদের যে-জীবনের কথা এই গল্পগুলিতে ছড়িয়ে আছে, তার ভিতর দিয়ে এই আখ্যানই তো রচিত হয়েছে। এ-আখ্যান বাঙালি-ভারতীয়ের সেই নিজেকে খোঁজার আখ্যান—একই সঙ্গে সংজ্ঞা ও কল্পনা, ইতিহাস ও উপন্যাস, পুরাণ ও বর্তমান।

১৯৯৮

সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত 'রক্তমণির হারে' গল্প-সংকলনের ভূমিকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মার ইতিহাস

সাহেবরা কি দেখিতে পান না যে আকাশে তারা উঠে?

বঙ্কিমচন্দ্র, দেবতত্ত্ব ও হিন্দু ধর্ম্ম।

কেবল কাশীরাম দাস বা কথক ঠাকুরদের কথিত মহাভারতে যাঁহাদের অধিকার, তাঁহাদের বিশ্বাস কৃষ্ণই যুদ্ধের মূল...

বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণচরিত্র।

যাঁহাদের কাছে বিলাতি সবই ভাল, যাঁহারা ইস্তক বিলাতি পণ্ডিত, লাগায়েৎ বিলাতি কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী ভিখারিকেও ভিক্ষা দেন না, তাহাদের আমি কিছু করিতে পারিব না।

বঙ্কিমচন্দ্র, কৃষ্ণচরিত্র।

এক বৌ একটা গল্প জানত আর একটা গান জানত। কিন্তু সে কোনোদিন কাউকে গল্পটা শোনায় নি, গানটাও শোনায় নি। তার ভিতরে থাকতে-থাকতে গল্পটার আর গানটার দমবন্ধ হওয়ার জোগাড়। তারা তার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে পালাবার জন্যে আঁকুপাঁকু করছিল। বৌটি একদিন হাঁ করে ঘুমচ্ছিল। সেই ফাঁক দিয়ে গল্পটি গলে বেরিয়ে এল। তারপর একজোড়া জুতো হয়ে বাইরের দরজার চৌকাঠের বাইরে বসে থাকল। গানটিও দেখাদেখি বেরিয়ে এসে বাইরের দরজার পাশে একটা পেরেকে জামা হয়ে ঝুলতে লাগল।

বৌয়ের স্বামী বাড়ি ফিরে সেই জুতোজোড়া আর জামা দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কে এসেছে?'

বৌ বলল, 'কেউ না।'

'তাহলে এই জুতোজামা কার?'

বৌ বলল, 'আমি তার কী জানি?'

লোকটির তো রাগও হল, সন্দেহও হল। কথায় কথায় তাদের ঝগড়া লেগে গেল। লোকটি রেগে গিয়ে কাঁথা বগলে বেরিয়ে বটতলায় গিয়ে শুয়ে থাকল। বৌ তো কিছু বুঝতেই পারছে না, আবার নিজের মনে ভাবছেও, সত্যি তো, জুতো আর জামাটা এল কোত্থেকে। কিছু আন্দাজ করতে না পেরে সে কুপি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।

নেবাবার পর ঐ গ্রামের সব কুপি-প্রদীপ বটতলায় গিয়ে জড়ো হয়ে সারা রাত গল্পগুজবে কাটাত। সে-রাতে সব কুপিই এসে গেছে—ঐ বাড়ির কুপি আর আসে না। শেষে যখন এল তখন সবাই চেপে ধরেছে—তোর আজ এত রাত হল কেন।

সে বলল—আমাদের বাড়িতে কর্তাগিন্নির তুমুল ঝগড়া হয়েছে।

কেন? কী নিয়ে ঝগড়া?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্তা যখন বাড়ি ছিলনা তখন বাইরের দরজার চৌকাঠের গোড়ায় একজোড়া জুতো রাখা আর পাশে একটা পেরেকে একটা জামা। কর্তা যতই বৌকে জিজ্ঞাসা করছে, এগুলো কার, বৌটি কিছু বলতেই পারেনা। সে জানেই না, তো বলবে কী?

তো এল কোত্থেকে জামা আর জুতো?

ঐ বৌটি একটি গল্প জানে আর একটি গান জানে। কিন্তু কোনোদিন কাউকে গল্পটি বলেও নি, গানটিও শোনায় নি। তার ভিতরে থেকে-থেকে গল্পটি আর গানটির মরণদশা। শেষে তারা ফাঁক পেয়ে বৌটির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে জামা আর জুতো হয়ে শোধ তুলেছে। বৌটি তাও টের পায়নি।

কাঁথার তলায় শুয়ে কর্তা তো এ-সব শুনে নিশ্চিন্ত হল যে তার বৌয়ের তাহলে কোনো দোষ নেই। সে রাত না পোয়াতেই বাড়ি ফিরে এল আর তার বৌকে সব বলল। তার বৌ আরো ধন্দে পড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল 'কার গল্প? কোন্ গান?' তার কিছু মনেই পড়ল না।

এক বেচারা বুড়ির দুই ছেলে আর দুই বেটার বৌ। এই চারজন মিলে রাতদিন বুড়িকে কষ্ট দিত। শাপ-শাপান্তও করত। বুড়ির চেনাজানা এমন কেউ ছিল না যার কাছে গিয়ে মনের দুঃখের দুটো কথা বলে হালকা হতে পারে। বুড়ির ভিতরে কথা যত জমতে লাগল, সে ততই ফুলে উঠতে লাগল। বুড়ি যে এমন মুটিয়ে যাচ্ছে তা নিয়েও তার ছেলেরা আর বেটার বৌরা তাকে খুঁটতে লাগল। তারা তার খাওয়া কমিয়ে দিল—বসে-বসে খেয়ে তো মোটা হচ্ছ।

একদিন বাড়ির সবাই বেরিয়ে গেলে 'ধুততোর ছাই' বলে বুড়িও যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে-হাঁটতে গ্রাম পেরিয়ে গেল, মাঠ পেরিয়ে গেল। বুড়ি আর না পেরে এক পোড়োভিটের ওপর বসে পড়ল। সে-ভিটের চারটে দেয়াল আছে, কোনো চালা নেই। সেইখানে বসে-বসে মনের দুঃখ আর চেপে রাখতে না পেরে বুড়ি দেয়ালের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে তার বড় ছেলে তাকে কত কষ্ট দেয় সে-কথা বলতে লাগল। সব শুনে দেয়ালটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে একটা গাদা হয়ে উঠল। বুড়ির নিজেকে একটু হালকা লাগল। বুড়ি তখন আর-একটা দেয়ালের দিকে মুখ করে তার বড় বেটার বৌয়ের কাণ্ড-কারখানা বলতে লাগল। শুনতে-শুনতে সে-দেয়ালটাও ধসে একটা গাদা হয়ে উঠল। বুড়ির ছোটছেলে আর ছোট বেটার বৌয়ের কথা শুনতে-শুনতে বাকিদুটো দেয়ালও ধসে গাদা হয়ে গেল।

আর বুড়ি দেখে—কোথায় গেল তার ফোলা শরীর! তার সব ফোলা শুকিয়ে গেছে—সে এত হালকা হয়ে গেছে যে হাঁটতে গেলে উড়ে যায়। বুড়ি ওড়ার মত করে হেঁটে আবার ছেলে-ছেলেরবৌদের সংসারে ফিরে এল।

এক বুড়ি মা-ষষ্ঠীর ব্রত করেছে। সকালে স্নান সেরে, হাতে পাখা আর দূর্বা নিয়ে সে একজন কাউকে ব্রতকথা শোনানোর জন্যে খুঁজছিল। 'কথা' না শোনাতে পারলে তো তার পালন পুরো হবে না। তার হাতে হলুদ-মাখানো এক মুঠো চাল। যাকে শোনাবে তার হাতে দেবে, কথা শোনাবে, তারপর তাকে পাখার বাতাস আর দূর্বার জলের ছিটে দেবে। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার পালন পুরো হবে।

কথা শোনানোর লোক আর বুড়ি পায় না। তার ছেলেরা বলল—কাজেকম্মে যেতে হবে। বৌ-রা বলল—ছেলে খাওয়াতে হবে। নাতিপুতি বলল—পাঠশালা যেতে হবে। ব্রাহ্মণ বলল—যজমানকে কথা দেয়া আছে। ধোপানিরা বলল—কাপড় শুকোতে দিতে হবে। বেলা পড়ন্ত হল, তবু সে-বুড়ির কথা শোনানো হল না। ব্রত বুঝি বিফলে যায়।

এদিকে বুড়ির কথা তার যে-ছেলেরা শুনল না, তাদের সেদিন সারাদিনেও কোনো কাজ এগল না। তাদের বৌরা যে-বাচ্চাদের খাওয়াতে গেল, তাদের করল অসুখ। নাতিপুতিরা পাঠশালায় খেল বেত। ব্রাহ্মণ সারাদিন তার যজমান পেল না, খেতেও পেল না। ধোপানিদের শুকোতে দেয়া কাপড় গরু-ছাগলে খেয়ে নিল।

ওদিকে বুড়ি খুঁজতে-খুঁজতে পেছনের এক গলির ভিতর এক ভর-ভরন্ত পোয়াতিকে পেল। সে তার কথা শুনতে রাজি হল বটে কিন্তু তার আগে তাকে পায়েস খাওয়াতে হবে। বুড়ি তার বাড়ি থেকে পায়েস তৈরি করে এনে তাকে পেট পুরে খাওয়াল। পায়েস খেয়ে সে ঘুমিয়ে কাদা। বুড়ি যত বলে, আমার ব্রতকথাটা শুনে ঘুমোও, সে-পোয়াতি চোখ খোলা রাখতেই পারে না। শেষে সে একেবারে ঘুমিয়ে পড়ল, আর বুড়ি গালে হাত দিয়ে বসে থাকল।

একটু পরে সেই পোয়াতির পেটের ভিতর থেকে তার বাচ্চা বলে উঠল, আমার মায়ের নাভির ওপর হলুদমাখা চাল রেখে তুমি বরং আমাকেই কথা শোনাও। সারা দিনের চেষ্টায় এতক্ষণে বুড়ি তার কথা শোনানোর লোক পেল যে পালাতে পারবে না—যদিও তার তখনো জন্ম হয়নি। আর কথা শোনাতে পেরে বুড়ির ব্রতরক্ষা হল।

মুখফেরতা এই সব গল্প কি কোনো একটা আভাস তৈরি করতে চায় বা নেহাতই কোনো একটা 'কথা', ইংরেজিতে ভাল করে যাকে কমনসেন্স বলা যায়, আর বাংলায় কাণ্ডজ্ঞান শব্দটি যে-আভাস বা যে-কথার পক্ষে খুব ভারী হয়ে যায়? কোনো কথা যদি জাগে বা কোনো সুর—তাহলে তা কাউকে বলে দাও, কাউকে না-পেলে দেওয়ালকেই বলো, কাউকে না-পেলে পেটের বাচ্চাকেই বলো। তবু বলো। নইলে হয় মুটিয়ে যাবে, না-হয় ভুলে যাবে, না-হয় ব্রতপালন হবে না। এমন আভাস আরো খুঁজে বের করা যায়—গল্পও বদলা নিতে চায়, শোনার কথা না শুনলে কাজের কাজও হয় না। এইসব গল্প থেকে কথার কত সুতোই যে ছাড়ানো যায়! এত-যে শোনা আর শোনানোর দায় ও বলার দায় মনে করিয়ে দেয়া হয় এত সব মুখফেরতা গল্পে একটা দরকারি কারণ হয়তো শুধুই এই—চলাফেরা করতে গেলে চোখ খোলা আর কান খাড়া না-রাখাটা তো অসামাজিকতা। কলকাতার জ্যামরাস্তা থেকে ঘুরে ট্যাক্সিওয়ালা হাত নেড়ে উল্টোপথের ট্যাক্সিকে আঙুল নেড়ে জানিয়ে দেয় না—জ্যাম, জ্যাম? বেআইনি ট্রাকওয়ালাকে ফিরতি ট্রাক জানিয়ে দেয় না—সামনে পুলিশ আছে? কিছু মুখচাপা কানচাপা লোক সব সময়েই সব জায়গায় থাকে। যেন, তারা চোখ বুজে কান ঢেকে থাকলেই দুর্ঘটনা ঘটবে না। এদের নিয়ে বাড়িঘরেও বিপদ, হাটেঘাটেও বিপদ। তুমি যা জেনে ফেলেছ—তা আর-একজনকে জানিয়ে দাও। কেউ যদি কিছু জানতে চায়—তার কথাটুকু কানে নিয়ো। বলে দাও, শুনে নাও—এমন এক দরকার থেকে তৈরি নীতিবোধই হয়তো আধুনিকতম ইনফোটেকের ভিত্তি। লোকায়তিক নীতিবোধ যখন বদলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রযুক্তি হয়ে যায় তখন প্রযুক্তি আর লোকায়তিকও থাকে না, নীতিবানও থাকে না। প্রযুক্তির মালিক আছে—তার টাকা খাটে। টাকা খাটানোর বুদ্ধি নিশ্চয়ই কমনসেন্স নয়।

যদি আপাতত মেনেই নেয়া যায় গল্প বলা বা শোনার এই দুটি বিপ্রতীপ আছে, কমনসেন্স আর প্রযুক্তি, আরো এমন বিপ্রতীপ নিশ্চয়ই কল্পনা করা যায়, তাহলে এই দুইয়ের সন্নিহিত অথচ বিপ্রতীপ নয় এমন একটা ধারণা কি তৈরি করা যায়, যেখানে গল্প-বলা বা গল্প-শোনা থেকে কোনো শারীরিক রেচন ঘটছে না, তবু গল্পটা বলা না হলে সেখানে ব্রতপালন অসম্পূর্ণ থাকে। তাহলে তাকে তো খুব স্পষ্ট করে জানতে হয়—কোন্ ব্রত সে পালন করছে ও সেই ব্রতকথাটি কী। যে তা জানে না সে তো সেই গল্প বা গান জানলেও ভুলে থাকবে, এমন কী শুনলেও মনে আনতে পারবে না। এমনকী যদি তার জানাও থাকে ও মনেও থাকে, তাহলেও তো সে তার গল্পটিকে চিনে নিতে পারবে না যখন সেই গল্পটি তার সামনে ঘটে যাবে।

এক দেউনিয়া তার এক মানষিকে নিয়ে কয়েক নদী পারে তার ছেলের বাড়িতে যাচ্ছিল। মানষিটা জানত, তার দেউনিয়া চারটি গল্প জানে। সে ভেবেছিল বেশ কথা শুনতে-শুনতে রাস্তা পুইয়ে যাবে। রাস্তায় দেউনিয়া কোনো কথাই বলল না। এক জায়গায় তাদের দুপুরের খাওয়ার জন্যে বসতে হল। মানষিটা ভাবল, ভালই হল। জিরবার পর, খাওয়া-দাওয়ার পর, মানষিটা বলল, 'হে গিরি, একখান কথা কও'। দেউনিয়ার তখন ভাতঘুম পেয়েছে। সে একটিও কথা না বলে ঘুমিয়ে পড়ল। দেউনিয়া যখন ঘুমিয়ে তখন তার ভিতর থেকে সেই গল্প চারটি চটে লাল হয়ে বেরিয়ে এল। তারা একজন আর-একজনকে বলল—'দেউনিয়া যদি আমাদের কথা কখনোই কাউকে না বলে তাহলে আমাদের আর ওর ভিতরে থেকে লাভ কী? এসো, বরং ওকে মেরে ফেলে আমরা আর-কারো ভিতরে ঢুকি।' এই বলে তারা কী করে দেউনিয়াকে মারবে সেই নিয়ে পরামর্শ শুরু করে।

একজন বলল, 'কাল যখন ওর ছেলের বাড়িতে খেতে বসে প্রথম গ্রাস মুখে তুলবে তখন আমি ভাতগুলোকে সুচ করে দেব।'

আর-এক গল্প বলল, 'যদি তাতে কাজ না হয় তাহলে আমি গাছ হয়ে উপড়ে পড়ে ওকে রাস্তায় চেপ্টে দেব।'

তিন-নম্বর গল্প বলল, 'যদি তাতেও না মরে, তাহলে আমি সাপ হয়ে ওর পা বেয়ে উঠে ওকে ছোবলাব।'

চার-নম্বর গল্প বলল, 'তাতেও যদি না মরে, তাহলে আমি জলে ঢেউ হয়ে ওকে ডুবিয়ে মারব।'

একজনকে চার রকম করে মারার বুদ্ধি এঁটে তারা আবার দেউনিয়ার ভিতরে ঢুকে গেল। ঘুমের ভান করে পড়ে থেকে দেউনিয়ার মানষিটা সব কথা জানল।

পরদিন দেউনিয়া ছেলের বাড়িতে মুখে গ্রাস তুলতেই মানষিটা এক ঝটকায় তার মুখের দিকে তোলা ভাত ফেলে দিল। বলল 'পোকা, পোকা'। ছড়ানো ভাতগুলো তখন সুচ হয়ে পড়ে আছে।

সেদিনই মানষিটা হঠাৎ দেউনিয়ার হাত ধরে দৌড়ে একটা রাস্তা পেরতেই এক বিশাল গাছ ভেঙে পড়ল—সেটা তাদের কাঁধেই পড়তে পারত। রাস্তায় এক সাপ দেখে মানষিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটাকে মেরে ফেলল। আর স্নানের সময় একটা বড় ঢেউ আসতেই দেউনিয়াকে পাড়ের দিকে ঠেলে দিল। সেই পাড়ে বসে দেউনিয়া তাকে বলল—'দেখ্, আমি গুনে-গুনে দেখেছি তুই চার-চারবার আমাকে মরার হাত থেকে বাঁচালি। তাহলে নিশ্চয়ই তুই কিছু জানতে পেরেছিস, যা আমি জানি না। বল্ তুই কী জানিস।' তখন সেই মানষিটা বলে, 'বলতে পারি। তবে বললে তো আমি মরে যাব।' দেউনিয়াটি বলল, 'তুই মর্, তবু বল্।' মানষি তখন বলে, 'আচ্ছা বলছি। বলে মরছি। মরলে তোমার নাতিটাকে এনে এই পাথরের ওপর রাখলে আমি বেঁচে উঠব।' দেউনিয়া মানষিটার কাছে সব শুনল আর মরা মানষিটাকে রেখে উঠে চলে গেল। সে আর নাতিকে এনে পাথরের ওপর রাখলও না, মানষিটাও আর বেঁচে উঠল না। পরে দেউনিয়ার মেয়ে সব শুনে নিজের ছেলেটিকে বুকে করে নিয়ে সেই পাথরের ওপর শুইয়ে দিতেই মানষিটা বেঁচে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল।

তাহলে গল্প যখন বলার সময় তখনই না বললে, গল্প সম্পূর্ণ উল্টো পথেও চলে যেতে পারে—গল্প একেবারে খেয়ে ফেলতে চাইতে পারে গল্পটি যে ধরে আছে তাকেই। এক 'ইন্ডিয়ান' নাম দিয়ে সমুদ্রের চারদিকের কত দ্বীপ-মহাদেশের মানুষদেরই-না মারল ইয়োরোপের সব দেশ, তারা 'ইন্ডিয়ান' বলতে যে-গল্প জানত, বাইরে যাকে পেল তাকেই সে-গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলল বা গুলিয়ে ফেলল। ৩৯০ খ্রিস্টাব্দে মিশরের সেরাপিস-এর মন্দির আর সন্নিহিত আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি খ্রিস্টানরা পুড়িয়ে দিল, বছর পঁচিশ পরে বীভৎস খুন করল গণিতশাস্ত্রের দার্শনিক হাইপেসিয়াকে। মিশরের সব প্যাগান গল্প মিশরকে মারল আর হয়ে উঠতে চাইল খ্রিস্টানযুগের অন্ধকার গল্প। আধুনিক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইয়োরোপীয়রা তো শুধুই প্রাচ্যের গল্পগুলি দিয়েই প্রাচ্যকে মারতে চেয়েছে। সেখানে, সম্ভব হয়েছে, যেমন পূর্ব, পশ্চিম ও নিম্ন-সাহারা আফ্রিকায়, সেখানে গল্প যে-ধারণ করে ছিল হাজার-হাজার বছর ধরে, তাকে এমনই নিশ্চিহ্ন করে তারই গল্প দিয়ে মারা হয়েছে যে এখন সেই গল্প জানতে গেলে কোনো ইয়োরোপীয় ভাষাতেই আমাদের তা জানতে হয়। এতটা যেখানে সম্ভব হয়নি, যেমন মিশরে বা চিনে বা ভারতে, সেখানে গল্পের ধাতুকে সেই গল্প শোনানো হয়েছে শাহেবদের মত করে, শাহেবদের ভাষায়। সে আরব্যরজনীর সহস্রাধিক গল্পই হোক আর 'মহাভারত'-এর লক্ষাধিক শ্লোকই হোক।

গল্পগুলো দিয়েই যে গল্পের ধাতুকে মারা হচ্ছে তা কিন্তু জানতে পেরেছিল শুধু 'সেই মানষিটা'। মানষিটার কাছে সেটুকু জেনে নেয়ার পর তাকে বাঁচিয়ে তোলার দায়ও আর নেয়নি সেই মোড়ল-দেউনিয়া। যেন দেউনিয়ার তেমন কোনো দরকার ছিল না তাকে বাঁচিয়ে তোলার। অথচ সেই মানষিই দেউনিয়াকে যতটা বাঁচানো সম্ভব, বাঁচিয়ে এনেছে। মানষিটাকে বাঁচায় আর-এক সমতুল্য মানষি। দেউনিয়ার মেয়ে। গল্প জুড়ে মারণ আর বাঁচনের এক বৃত্ত বারবার তৈরি হয়, ভেঙেও যায়, আবারও তৈরি হয়।

আবার গল্প যে চিনে নিতে পারে তার কাছে তো আর-একটা গল্প তৈরি হয়—ঐ মানষিটা আর ঐ দেউনিয়ার মেয়ের কথা থেকেই।

দেশকাল নেই এমন একটা তত্ত্বকথাই যেন আমরা পাড়ছি—তত্ত্ব ছাড়া গল্প হয় না। সে তত্ত্বকথার তত্ত্বকে লুকোবার জন্যে তাকে ব্রতও বলা যায়, বোধও বলা যায়, নাড়িজ্ঞান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা যায়। যাই বলা হোক-না-কেন, গল্প যে বলছে তাকে গল্পটা জানতে হয়, বলার আগে থেকেই। গল্প যে শুনছে তাকেও গল্পটা জানতে হয়, শোনার আগে থেকে। কেন বলছে, সেটাও তাদের দু-পক্ষই জানে। আর পক্ষ হয়তো দুটো নয়ই, গল্প বলা আর শোনা আর জানা—এ সবই হয়তো একপক্ষেরই কাজ।

অথচ বরাবরই তো এমন হয়ে আসছে। কবিরা বরং তাঁদের কবিতায় একটা তাত্ত্বিক প্রয়োজনের কথা বলে রাখেন বা বলে থাকেন। তারপর, এমনকী তাঁর কবিতাকে প্রায় সেই তত্ত্বের প্রমাণও করে তোলেন। তেমন তত্ত্ব যে তখনকার কবিতা নিয়ে সেই কবির অভিজ্ঞতা আর গ্রহণবর্জন থেকেই জেগে উঠছে, সেই তত্ত্বেরও আগে যে কবিতাই আছে, তত্ত্বহীন কবিতার এক অপ্রাসঙ্গিক বোধ—সে সবই সত্য, তবু কবিদেরই কেন প্রয়োজন হয় এমন তত্ত্বের একটা ফ্রেম? আর গল্পকাররা বড় জোর হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র-এর মত, একটা সামাজিকতার বা সংগ্রহের-আকারের ইঙ্গিতটুকু দিয়েই ফ্রেমের কাজ সেরে ফেলতে পারেন! একটু বাইরে থেকে দেখলে তো প্রথম ধাক্কায় মনে হয় কবিতাই তত্ত্ব থেকে মুক্তি, আর গল্পই অনেক সময়, তত্ত্বকথার ফ্রেম। দ্বিতীয় ধাক্কাতেই অবিশ্যি কবিতা আর তত্ত্ব, গল্প আর তত্ত্ব, কে কার ফ্রেম বা চৌকাঠ আর কোনটা সেই ফ্রেম বা চৌকাঠের ভিতর আর কোনটা বাহির, তা গুলিয়ে যায়। আজকাল তো বেশিই গুলিয়ে যায়। এখন বাড়িঘরে বাইরের সদর দরজায় যদি-বা চৌকাঠ থাকে, নিরাপত্তার কারণে, ভিতরের ঘরের দরজার নীচের আড়কাঠটা তো থাকেই না, পরিচ্ছন্নতার জন্যে, হাঁটাচলার সুবিধের জন্যে। অথচ সদর দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে যে-ভিতর, সেই ভিতরের ঘরগুলিরও তো ভিতর-বাহির আছে। সেই ভিতর-বাহির হয়তো চৌকাঠের সম্পূর্ণতা ছাড়াই স্পষ্ট হয়। আমার এক বন্ধু তাঁর বাড়ি তৈরি করেছেন যেখানে ঘর আছে অথচ দরজা নেই, মানে এমনকী তেকাঠও নেই। সেখানে দরজা থাকার কথা, আমাদের অভ্যস্ততায় বা প্রত্যাশায়, সেখানে দরজা থাকতে পারত, এমন একটা ফাঁকা। নীরদ মজুমদার-এর কলকাতার লেক গার্ডেনসের ফ্ল্যাট দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। বাড়িতে চারজনের মধ্যে তিনজনই ছবি আঁকেন—পুরোটাই একটা হল বললে হল, বা স্টুডিয়ো বললে স্টুডিয়ো। আবার তারই ভিতর সেলফ, ইজেলস্ট্যান্ড, ক্যানভাস এ-সব দিয়ে এক-একটা 'ভিতর' আলাদা করা। যেন, ভিতরের যে-আড়ালটাকে গুঁড়িয়ে দিতে সব খুলে দেয়া হয়েছে, সেই আড়ালটা আবার রাখাও হচ্ছে। তাহলে, কোথাও কি একটা চৌকাঠ বা দরজাহীন ফাঁকা বা আবডাল দরকারই হয়ে যায়, কোনো এক চলনশীল ভিতর-বাহির, পরিবর্তমান ভিতর-বাহির?

আমরা সমস্যার সেই জায়গাটিতে প্রায় পৌঁছে গেছি, যে-জায়গাটিকে কোনো স্থানাঙ্কে চিহ্নিত করা যায় না, চোখের কী-একটা অসুখে যেমন কিছু দেখতে তাকালে দৃষ্টি আড়াল করে একটা কাল বিন্দু। সে-বিন্দুটা নড়াচড়া করে, আবার আকারে বড়ছোট হয়। সেই বিন্দু একটা ভুল দৃশ্য দেখায়, যেন সেটা দৃশ্যের মধ্যবিন্দু। আবার, মধ্যবিন্দু বলে বিন্দুটাকে নজর করতে গেলেই কিছুটা টলে যায়। আমরা যখনই কিছু ছকে নিতে চাই তখনই খুব স্পষ্ট করে দাগাতে চাই, পাড়ে আর জমিনে যেন গোলমাল না হয়, ভিতর আর বাহিরে যেন কোনো অস্পষ্টতা না থাকে—কোনটা ভিতর, কোন্ জমিনে পাড় বসাতে হচ্ছে—ফ্রেম কোনটা আর বাঁধানো হল কী, ফ্রেমের বাইরে কী। তেমন ছকে নিতে গেলে তো আমাদের বারবারই জিজ্ঞাসা করতে হয় চৌকাঠটা কী—ঐ বাইরের দরজা, নাকী ভিতরের দরজা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাকী দরজা থাকতে পারত এমন একটা ফাঁকা, নাকী আসবাবপত্র দিয়ে আবডাল। কান্ট থেকে জ্যাক্স দেরিদা এর একটা খুব জুতসই জবাব খুঁজে বের করেছিলেন ১৯৭৯-তে। কান্ট বলছেন, এটাকেই বলবেন 'পারেরগন', পারেরগনে ভিতর-বাহির মিশে আছে। অথচ এটা ভিতর-বাহিরের যোগফল নয়, যেমন আমাদের কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়ি, যেখানে সিঁড়ির অর্ধেকটার দাম ধরা হয় ফ্ল্যাটের দামের মধ্যে যদিও সিঁড়িটা সাধারণের জন্যে খোলা—তেমন নয়। বা আধাআধিও নয়। আমরা এক সীমান্তে দাঁড়িয়ে, যা এক জলপ্রবাহ দিয়ে তৈরি—এমনই তো হামেশা হয়, নদী দিয়ে সীমানা আঁকা। সে নদী শীতে যা থাকে বর্ষায় তা থাকে না। নদীর পাড় সেখানে বদলায়। সীমান্তও বদলায়। কখনো-কখনো এমনও হতে পারে, হয়তো, নদীর পাড়টা যেন এত সঙ্কীর্ণ, যেন আছেই নদীটাকে পাড় জোগাতে। কখনো-কখনো হতে পারে, হয়ও, পাড়টাই যেন ফ্রেম, নদীর। অথচ আমরা তো জানি, নদী, সে যতই বাড়ুক আর যতই তাতে বান ডাকুক, সেটাই সীমান্ত, পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের, বা পশ্চিমবঙ্গ আর আসামের, বা পশ্চিমবঙ্গ আর বিহারের, বা পশ্চিমবঙ্গ আর ওড়িশার। কবিতায় হয়তো ভিতর-বাহির একটু বেশি স্পষ্ট, ফ্রেম আর ফ্রেমের ভিতর, ফ্রেমের বাহির ও ভিতর হয়তো একটু বেশি স্পষ্ট। হয়তো। কখনো-কখনো। আবার, হয়তো একটু বেশি অস্পষ্টও। সে-ও, হয়তো। সে-ও কখনো-কখনো। এখানে কবিতার কথাটা এনেছি গল্পের কথাটাই বলতে। গল্পে এই পারেরগন প্রায় সব সময়ই অস্থির, একটু বেশি করে অস্থির। এমন পারেরগনের কথা না ভেবে কোনো গল্প এগতে পারে না. এমনকী একজন গল্পকার গল্পের ভাবনায় যতটা স্থির হওয়ার পর, গল্প শুরু করতে পারেন, তার চাইতে অনেক আগে আরো বেশি স্থির হতে হয় তাঁকে পারেরগন নিয়ে।

অথবা, আমি হয়তো ভুলই বলছি। হয়তো গল্পটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পরই একমাত্র এই পারেরগন, ও এই বাহির ও এই ভিতর তৈরি হতে থাকে, বদলাতে থাকে। যা ভিতর তা একেবারে বাহির হয়ে যেতে পারে—এমন কথা হয়তো বাড়াবাড়ি, তবু বদলাতে তো থাকেই গল্পটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পরই।

অথবা, বদলের কথাটা যদি একটু ভুলে থাকা যায়, তাহলে গল্পটা যে তৈরি করছে, তার তো একটা আভাস তৈরিই থাকে—সেই পারেরগনের, সেই সীমান্তচিহ্নিত নদীর, সেই দরজার মতো ফাঁকের। নইলে আরব্যরজনীর প্রথম রাতটাই তো পোহাত না—শাহারজাদি গল্পের পারেরগনটাকে তাঁর ছকেই, হ্যাঁ, তাঁর ছকেই বদলে নেন, বেশ কয়েকরাতের পর তো, সুলতান ও আমাদের প্রত্যাশানুযায়ীই বদলে নেন, আরো কিছু রাতের পর তো, সকাল হতে না-হতেই সেই আপাত বিরতি আমাদের অভ্যাসেই এসে যায়। নইলে যে-গল্প একরাতও পোহাবার কথা নয়, সে-গল্প ৯৪-দিন কম তিন বছর ধরে চলতে পারে? আর যে-গল্প তিন বছর চলে, সে-গল্প শুরু-শেষের হিশেবের বাইরে চলে তো যাবেই।

সে গল্প শুরু করবে কী করে যে জানেই না গল্পটা শুরু হচ্ছে কেন, এত কিছু থাকতে এই গল্পটাই শুরু হচ্ছে কেন? তাকে তো কোনো এক রকম করে গভীর থেকে গভীরে জেনে রাখতে হবে যে আজকের রাত পোহালেই তার গলা কাটা যাবে। নিজের গলাটি বাঁচানো যদি তার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাকে একের পর এক কত অকল্পনীয়, বা শুধুই কল্পনীয়, ও কত বাস্তবহীন প্রতিসরণ ঘটিয়ে-ঘটিয়ে এক হাজার এক রাতের প্রথম রাতটিতে তার ধর্ষক সুলতানকে শোনাতে হয়েছিল, 'হে মহাত্মা খলিফা, আমার মনে আসছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরাট বড়লোক এক বণিকের কথা, সে একেবারে সবার সেরা বণিক, সে একেবারে বহু ধনসম্পদের মালিক, সে একবারে সব দেশ-দেশান্তরের সব কথা জানে', আর রাত শেষ হওয়ার আগেই বা মুহূর্তেই, ততক্ষণে গল্পের শ্রোতা হয়ে ওঠা সেই সুলতানকেই শোনাতে হয়েছিল গল্পের এক শেষ, যা শুধু পরের গল্পটির পারেরগন। নিজের যে-ছেলে বাছুর হয়ে গেছে তাকে কোরবানি দিতে গেলে সে কেমন ছুটে এসে চোখের জল ফেলে পায়ে লুটিয়ে পড়ে গা চাটতে থাকে আর তার কোরবানি আটকে যায়। অথচ গল্প শেষ হয় না, পরের গল্পে মিলে যায়। শাহারজাদিকে যোগ কতে হয়, সে তার বোনকে বলে, 'এ আর কী গল্প! যদি সুলতান আজ কোতল না করতেন তাহলে তোদের আজ রাতে যে-একটা গল্প বলতাম-না!' তাতেই সুলতান শাহরিয়ার নিজের মনে-মনে ঠিক করে ফেলেন, 'গল্পের শেষ না শুনে এই মেয়েটিকে কোতল করছি না!' রাতের প্রথমে যে-সুলতান ছিলেন ধর্ষক, তারই সঙ্গে শুরু হয়ে যায় গভীর মৈথুন। শাহারজাদি সুলতানকে গল্প শোনানো শুরু করার আগেই তো কত গল্প শুরু হয়ে গেছে—শাহ্জামানের বলা, উজিরের বলা, গল্পও বলা, ঘটনাও বলা। যেন শুরুর আর শেষ নেই। বা, কোনো সময়ে নৈমিষারণ্যে শৌনক ঋষির বার-বছরে একবার এমন একটা কিছু যাগযজ্ঞে উগ্রশ্রবা হাজির ছিলেন। উগ্রশ্রবা বৃত্তিগতভাবে সূত অর্থাৎ গল্প বলে বেড়ান। বংশানুক্রমেও। তাঁর বাবা লোমহর্ষণও সূত ছিলেন। উগ্রশ্রবা বললেন যে তিনি সামন্তপঞ্চক বলে এক জায়গায় গিয়েছিলেন, যেখানে এককালে পাণ্ডব-কৌরব ও অন্যান্য-সব জাতির ও বংশের মানুষজন থাকত। এই যাতায়াতে তিনি একেবারে গোটা একটা মহাভারত শুনে-শুনে জেনে এসেছেন। এই মহাভারতই জনমেজয়ের যজ্ঞে বৈশম্পায়নমুনি জনমেজয়কে ও আরো সবাইকে শুনিয়েছিলেন। ব্যাসই শোনাতেন, রাজা জনমেজয় তাঁকেই অনুরোধ করেছিলেন। তাই ব্যাসই বললেন, বৈশম্পায়নই বলুক, ও সবটা জানে। জানে বটে কিন্তু দেখে নি তো? দেখেছেন একমাত্র ব্যাস। ব্যাসই সাক্ষী। একমাত্র সাক্ষী। তাই ব্যাস-অনুমোদিত না হলে কোনো মহাভারতই মহাভারত হবে না। মহাভারতের গল্প শুরু হওয়ার আগে তার গল্পের গল্প। আদিপর্বের প্রথম পাঁচ পর্বাধ্যায় জুড়ে শুধু গল্পটা কী করে আসছে, জন্ম-জন্মান্তর ধরে আসছে, তার বিবরণ। তারও পর শুধু এই গল্পটিকে ধারণ করে আছে যে-সব মানুষ তাঁদের বিবরণ—তাঁরা কী করে এই গল্পটি পাচ্ছেন ও ধারণ করে রাখছেন ও সকলেই ধরে রাখছেন সেই মূল গল্পটি, যা ব্যাস সব দেখে বলেছিলেন আর দেবতা-গণেশ ব্যাসের মুখে শুনতে-শুনতে লিখেছিলেন। একই সঙ্গে মহাভারতের গল্পের এই গল্প একদিকে নেমে আসছে পরবর্তী কালের দিকে, বলা যায় আমাদের সময়ের দিকে, আবার তা বিপরীত উজানগতিতে চলে যাচ্ছে সেই সময়ে যখন এই সব গল্পের শুরু, মহাভারত-এর আগের মহাভারত। এক বিচিত্র পাকদণ্ডিময় আরোহণ-অবরোহণের ভিতর শৌনক উগ্রশ্রবাকে বলছেন ব্যাসকথিত বৃত্তান্ত সবিস্তার বলতে, আবার ব্যাস সেই গল্প বলতে বৈশম্পায়নকে বলছেন, আবার জনমেজয় ব্যাসকে প্রশ্ন করছেন (আদিপর্ব, আদিবংশাবতরণ পর্ব, ৫৯ অধ্যায়)। অথচ তার ভিতর ঘটনাক্রম অব্যাহত থাকছে। এখন তো এটা সকলেই মেনে নিয়েছেন, বা বলা যায়, এ নিয়ে আর তর্ক নেই যে মহাভারত অনেক বছর বা শতাব্দ বা সহস্রাব্দ জুড়ে তৈরি হয়েছে। এখনো হয়ে চলেছে। এমনকী এই মহাভারত তাঁরাও রচনা করেছেন, করছেন, যাঁরা মহাভারত-এর প্রচলিত গল্প সবটা জানেন না। বা, মহাভারত বলে অখণ্ড কোনো সমগ্রতাই নেই। তাহলেও কী করে গল্পের এই আকারটা সবাই রক্ষা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে পারেন যে তিনি বা তাঁরা জানেন, গভীর থেকে গভীরে জানেন, যে-গল্পটা বলা হচ্ছে সেটা কেন বলা হচ্ছে, কাকে বলা হচ্ছে। সেই জানার ফলেই, গভীর ও নিশ্চিত জানার ফলেই, নিশ্চিত ও স্থির জানার ফলেই, যে-গল্প যেখানে প্রোথিত হওয়ার সেখানেই প্রোথিত হচ্ছে বা যেখান থেকে উদ্গত হওয়ার সেখান থেকেই উদ্গত হচ্ছে।

দুই

এতক্ষণ ধরে এই কথাটিতেই আমরা পৌঁছুতে চাইছিলাম যে তত্ত্ব ছাড়া গল্প হয় না, গল্প দানাই বাঁধে না বা পারেরগনের অনিশ্চয়তাতেই গল্পের ভিতর প্রাণের সাড়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা এই কথাটিতে পৌঁছুতে চাইছিলাম তত্ত্বের উল্টো দিক থেকে। যুক্তিবিজ্ঞানের একটার পর একটা প্রতিজ্ঞাবাক্য দিয়ে সিদ্ধান্ত তৈরি হোক—এটা আমরা চাইছিলামই না। অথচ আমরা এও চাইছিলাম, কথাটা একটা আকার পাক। এমন এক বিপরীত ইচ্ছে ও কাজের পক্ষে ক্ল্যাসিক থেকে প্রমাণ বা নিদর্শন দেয়াই নিরাপদ, কারণ ক্ল্যাসিকের ওপর জমে উঠেছে হাজার-হাজার বা শ-শ বছরের আস্তর। আমাদের সুবিধেমতো একটা আস্তরকেই আমরা সাক্ষ্য করে তুলতে পারি।

তাতে হয়তো প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখা চলে, কিন্তু তাতে গল্প-উপন্যাস লেখার শঙ্কা কাটে না। অথচ তত্ত্ব ছাড়া যে-গল্প-উপন্যাস হয় না, এমন একটা কথার তো কোনো মূল্যই নেই যদি সে-কথার ভিত হয় সমাজবিজ্ঞানের কোনো জিজ্ঞাসা বা নন্দনতত্ত্বের কোনো প্রশ্ন বা অন্বয়ের (হেরমেনিউটিকস) কোনো চেষ্টা। সেইসব জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন বা চেষ্টার নিশ্চয়ই যথেষ্ট মূল্য ও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেইসব মূল্য ও প্রয়োজন, সৃষ্টির বাইরে, শিল্পসৃষ্টির বাইরে, অন্যত্র কোথাও সক্রিয়। অন্য শব্দের অভাবে, যে 'তত্ত্ব' কথাটি দিয়ে গল্পকারের সঙ্কটকে চিনে নিতে চাইছি, বা 'তত্ত্ব' কথাটির যে অর্থটাকেই বদলে দিতে চাইছি গল্পকারের বাচন তৈরি হয়ে ওঠার উৎসের কাছাকাছি কিছু বোঝাতে, সেই তত্ত্ব তো কোনো ইডিয়োলজি নয়। গল্প লেখার জন্য ইডিয়োলজি অনিবার্য নয়। বরং কখনো কখনো দুর্বহ ভার। সেই তত্ত্ব তো কোনো ওয়েলটাংসুঙ-ও নয়, এমনকী গল্পকারের জানা নেই এমন কোনো ওয়েলটাংসুঙ-ও নয়। সচেতন ওয়েলটাংসুঙ গল্পলেখার পক্ষে এক এমন আরম্ভ রেখা যা বেশির ভাগ সময়েই আগে থাকতে দাগিয়ে রাখা, যেমন দৌড়ের সময় ট্র্যাকের মাথায় শাদা রঙে দাগানো থাকে, বা অনেক সময় লেখকের নিজের দাগানো, যেমন ক্রিকেট খেলায় বোলাররা উইকেট থেকে পা মেপে-মেপে নিজের দৌড়বার জায়গাটি জুতোর গোড়ালি দিয়ে খুবলে নেয়। আমরা 'তত্ত্ব' বলতে গল্পকারের এমন এক জ্ঞান-কল্পনা-ধারণার কাছাকাছি যেতে চাইছি যেখানে শাদা কাগজে কালির প্রথম অক্ষরটি লেখা হওয়ার আগে গল্পকার অনেক কথাবার্তা শুনতে পান সেই গল্পের ভিতর থেকে, অগঠিত ভিতর থেকে, অপরিকল্পিত ভিতর থেকে অথচ সেই তত্ত্বই, সেই জ্ঞান-কল্পনা-ধারণাই, সেই তত্ত্বই কুমোরের ঘূর্ণ্যমান চাকায় মাটির তালের ওপর আঙুলের চাপ বদলে-বদলে দেয়, আঙুলগুলোর সম্পর্ক বদলে বদলে দেয়, আর সেই আকারটি গড়ে ওঠে। আমরা বুঝতে পারছি, এমন সব ঘটনার বা অভ্যেসের উপমা দিয়ে দিয়ে গল্পকারের 'তত্ত্ব' সংক্রান্ত সক্রিয়তার পদ্ধতি খুব স্বচ্ছ হচ্ছেনা, স্তরান্তরিত যুক্তিতে সাজানো যাচ্ছেনা। গল্পকারের এই তাত্ত্বিক সক্রিয়তা স্বচ্ছ কোনো আচরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, তার কোনো স্তরভাগও নেই। বরং সেটা অনচ্ছ ও নেবুলার মতই আকারহীন। আকারহীন অথচ যেন কঠিন, এমন একটা আভাসও আসে। এমন একটা বাস্তব ছাড়া গল্পকার তার গল্প দেখতে পারেন না, শুনতে পারেন না, ভাবতে পারেন না। এই বাস্তবই গল্পকারের তত্ত্বকল্পনা। আধার বলতে আধেয়র সঙ্গে যে-পার্থক্য মনে আসে—এ আধারে বা বাস্তবে সে-পার্থক্য থাকে না। গল্পের আগে এই বাস্তব কঠিনের মত হয়ে ওঠে।

পাছে কেউ ভেবে বসেন আমরা হয়তো শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়ার জটিল সমগ্রকে একটু আধটু ছেকে নিয়ে গল্পকারের আখ্যান-তত্ত্ব বা আখ্যান-চিন্তা বা আখ্যান কল্পনার একটা স্তর চিনে নিতে চাই, তাই বলে রাখা ভাল, আমরা তেমন কোনো তত্ত্বের কথা ভাবছি না যে-তত্ত্ব পাখি জানে না কিন্তু যে-তত্ত্ব ছাড়া পক্ষিতত্ত্ববিদ তত্ত্ববিদ হয়ে ওঠেন না। আমরা সেই তত্ত্বের কথা বলছি যে-তত্ত্ব ছাড়া পাখি তার বাসা থেকে প্রথম উড়ানে পাখা মেলতে পারে না। সে-তত্ত্ব ছাড়া নৃতত্ত্ব না জেনেও মানবশিশু দু পায়ের ওপর টলমল দাঁড়াতে পারে না। শিল্পের, সুতরাং গল্প লেখারও, এক মায়াজাল আছে, সে মায়াজাল ছাড়ানো যায় না। অথচ সে মায়াজাল পর্যন্তই যদি না পাওয়া যায়, ছাড়ানো না-হয় নাই গেল, তাহলে কী হবে গল্প-উপন্যাস-কবিতা পড়ে, নাটক-নাচ-ভাস্কর্য-ছবি দেখে, গান শুনে?

আমরা জেনেশুনেই এমন অস্পষ্ট একটা কথার ভিতর দিয়ে এতদূর এলাম, জেনেবুঝেই এলাম। কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে তা ভাবিনি। বরং ভেবেছি অর্থের চাপে কথাটার অস্পষ্টতা যেন ভেঙে না যায়, কথাটার আড় যেন কেটে না যায়, রোঁয়া যেন ঝরে না পড়ে। আমরা হেরমেনেউটিকসের, অন্বয়ের, প্রায় উলটো দিকে হাঁটছি। কিন্তু এমন অস্পষ্টতা, আর অর্থের চাপ থেকে ভেসে ওঠার এই মুক্তিও, তো আমাদের বেঁধে ফেলতে পারে এক উল্টো পাকে, তাই আমরা এখন স্পষ্ট করেই বুঝতে চাই যে আধুনিক সময়ের একজন গল্পকার-ঔপন্যাসিক, গল্প-উপন্যাস বলতে কী ভেবে নিয়েছিলেন তা জানা যাবে কী করে। তিনি তো তার তত্ত্বের ইস্তেহার লিখে গল্পতে হাত দেন না। আর এ-'তত্ত্ব' তো সে 'তত্ত্ব' নয় যা দিয়ে ইস্তেহার লেখা যায়।

তিন

আমার মনে হয়েছে গল্প-উপন্যাস যিনি লিখছেন তাঁর তত্ত্বে, অর্থাৎ গল্প-উপন্যাস বলতে তিনি কী ভাবছেন সেখানে, পৌঁছতে না পারলে তাকে পড়া হয়ে উঠবে না, তার একটি গল্পও না, তার সব লেখা মিলিয়ে যে-সমগ্র তাও নয়, একথা যেমন সত্যি, তেমনি একই সঙ্গে আরেকটি কথাও একই রকম সত্য—এই তত্ত্বে পৌঁছবার কোনো পদ্ধতি নেই। এমন মনে হওয়াটা যে আমারই, এটা আবার উল্টে যে কোনো তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত নয় তা স্পষ্ট করে রাখতেই এই পরিচ্ছেদে বাক্যটি এমন বেখাপ্পা 'আমার মনে হয়েছে' দিয়ে শুরু হল। বাক্যটি সংশোধনাতীত খারাপ, পাঠক ক্ষমা করবেন।

গল্পলেখকের তত্ত্বে পৌঁছনোর কোনো বাঁধা সড়ক নেই বলেই গল্প-উপন্যাসে নানা তত্ত্ব খোঁজা হয়—সমাজ, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও শিল্পের নানা তত্ত্ব। আবার একই কারণে পাঠক জানতে চায় একটা গল্প বা উপন্যাস লেখার গল্প, কাহিনীর কোনো বাস্তব সংকেত, গল্পে যা লেখা হয়নি তেমন কোনো তথ্য। পাঠক পড়তে চায়—লেখকের ডায়রি, স্মৃতিকথা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিঠিপত্র। দেখতে চায় শাহিবাগের প্রাসাদ-অলিন্দে রবীন্দ্রনাথের ছবি বা বিভূতিভূষণের আকস্মিক দুর্গা-আবিষ্কারের ঘটনা জানতে চায়।

এখানে একটা ছোটো ভাগ করে রাখতে চাই। একটা কথা সহজ ঠেকতে পারে—গল্প-উপন্যাসগুলো পড়লেই সেই কথাটা সবচেয়ে স্পষ্ট হবে যে, লেখক গল্প-উপন্যাস বলতে কী ভাবছিলেন। গল্প-উপন্যাসগুলো পড়া থেকে যে সমগ্রের বোধ তৈরি হয় তা গল্প-উপন্যাসেরই সমগ্রতা। সে-সমগ্রতা লেখকের আখ্যান-তত্ত্ব নয়। লেখাগুলো মিলিয়ে যে-তত্ত্বদেশ গড়ে ওঠে আর যে-তত্ত্বদেশ থেকে উপন্যাসন ঘটেছিল, লেখাগুলো বেরিয়ে আসছিল, তা এক নয়। আমরা বোধহয় একটা স্থানাঙ্কহীন স্থান খুঁজছি—উপন্যাসনের সক্রিয়তা কোথা থেকে ঘটছে। গল্প-উপন্যাসগুলো লেখা ও পড়া হয়ে যাওয়ার পর তো সক্রিয়তার মেরুবদল ঘটে গেল। তাই গল্প-উপন্যাসের পঠন অভিজ্ঞতা থেকে উপন্যাসনের তত্ত্বদেশের আভাস তৈরি করা যাবে না।

কখনো কখনো একটু-আধটু হয়তো যায়—লেখকের খুব খারাপ লেখা থেকে। সেখানে লেখকের অনন্যনির্ভর তাঁর সেই তত্ত্বদেশ, যা এমনকী গল্প-উপন্যাসের কঙ্কালও নয়। সেই সব লেখায় হঠাৎ-হঠাৎ খুলে যায় ঊষর সেই তত্ত্ব যার গর্ভাধান ঘটেনি। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সে তলস্তয় তাঁর ডায়রিতে একদিন লিখেছিলেন—'অদ্ভুত ব্যাপার! খুব খারাপ বই পড়লে আমি আমার নিজের দোষগুলো বুঝতে পারি। ভাল বইয়ে পারিনা। ভাল বই পড়লে আমি বিষাদে ডুবে যাই' (১ এপ্রিল, ১৮৫২)।

আর হয়তো যায় খানিকটা, অন্য কোনো লেখকের লেখা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া থেকে। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস বলতে কী এক তত্ত্বদেশ তৈরি করেছিলেন, তা হয়তো ভেবে নেওয়া যায় তাঁর রাজসিংহ লেখাটি, জগদীশ চন্দ্র গুপ্তর 'লঘুগুরু নিয়ে তার পত্রনিবন্ধ, আনা কারেনিনা নিয়ে মন্তব্য ও কোনো-কোনো নাম না করা বিদেশী লেখকের লেখা সম্পর্কে চিঠি—এগুলো মিলিয়ে।

আরো হয়তো একটা আন্দাজ পাওয়া যায়—একজন লেখকের অনুকরণে আর-এক লেখকের লেখা থেকে। যা অনুকরণ করা গেল না মূল লেখকের সেই মৌলিকতা তখন চিনে ফেলা যায়।

ভয় হচ্ছে—গল্পকারের প্রাক্-উপন্যাসন তত্ত্বদেশে পৌঁছুবার কোনো একটি পদ্ধতি নেই বলতে গিয়ে এমন একটা আন্দাজ আবার তৈরি করে তুলছি না তো যে একটি না হলেও বহু পদ্ধতি আছে? আমি আসলে বলতে চাইছি কোনো পদ্ধতিই নেই। যিনি লেখকের সেই তত্ত্বদেশে পৌঁছতে চান তাঁকে তাঁর পদ্ধতি তৈরি করে নিতে হয়। প্রত্যেকবার। এবং প্রত্যেককে। আর সে পদ্ধতি যে অন্যের পক্ষে ব্যবহার্য তাও নয়।

রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস নিয়েই কথাটি হয়তো একটু স্পষ্ট করা যায়। রবীন্দ্রনাথ আখ্যানের এক তত্ত্বদেশ তৈরি করে তুলেছিলেন ১৮৯২-এ 'গল্পগুচ্ছ'-তে। সে তত্ত্বদেশে একটি গোপন উপাদান হয়তো ছিল বঙ্কিমচন্দ্রকে গ্রহণবর্জনের প্রতিক্রিয়া। তাঁর এক নিষ্পত্তি গল্পগুলোতে প্রমাণিত থাকল। আবার তার যে নিষ্পত্তি ঘটলও না, এই সময়ের উপন্যাসগুলোতে তাও প্রমাণিত থাকল। আবার ১৯০৮ থেকে ১৬-তে 'গোরা' 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে প্রমাণিত হয়ে উঠল তাঁর আখ্যানের তত্ত্বদেশের স্বায়ত্ত-স্বাতন্ত্র্য। পৃথিবীতে যে-উপন্যাস লেখা হয়ে গেছে, ফর্মের সেই ইতিহাসে গোরা-চতুরঙ্গ-ঘরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরের সমতুল্যতা নেই। আধুনিক যে-উপন্যাসে আত্মতার বাহিরকে উপন্যস্ত করতে চাইছিলেন টমাস মান ১৯২৮-এ 'ম্যাজিক মাউন্টেন' থেকে, রবীন্দ্রনাথ তা সম্পন্ন করে রেখেছিলেন ঐ তিনটি উপন্যাসে। রাবীন্দ্রিক আখ্যানের সেই তত্ত্বদেশ কি ১৮৯২-এই তৈরি হয়েছিল? নাকী তাঁর ঐ সময়ের গল্পগুলো যে-তত্ত্বদেশ থেকে গড়ে উঠেছিল, ১৯০৮-১৬-র উপন্যাসের তত্ত্বদেশ তা থেকে পৃথক? ১৮৯২-এর তত্ত্বদেশ ক্রমপরিণত হচ্ছিল ১৯০৮-এ? তা হতে পারেনা, কারণ ক্রমপরিণতি ঘটতে পারে ফর্মের, আকারের, তত্ত্বদেশের নয়। চিত্রা-খেয়া-গীত নামাঙ্কিত কাব্য তিনটি ছাড়াও আত্মশক্তি-রাজাপ্রজা-স্বদেশী সমাজ ছাড়া গোরা-চতুরঙ্গ-ঘরে বাইরে-র তত্ত্বদেশে যে পৌঁছতে পারি না, সে কি আমার নেহাতই ব্যক্তিগত এক পাকদণ্ডী? সে যাই হোক, এমন তো হতে পারে—কবিতার অনন্যনির্ভরতা, গানের সার্বভৌমত্ব ও সমাজচিন্তার আত্মশক্তিমান স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে তুলল উপন্যাসের এক নতুন তত্ত্বদেশ? তাতে এমন কোনো সমীকরণ তৈরি হয় না, যেন উপন্যাসগুলোই হয়ে উঠল এক গুণিতক বা যোগফল। এমন কোনো অসমীকরণও কি তৈরি হওয়া সম্ভব যে কবিতা, গান, নিবন্ধ, উপন্যাস, পরস্পরের পরিপূরকতা ঘটাচ্ছিল? তাহলে তো মেনে নিতে হয় এগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলনা। একই তত্ত্বদেশ থেকে নানা ফর্ম জেগে উঠছিল? কল্পনা-মননের সে জটিলতা ও এক-একটি ফর্মের একতা যেন একটু সরল হয়ে যায় তেমন ভেবে নিলে।

চার

আমরা এই পরিচ্ছেদে চেষ্টা করব বঙ্কিমচন্দ্র কেন 'গল্প-উপন্যাস' কথাটির বদলে বারবার 'আখ্যান' শব্দটির ওপর ভর দিতেন, 'আখ্যান'-শব্দটি নিয়ে তিনি কী ভাবতে চাইতেন সেটি বোঝার। এখানে এমন একটা বিষয় আসবে 'গল্প-উপন্যাস' বললে যার আয়তন ছোট হয়ে যেতে পারে, আবার 'মহাকাব্য' বা 'পুরাণ' বললে যার আয়তন আমাদের বলবার কথার বাইরে চলে যেতে পারে।

১৮৮৪ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত আট বছর ধরে বঙ্কিমচন্দ্র পুরাণ, মহাভারত ও বৈদিক সাহিত্য থেকে ভারতীয় হিন্দুদের দেবকল্পনা ও দেববর্ণনার আখ্যান নতুন করে পড়ছিলেন ও পাঠকদের জন্য লিখছিলেন। একটা তালিকা তৈরি করলে এরকম দাঁড়ায়—'কৃষ্ণচরিত্র,' 'ধর্ম্মতত্ত্ব,' 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা,' 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম'—এগুলির মধ্যে প্রথম ও শেষ বইদুটিতে পৌরাণিক আখ্যান নতুন করে বলা আছে, একটা কোনো আনুমানিক অক্ষের সঙ্গে সেই নতুন করে পড়ার মিল ঘটানোর চেষ্টা আছে, এই প্রক্রিয়ায় অনেক আখ্যান বর্জনও করা হয়েছে। এই বইদুটিতেই পৌরাণিক আখ্যানের গ্রহণবর্জনের ও আখ্যানের একটা অক্ষের, নিরিখ তৈরি হয়ে উঠেছে। বাকি দুটো বইয়ে, 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'-য় পৌরাণিক কোনো তত্ত্বের গ্রহণ বর্জন আছে, নতুন একটি তত্ত্বের অক্ষ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে কোনো আখ্যান কাজ করছে না। বঙ্কিমচন্দ্র আখ্যান বলতে কী ভাবতেন তার একটা আভাস মাত্র আন্দাজ করা যায় 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম' থেকে। বাকি দুটো বইয়ে আখ্যানের তত্ত্বদেশের কোনো আভাস বঙ্কিমচন্দ্র দেননি।

'কৃষ্ণচরিত্র' এবং 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম' বইদুটোতে বঙ্কিমচন্দ্র ভাঙছিলেন লোকশ্রুতি, দেশী ভাষায় প্রচল নানা পৌরাণিক কাহিনী, বিদেশীদের প্রাচ্যবাদ থেকে গড়ে তোলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'প্রামাণিক' কাহিনী, ও তৈরি করে তুলতে চাইছিলেন আখ্যানের সম্ভাবনা, সঙ্গতি, কল্পনা। এ কাজ এক প্রধান উপন্যাসিকের হাতে পুরাণের পুনর্নির্মাণ। তেমন পুনর্নির্মাণ সম্ভবই নয়—আখ্যান সম্পর্কে তাঁর স্বকীয় অর্থবোধ, ঔচিত্যবোধ ও সংগঠনবোধ ছাড়া। এ এক আখ্যান নির্মাণেরই কাজ, এক মৌলিক আখ্যান নির্মাণের কাজ। পুরাণ ও লোকশ্রুতি থেকে নতুন আখ্যান নির্মাণ তো বারবার ঘটেছে। বিশেষ করে সভ্যতার কোনো সংকটে বা সময়ের কোনো জোড় খুলে যাওয়ার মত কোনো বিপন্নতায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ফ্যাসিস্তরা যখন ইয়োরোপ ও উত্তর আফ্রিকার সব দেশ দখল করে নিচ্ছে আর দেশোদ্ধার হয়ে উঠছে এক নৈতিক ব্রত তখন অরিস্টিসের উপাখ্যান কত ভাবেই না ফিরে এল। আবার 'ককেসিয়ান চক সার্কেল' বা 'মাদার কারেজ'-এর মত লোকশ্রুতিরও প্রত্যাবর্তন ঘটল। এর একটা সহজ কারণ হয়তো এই যে পুরাণ ও লোকশ্রুতির বহু ইঙ্গিত তৈরির কৌণিকতা ও বহু ইঙ্গিত ধরে রাখার ক্ষমতা, দীর্ঘ সময় ধরে প্রমাণিত।

প্রায় কুড়ি বছর ধরে উপন্যাস লেখার পর বঙ্কিমচন্দ্র কি তেমনই এক সময়-সংক্রান্তিতে গিয়ে ঠেকলেন ১৮৮৪তেই? জন্মাধিকারে যে-সভ্যতার তিনি অন্তর্গত তাই কি তিনি ছকে নিতে চাইছিলেন? যে-সভ্যতার অন্তর্গত করে নিতে চেয়েছিলেন তিনি নিজেকে, তাও কি ছকে নিতে চাইছিলেন? উপন্যাসই যার ফর্ম, তিনি উপন্যাস ছাড়া অন্য কোন্ ফর্মে সেই সংকটের স্বরূপ বুঝে নেয়ার চেষ্টা করবেন? যে ফর্মেই করুন-না-কেন তা তো আখ্যানই হয়ে উঠবে। ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৩—জীবনের এই শেষ দশ বছরে বঙ্কিমচন্দ্র লিখছেন 'আনন্দমঠ,' 'দেবী চৌধুরাণী,' 'সীতারাম'। এগুলো 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম'-এর লেখাগুলির ও 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর সঙ্গেই লেখা হচ্ছিল। আবার, একই সঙ্গে লেখা হচ্ছিল 'মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত', 'কমলাকান্তের দপ্তর,' বড় ইন্দিরা। তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র,' 'ধর্মতত্ত্ব'কে তাত্ত্বিক প্রতিপাদন ধরে নিয়ে তাঁর উপন্যাসগুলিকে, ঐ আপাত প্রধান উপন্যাস তিনটিকে, ঐ একই তত্ত্বের ঔপন্যাসিক প্রতিপাদন বলে পড়ে আসা হচ্ছে—বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তেমন কথা স্পষ্ট করে বলেছেন। ঐ রকম করে যদি ১৮৮৪-১৮৯৩ পর্যন্ত লেখাগুলোকে একটা নকশায় বেঁধে ফেলা যায়, যেমন বেঁধে ফেলা হয়ে থাকে, তাহলে 'মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত,' 'কমলাকান্তের দপ্তর,' বড় ইন্দিরা ও বড় রাজসিংহ সেই নকশার বাইরে থেকে যায়। তাছাড়াও তেমন একটি নকশায় বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক কল্পনার অখণ্ড সমগ্রতাকে তাঁর দার্শনিক, তাত্ত্বিক কল্পনার অধস্তন ধরে নেয়া হয়। তেমন-যে কোনো সময় কোনো লেখকের বেলায় ঘটতে পারে না, তা নয়, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ দশ বছরের লেখাগুলিকে ঐ নকশায় বুঝে নেওয়ার গভীরে আমাদের হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রয়োজনবোধ যতটা সক্রিয় ছিল, আমাদের উপন্যাস-শিল্পবোধ থেকে সে জিজ্ঞাসা ততটা আলোড়িত ছিল না।

আমরা এই প্রচলিত নকশাটা উলটে দিতে চাইছি।

এই দশ বছরে বঙ্কিমচন্দ্র এক-একবার পুরাণ পুনর্নির্মাণের চেষ্টায় আখ্যান তৈরি করে তুলছেন—'কৃষ্ণচরিত্র,' দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম, 'আনন্দমঠ,' 'দেবী চৌধুরাণী,' 'সীতারাম,' আর এক-একবার লোকশ্রুত আখ্যান পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করছেন—'মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত,' 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও বড় ইন্দিরা। আমাদের এই নকশা থেকে অনেকগুলো প্রশ্নই উঠতে পারে। 'মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর'কে কেন আমরা আখ্যান বলে গ্রহণ করব আর বড় ইন্দিরার সঙ্গে মিলিয়ে এই লেখাগুলিকে লোকশ্রুতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেই-বা কেন পড়া হবে। আমাদের এই নকশায় 'ধর্ম্মতত্ত্ব' আর বড় রাজসিংহ কোথায়। এসব তত্ত্বের উত্তর যে আমাদের জানা আর তা জেনেটেনে ফেলার পরই যে নকশাটা তৈরি হয়ে উঠেছে—এমন কোনো সিদ্ধান্তমুখিতার আভাসও আমরা রাখতে চাইনা। এমন হতেই পারে—এই প্রশ্নগুলির ও আরো এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ভিতর দিয়েই আরো অনেক নতুন প্রশ্ন তৈরি হতে থাকবে। আমরা যে এমন একটা নকশার কথা বলছি, তার একটা প্রধান কারণ, তাঁর প্রধান ফর্মটিকে, গল্প-উপন্যাস লেখা, পাশ কাটিয়ে তাঁর আপাত অনাখ্যান রচনাগুলিকে—সে 'বঙ্গদেশের কৃষক'-ই হোক আর 'ধর্মতত্ত্ব'-ই হোক—তাত্ত্বিক লেখা হিশেবে পড়ার সুবিধে যেমন হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা তৈরি করেছিলেন, এখনো করছেন, তেমনই ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তানিরপেক্ষ আধুনিক পোস্টমডার্ন ও পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট সমাজবিজ্ঞানীরাও করছেন। আবার এই লেখাটিতে আমরা এখন শুধু এইটুকুই খুঁজতে চাই—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম' আর 'কৃষ্ণচরিত্র' বই দুটিতে পুরাণ-আখ্যানকে যে-ভাবে গ্রহণবর্জন করেছেন, যে-রকম তাঁর পাঠকদের জন্যে বলেছেন, আখ্যানের কোনো-কোনো টুকরোর ওপর যে-জোর দিয়েছেন ও বিভিন্ন টুকরোকে যে-'সংকেতে গ্রথিত করেছেন' সেসব থেকে তাঁর কোনো আখ্যানতত্ত্বের আভাস কি পাওয়া যায়? 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম' বইটিতে—বঙ্কিমচন্দ্রের আলগা এই লেখাগুলি নিয়ে সংকলনটি বেরিয়েছিল ১৯৩৮-এ—বা 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ বঙ্কিমচন্দ্র পুরাণ-মহাকাব্যকে বিনির্মাণ করেন নি যদিও তাঁর পদ্ধতি ও উদ্দিষ্টকে একটু সরলভাবে তেমন মনে করে নেওয়ার লোভ হয় প্রায় দুর্নিবার। আমরাও এই লেখাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাদুটিকে বিনির্মাণ করব না, যদিও আদিপাঠের বঙ্কিমচন্দ্রকৃত বিনির্মাণকে আবার বিনির্মাণ করার নাটকীয় তাত্ত্বিকতার টান প্রায় অপ্রতিরোধ্য। ডিকনস্ট্রাকসন-এর বিরুদ্ধে আমাদের যে কোনো সংস্কার আছে, তা নয়। এখানে ঐ পদ্ধতি ব্যবহারের সবচেয়ে বড় বাধা—'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম' বইটির আকার বঙ্কিমচন্দ্র স্থির করেন নি। তিনি ঐ বইয়ের রচনাগুলির প্রণেতা অথচ বইটি সম্পাদকদের তৈরি। তাহলে ঐ বইটিকে একটি অখণ্ড পরিকল্পিত বই বলে বিনির্মাণের জন্য মেনে নেওয়াটা ঠিক নয়। 'কৃষ্ণচরিত্র' বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পিত ও পুনর্মার্জিত গ্রন্থ। সেই গ্রন্থের ঘোষিত ও প্রকাশ্য লক্ষ আমাদের আখ্যান-খোঁজার লক্ষের সঙ্গে মিলবে না। আমরা তো এই গ্রন্থের ভাঁজগুলোর পাশ দিয়ে যাব, আস্তরগুলোর ভিতরটা একটু দেখতে চাইব, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে নিজের বানানো সড়ক ছেড়ে যে পাকদণ্ডীতে ঘুরছেন সেটা একটু খুঁজব। 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর বেলায় আমরাই বিনির্মাণের দিকে যেতে চাইছি না। পারেরগন শব্দটি দিয়ে কান্ট যে বহতা জলধারার মত পরিবর্তমান এক সীমান্ত ও প্রদেশের কথা ভেবেছিলেন, তেমন সীমান্ত আমাদের অনবরত পেরতে হবে, ভাঙতে হবে ও অপ্রস্তুত দেখতে হবে যে আমরা নিজেরাই বুঝতে পারছি না, সীমান্ত আমাদের সম্মুখে না পেছনে।

পাঁচ

যে-আখ্যান আমরা পড়তে চাইছি, এই বই দুটিতে বারবার বঙ্কিমচন্দ্র সেই আখ্যানবোধকেই আঘাত করছেন, ভাঙতে চাইছেন। তাঁর সেই আঘাতের ভিতর কোনো আড়াল নেই।

'ইন্দ্র বৃষ্টিকারী আকাশ, শুধু এই কথাটুকু লইয়া পুরাণেতিহাসের বিন্যাস সকল কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকারে রচিত হইয়াছে তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। উপন্যাসটা শুনিতে অতি কদর্য্য এবং এইরূপ উপন্যাসের জন্যই হিন্দুশাস্ত্র লক্ষ লক্ষ গালি খাইয়াছে। আর এই সকল উপন্যাসই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক অভক্তির কারণ হইয়াছে' (দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম)।

'কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকল অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি এবং উপন্যাসকার কৃত কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরমপবিত্র, অতিশয় মহৎ ইহাও জানিতে পারিয়াছি' (কৃষ্ণচরিত্র)। '...উপন্যাসটির রচনা এবং গঠন এখনকার বাঙ্গালার সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর উপন্যাসলেখকদিগের প্রণীত উপন্যাসের রচনা ও গঠন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট' (কৃষ্ণচরিত্র)।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই লেখাগুলি লিখছেন তখন তিনি বাংলা ভাষার প্রধানতম তো বটেই, প্রায় একমাত্র ঔপন্যাসিক। তাঁর প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ তখনো পর্যন্ত লেখা তাঁর ১৪টি ছোটবড় উপন্যাস। অথচ 'উপন্যাস' শব্দটিকে তিনি তাঁর শিল্পকৃতির সঙ্গে এক করে দেখেন নি—এমনকী তাঁর শেষ মৌলিক উপন্যাস সীতারাম-এও (১৮৮৭)। সীতারাম শেষ হচ্ছে রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদের কথাবার্তায়।

'শ্যাম। কত লোকেই কত রকম বলে! আবার কেউ কেউ বলে রাজারাণী নাকি ধরা পড়ে নাই—সেই দেবতা এসে তাদের বার করে নিয়ে গিয়েছেন। তারপরে নেড়ে বেটারা জাল রাজারাণী সাজিয়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে শূলে দিয়েছে।

'রাম। তুমিও যেমন! ওসব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাসমাত্র।

'শ্যাম। তা এটা উপন্যাস, না ওটা উপন্যাস, তার ঠিক কি? ওটা না হয় মুসলমানের রচা...'। (সীতারাম)।

উপন্যাস শব্দটির সঙ্গে লোকশ্রুতির বিকারের একটা সম্বন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের মনে স্থায়ী হয়েই ছিল। সেই বিকারকে তিনি কখনো-কখনো লেখকদের খারাপ-লেখা পর্যন্ত নিয়ে গেছেন। হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র খুব স্পষ্ট করে উপন্যাসের ফর্মের নতুনত্ব মানতেও চাইতেন না। হয়তো তিনি 'কাব্য' বলতে সাহিত্যের যে শ্রেষ্ঠ রচনা বোঝায় নিজের উপন্যাসগুলিকে তারই অন্তর্গত করে ভাবতে চাইতেন। '...স্কট-এর উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি', 'বঙ্গদর্শন'-এর এক বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি সূত্র তৈরি করতে চাইছিলেন। আবার, তত বিখ্যাত নয় এমন পুস্তক আলোচনায় 'বঙ্গদর্শন'-এ আরেকটু বিস্তারিত করছেন,

'গদ্যোপন্যাসকে সচরাচর আমরা কাব্যই বলিয়া থাকি। কাব্যের বিষয় মনুষ্যচরিত্র; মনুষ্যচরিত্র ঘোরতর বৈচিত্র্যবিশিষ্ট।... মনুষ্য পশুবৃত্ত, এবং মনুষ্য দেবতুল্য। ...এইরূপ দ্বিপ্রকৃতিত্ব সকল মনুষ্যেরই আছে ; মনুষ্যচরিত্রই দ্বিপ্রাকৃতিক; দুইটি বিসদৃশ ভাগে মনুষ্যহৃদয় বিভক্ত। কাব্যের বিষয় মনুষ্যচরিত্র ; যে-কাব্য সম্পূর্ণ, তাহাতে দুই ভাগই প্রতিবিম্বিত হইবে।'

'বঙ্গদর্শন'-এর নতুন বইয়ের সমালোচনা এমন একটি লেখায়—বঙ্কিমচন্দ্র লেখাটি তাঁর কোনো বইয়ে নেন নি—যে-সূত্র তিনি বলেছিলেন, দশ বছর পরে তাঁর প্রধানতম একটি লেখায় সেই সূত্র প্রায় অবিকল তিনি ব্যবহার করেন, এবার সূত্রটিকে একটু জটিল করে নিয়েছেন মাত্র, কারণ এখন তিনি কাব্য, ইতিহাস ও মানুষের ভিতরকার সম্বন্ধ নিয়ে বলছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মানবচরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান, ইতিহাসবেত্তাও মনুষ্যচরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্য্যহেতু ঐ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই—মহাভারতও হইতে পারে না' (কৃষ্ণচরিত্র)।

বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু কোনো পিচ্ছিল অর্থে বা অস্পষ্ট অর্থে এপিক, আখ্যান, উপন্যাস এই সব শব্দ ব্যবহার করছেন না। তিনি এগুলোকে পরিভাষাই করে তুলছেন যেন। '...স্বদেশে এপিক কাব্য ভিন্ন রচিত আখ্যানগ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতরা মহাভারত ও রামায়ণের সন্ধান পাইয়াই ঐ দুই গ্রন্থ এপিক কাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন' (কৃষ্ণচরিত্র)।

বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখছিলেন তাকে তিনি 'উপন্যাস' বলে স্বীকার করছিলেন আবার তাকে তিনি সব সময়ই বৃহত্তর একটা শ্রেণীর অন্তর্গত করে ভাবতে চাইছিলেন। 'বঙ্গদর্শন'-এ তাঁর গীতিকাব্য নিয়ে বিখ্যাত লেখাটিতে তিনি সাহিত্যের তিনটি শ্রেণীকে যথেষ্ট মনে করেছিলেন,

'দ্বিতীয় আখ্যান কাব্য অথবা মহাকাব্য রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র, শিশুপালবধের ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত ; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্যকাব্য ইহার অন্তর্গত, এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত।'

বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে কি তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সাহিত্যের যে-রূপ সৃষ্টির জন্যে তিনি সমকালীন ইতিহাসেই স্মরণীয় হয়ে উঠেছেন তখন, সেই উপন্যাসকে, তখনই, সেই সমকালে, ভারতীয় বা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত কোনো রূপের অন্তর্গত করে দেখা? বঙ্কিমচন্দ্রের মত পাঠকের পক্ষে 'আধুনিক উপন্যাসসকল' ও বাসবদত্তা-কাদম্বরীর পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন না থাকা সম্ভবই নয়। অথচ তিনি সেই পার্থক্য উল্লেখ পর্যন্ত করছেন না। এমনটি যে উপন্যাসের বেলাতেই ঘটছে তা নয়। ১৮৭৩-এ মধুসূদনের মৃত্যুর পর লেখা যে শোকলেখনটির ভিতর শোকের চাইতেও মহৎ এক উল্লাস স্পষ্ট, মধুসূদনের মধ্যে বাঙালির এক কীর্তিবোধের উল্লাস, তাতেও বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, 'এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী।...জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।' উপন্যাস আর কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্র যে ঐতিহ্যের সঙ্গে ইতিহাসপুরুষ হিশেবে মধুসূদনকে ও নিজেকে যুক্ত করতে চাইছেন সেখানে ইংরেজ নেই, 'ইউরোপ' বড় জোর 'সহায়'। তিনি তেমন মনে করছিলেন কেন—সময় ও ব্যক্তির সেই মনস্তত্ত্ব এখন আমরা বুঝতে চেষ্টা করছি না। আমরা শুধু বুঝতে চেষ্টা করছি, তিনি কী মনে করতে চাইছিলেন উপন্যাস বলতে।

ইতিহাস, কাব্য, আখ্যান, মনুষ্যচরিত্র, সৌন্দর্য, উপন্যাস—এই ধারণাগুলির ভিতর বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গতি তৈরি করেছিলেন প্রায় দেড় দশক ধরে। এমনি আর-একটি ধারণাও তিনি তৈরি করেছিলেন—রূপক। ধারণা বা বিষয়ের শ্রেণীভাগ করা ও সেই শ্রেণীভাগ ভেঙে দিয়ে আবার নতুন করে শ্রেণীভাগ করা—বড় ঔপন্যাসিকদের শিল্পস্বভাব। 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ কালীয়দমন ঘটনাটিকে তিনি প্রথমে বললেন—'ইহা উপন্যাসমাত্র—অনৈসর্গিকতায় পরিপূর্ণ।' তারপরেই বললেন—'কেবল উপন্যাস নহে—রূপক। রূপক অতি মনোহর।'

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র পুনর্গঠনের জন্যে নিজের ওপর যে-সব শর্ত আরোপ করেছিলেন, তাতে এটি একটি প্রধান শর্ত—অনৈসর্গিক কোনো ঘটনাকে মেনে নেবেন না। তদুপরি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালীয়দমন মহাভারতে নেই। অথচ কৃষ্ণচরিত্র নির্মাণে কালীয়দমনের সাংকেতিক সৌন্দর্য থেকে যে-কাব্য তৈরি হয়ে উঠছে তাকে অস্বীকার করবেন এতটা র‍্যাশনালিস্ট তাত্ত্বিক, আমাদের ভাষার বিস্ময়কর এই ঔপন্যাসিক নন। তিনি বরং স্ববিরোধিতা আরো প্রকাশ করে দেবেন। তাই একই ঘটনাকে 'উপন্যাস' বলে সেটি অস্বীকারই করলেন প্রায়। তারপরের অনুচ্ছেদেই 'এই গেল উপন্যাস, ইহার ভিতর যে রূপক আছে, তাহা এই' বলে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাব্য ও সৌন্দর্য রচনা করতে লাগলেন সেই অভাবিতপূর্ব বাংলাভাষায় যা তাঁর আগে ছিলই না।

> 'এই কলবাহিনী কৃষ্ণসলিলা কালিন্দী অন্ধকারময়ী ঘোরনিনাদিনী কাল স্রোতস্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত আছে। ...অতি ভীষণ বিষময় মনুষ্যশত্রুসকল এখানে লুক্কায়িত ভাবে বাস করে। ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের কুটিল গতি, এবং ভুজঙ্গের ন্যায় অমোঘ বিষ। আমরা ঘোর বিপদাবর্তে এই ভুজঙ্গমের বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপদ্ম ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। কৃপাপরবশ হইলে তিনি এই বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর মূর্ত্তি বিকাশপূর্বক অভয়বংশী বাদন করেন, শুনিতে পাইলে জীব আশান্বিত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে।...এই কৃষ্ণসলিলা ভীমনাদিনী কাল স্রোতস্বিনীর অ র্ত মধ্যে অমঙ্গল ভুজঙ্গমের মস্তকারূঢ় এই অভয় বংশীধর মূর্ত্তি, পুরাণকারের অপূর্ব সৃষ্টি। যে গড়িয়া পূজা করিবে, কে তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিতে সাহস করে?' (কৃষ্ণচরিত্র)।

এমনটি বারবারই ঘটে বঙ্কিমচন্দ্রে। তিনি 'উপন্যাস'কে খারিজ করতে গিয়ে রূপককে চলে যান আর এমন নয় যে তিনি সেই রূপককে তার এক অর্থমাহাত্ম্যে পৃথক করে নিচ্ছেন—তিনি যখন রূপকার্থের দিকে যাচ্ছেন তখন তিনি সৌন্দর্যরচনাকেই স্বীকার করছেন, যে-সৌন্দর্যকে তিনি কাব্য বলতে চান কখনো-কখনো। সেই রূপকের উন্মোচনে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই কবি হয়ে ওঠেন, বারবার, এই দুটি বইয়ের বিভিন্ন লেখায়। তখন রূপকার্থের 'অর্থ' আর কবিকর্মের 'কাব্য' আলাদা থাকেনা। কর্মই অর্থ হয়ে ওঠে, অর্থই কর্ম হয়ে ওঠে। সৌন্দর্যসৃষ্টি হতে থাকে সৌন্দর্যসৃষ্টিরই রীতিবিধিতে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আখ্যান রচনা করতে থাকেন। তখন তিনি কোন্ তত্ত্ব তৈরি করে তুলতে বা কোন্ তত্ত্ব প্রমাণ করতে ঐ আখ্যানে এসেছিলেন তার প্রাসঙ্গিকতা বদলাতেই থাকে, সেই পারেরগন ঘটে যায়।

> 'যাহা সুন্দর, তাহা আমরা বড় ভালবাসি। সুন্দর হইতে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনো উপকার পাই না, তবু আমরা সুন্দরের আদর করি। যে ছেলে চন্দ্র হইতে কী উপকার বা অপকার পাওয়া যায়, তাহার কিছুই জানে না সেও চাঁদ ভালবাসে। যে ছবির পুতুল, আমাদিগের ভালমন্দ কিছুই করিতে পারে না, তাহাকেও আদর করি। সুন্দর ফুলটি, সুন্দর পাখিটি, সুন্দর মেয়েটিকে বড় আদর করি। চন্দ্র কেবল সৌন্দর্য্যের গুণেই দেবতা, তাহার সাতাইশ মহিষী' (দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম)।

এ কথাগুলি লেখা হয়েছিল হিন্দুচিন্তায় 'চৈতন্য' বলতে কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা করতে। সে ব্যাখ্যা যখনই বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যানরচনার অনির্দিষ্ট প্রদেশে ঢুকে পড়ে বা তাঁর আখ্যানরচনার আবেগ ও শক্তি যখন প্রতিবর্তসক্রিয় হয়ে ওঠে তখনই সীমান্ত ভেঙে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যানকল্পনায় বা আখ্যানের তত্ত্বদেশে কী করে লেখাই হয়ে ওঠে কাব্য আর কাব্যই হয়ে ওঠে লেখা, তার যে দুটি-একটি ইঙ্গিত আমরা দিয়েছি তাতেও এটা পড়ে নেয়া যায় যে সে-কাব্যের ও সে-রচনায় ওতপ্রোত থাকে আখ্যান। বঙ্কিমচন্দ্র খুব স্পষ্ট করে আখ্যান আর কাব্যের ভাগ করেন নি—দু-এক সময় করলেও তিনি তেমন ভাগাভাগির মধ্যে বড় একটা যাননি। আমরা এখন হয়তো একটু ভাগ করতেও পারি—কোথায় কোন্ প্রসঙ্গ -তোলা হয়ে উঠছে আখ্যানকুশলতা, সে-কুশলতা হয়তো আখ্যান-সমাবেশের আপাত অদৃশ্য লক্ষের অংশ, কোথায় কোন্ প্রসঙ্গবিন্যাস হয়ে উঠছে তাত্ত্বিক সন্দর্ভ, কোথাও-বা লিরিক সন্দর্ভও। তেমন একটা কোঠাভাগ ভেবে নিয়ে আমরা যদি বঙ্কিমচন্দ্রের তখনকার ভাগ-কল্পনাহীন এই বিবরণটি পড়ি তাহলে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতায় কেমন উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে যেন এক অসংগঠিত আখ্যানের টুকরো, এমনই এক টুকরো যা আখ্যান থেকেই ছিটকে এসে আখ্যান মনে করিয়ে দিচ্ছে। 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম' আর 'কৃষ্ণচরিত্র' বই দুটিতে এমন সব অংশ যেন চকিতে যে-কোনো প্রসঙ্গে প্রধান হয়ে ওঠে যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র সেই সৌন্দর্য তৈরিতে মেতে ওঠেন, যেমনটি উপন্যাসে এক আখ্যানের ভিতর থেকেই তিনি করে থাকেন। এমন সব জায়গাতেই তো সেই সীমান্ত মুছে-মুছে যায়—রূপকের টানেই সেই কাব্য বা সৌন্দর্য তৈরি হয়ে উঠল, নাকী সেই কাব্য বা সৌন্দর্য তৈরির টানেই সেই রূপক অর্থবান হয়ে ওঠে।

রাসমণ্ডলের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র পৌঁছে যান এমন উপন্যাসনে,

> 'শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যাম সলিলা যমুনা প্রস্ফুটিত কুসুম সুবাসিত কুঞ্জবিহঙ্গমকূজিত বৃন্দাবন বনস্থলী, এবং তন্মধ্যে অনন্ত সুন্দরের স্বশরীরে বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্ণগীতি।... গোপীগণের ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে, তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া আপনাদিগকে কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথা কহিতে লাগিল...' (কৃষ্ণচরিত্র)।

বঙ্কিমচন্দ্র কার তত্ত্ব ব্যাখ্যা বা প্রতিষ্ঠা করবেন? তিনি এই রাসমণ্ডলের কল্পনায় ও কাব্যরচনায় এতটাই মুগ্ধ যে রূপককে যেন ততদূর পর্যন্ত নিতে চাননা, যেখানে এই রাসমণ্ডল দূরবর্তী ঠেকবে। যেন স্বামী, পিতা ও ভ্রাতাদের নিষেধ সত্ত্বেও গোপীরা রাসমণ্ডলের দিকে ছুটে আসছে আখ্যানের এই সক্রিয়তা বঙ্কিমচন্দ্রকে এমনই টানে যে তিনি লেখেন, 'এইরূপ দোষক্ষালনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। যুবক-যুবতীরা একত্রে নৃত্য করায় ধর্ম্মত কোনো দোষ ঘটে না, কেবল এই সমাজে সামাজিক দোষ ঘটে এবং কৃষ্ণের সময়ে, বোধহয়, সে সামাজিক দোষও ছিল না'। (কৃষ্ণচরিত্র)।

এমনটি বারবার ঘটে 'কৃষ্ণচরিত্র'-এ। বোধহয় এমন একটি জায়গাও নেই যেখানে ঐতিহাসিকতা ও তাত্ত্বিকতার যুক্তির চাপে বা ভারে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসকে স্থগিত রাখেন। বরং উল্টো করে বলা যায়, কোনো আখ্যান যদি আখ্যান হিশেবে তাঁর কাছে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে—ঐ সৌন্দর্য-রূপকের টানে—তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র তত্ত্ব বা ইতিহাস রচনাই, বরং নিজেরও অগোচরে হয়তো, কিংবা নিজেরই গভীরতর অভিকর্ষে, স্থগিত রাখেন। আখ্যান হিশেবে গ্রাহ্য হয়ে ওঠা ও আখ্যান গড়ে তোলা—এমন কোনো পরম্পরায় ঘটনাটি ঘটেনা। এ, যাকে বলে 'অপৃথগযত্ন'। সে আখ্যান যেমন চকিতে দেখা যায়—তেমনি আবার ছড়িয়েও পড়তে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে নিবৃত্ত করেন না। আমরা শুধু একটি নিদর্শন দিয়ে রাখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাই—যদিও রাসমণ্ডল নিয়ে কয়েকটি অধ্যায়ে তেমন আখ্যানরচনা আমরা পড়েছি। তবু, সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৃষ্ণের হস্তিনাযাত্রা থেকে হস্তিনা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত ছয়টি পরিচ্ছেদে উদ্ধৃতি, অনুবাদ সব মিলিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যেন প্রধান এক আখ্যান তৈরি করে তুলছেন—ইতিহাস, কাব্য, মনুষ্য চরিত্র, সৌন্দর্য, রূপক মিলিয়ে যে-আখ্যান তিনি কল্পনা করতেন, যে-আখ্যানের তত্ত্বদেশ তিনি তাঁর কল্পনার অন্তর্গত করে নিয়েছিলেন, সেই আখ্যান।

একটু সরল করে নিয়ে, এমন তত্ত্ব প্রমাণ করতে-করতে আখ্যান লিখে ফেলা, উপন্যাসন ঘটিয়ে ফেলাকে স্ববিরোধিতা ভেবে নেয়া যেতে পারে। ঔপন্যাসিক হিশেবে আখ্যানের তত্ত্বদেশ বঙ্কিমচন্দ্র এতই স্পষ্টতায় নিজের কাছে পরিচ্ছন্ন করে নিয়েছেন আর উপন্যাস তাঁর এমনই স্বভাবধর্ম যে স্ববিরোধিতাকে প্রকট করে তুলতে বা স্ববিরোধিতাকে বহুবলী করে তুলতেও তাঁর কোনো সঙ্কোচ নেই। 'কৃষ্ণচরিত্র' লিখতে গিয়ে তো তাঁকে জয়দেব ও 'গীতগোবিন্দ' সম্পর্কে একটা গ্রহণবর্জনের নীতি স্থির করতে হয়েছে। জয়দেব বাদ দিয়ে তো কৃষ্ণচরিত্র পুনর্নির্মিত হবেনা। বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবের সঙ্গে নিজের স্থানাঙ্ক ছকে নিয়েছেন। 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর উপক্রমণিকায় এই বইটি লেখার তিনটি কারণ তিনি দিয়েছিলেন—কী করে তিনি জানতে পারলেন 'ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত, সর্বপাপসংস্পর্শশূন্য আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই' 'তাহা বুঝানো এই গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য', 'ধর্ম্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্র সবিস্তারে সমলোচনা প্রয়োজনীয়', 'হিন্দুর এক আদর্শ...প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।' অথচ জয়দেবের সঙ্গে তাঁর স্থানাঙ্ক ছকতে গিয়ে কৃষ্ণচরিত্র-এর দ্বিতীয় খণ্ড, 'বৃন্দাবন'-এর সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষে তিনি তাঁর পদ্ধতিগত যাথার্থ্য, ধর্মআন্দোলনগত কর্তব্য ও আদর্শ প্রতিপন্নের নীতিবোধের কথা তোলেনই নি। তিনি জয়দেবের প্রতিতুল্য এক 'কৃষ্ণগীতি'-রচয়িতা বলে নিজের পরিচয় দিতে চাইছেন,

> 'যে কৈলাস শিখরে তপস্বী কপর্দীর রোষানলে ভস্মীভূত, সে বৃন্দাবনে কিশোর রাসবিহারীর পদাশ্রয়ে পুনর্জ্জীবনার্থ ধূমিত। অনঙ্গ এখানে প্রবেশ করিয়াছেন।...যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্ম্মোৎসব।...তাই কৃষ্ণচরিত্রের অভিনব ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে।... আমার ন্যায় অক্ষম, অধম ব্যক্তি সেই পবিত্র চরিত্র গীত করিলেও লোকে তাহা শুনিবে, তাই এই অভিনব কৃষ্ণগীতি রচনায় সাহস করিয়াছি।'

তাহলে কি বলা যায় জয়দেবকে প্রত্যাখ্যানই করছেন বঙ্কিমচন্দ্র? মাঝখানে একটি পরিচ্ছেদ বাদ দিয়ে ঐ দ্বিতীয় খণ্ড, বৃন্দাবন-এর দশম পরিচ্ছেদেই রাধা কী করে কৃষ্ণজীবনের আখ্যানে এলেন তার হদিশ খুঁজতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন,

> 'রাধাই এই নূতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ। জয়দেব কবি, গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নূতন বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বনই করিয়াই গোবিন্দগীতি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তানুসরণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।'

যে-সৌন্দর্য আর যে-কাব্য ছাড়া কোনো আখ্যানই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, সেই সৌন্দর্য আর কাব্যের গুণেই একটি আখ্যান তাঁর কাছে অপরিহার্য। তাই তিনি নিজেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিকে যেমন জয়দেবের প্রতিতুল্য কৃষ্ণগীতিকার বলে পরিচয় দেন, তেমনি জয়দেবের অনুগামী কবি বলেও নিজের একটা স্থানাঙ্ক চান। 'কৃষ্ণচরিত্র' বই লেখার দশ বছর আগে 'বঙ্গদর্শন'-এ তিনি যে-কৃষ্ণচরিত্র লেখাটি বের করেছিলেন তাতে লিখেছিলেন,

> 'জয়দেব গোস্বামী এই সময়ের সামাজিক অবতার ; গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি। অতএব গীতগোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ কেবল বিলাস রসে রসিক কিশোর নায়ক। সেই কিশোর নায়কের মূর্ত্তি, অপূর্ব্ব মোহন মূর্ত্তি ; শব্দ ভাণ্ডারে যত সুকুমার কুসুম আছে সকলগুলি বাছিয়া বাছিয়া চতুর গোস্বামী এই কিশোর-কিশোরী রচিয়াছে ; আদিরসের ভাণ্ডারে যতগুলি স্নিগ্ধোজ্জ্বল রতন আছে, সকলগুলিতে ইহা সাজাইয়াছেন...''।

ছয়

ইতিহাস, মনুষ্যচরিত্র, সৌন্দর্য, কাব্য, রূপক—'কৃষ্ণচরিত্র' আর 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম' বই দুটিতে পৌরাণিক পরিচিত সব আখ্যান তিনি যেভাবে পড়ছেন তা থেকে এই সব গুণ, বা ধর্ম, বা প্রকাশই যেন তিনি খোঁজেন ও সেই খোঁজাই একটা আকার বা গড়ন হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র আখ্যানের এক প্রামাণিক পৌরাণিকতা চান—সে-পুরাণ বা গল্প তাঁর আগেই ঘটে আছে, তিনি সেই পুরাণে বা গল্পে প্রবেশ করছেন চৌকাঠছাড়া কপাটছাড়া দরজা দিয়ে, বা দরজার মত ফাঁক দিয়ে। সেই পুরাণ বলতে ইতিহাসও বোঝায়, সেই ইতিহাস বলতে রূপকও বোঝাতে পারে। পুরাণহীন বা ইতিহাসহীন বা রূপকহীন কোনো মনুষ্যচরিত্রের আখ্যান বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যানতত্ত্বের ভূমি নয়। বাস্তবতাও সে-তত্ত্বভূমির উপাদান নয় অথচ বাস্তব ছাড়া তো পুরাণ বা ইতিহাস বা মনুষ্যচরিত্র কোনোটাই আকার পায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তবতাই তাঁর আখ্যানতত্ত্বে তির্যক থেকে তির্যগতর হয়ে ওঠে। সেই তির্যগতাতেই 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর সঙ্গে সমকালীন রচনা 'কমলাকান্তের দপ্তর,' 'মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত' ও বড় ইন্দিরা যুক্ত। এই লেখাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তবের ধারণার সঙ্গে আখ্যান-ধারণার ভিতরের সম্পর্ক নিয়ে আমরা কোনো কথাই বলিনি। কথাটা কী হতে পারে তার সামান্য আভাস দিয়েছি মাত্র, কোথাও-কোথাও। বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যানকল্পনায় ইতিহাস-পুরাণ, মনুষ্যচরিত্র, সৌন্দর্য, কাব্য, রূপক—এই গুণ বা ধর্ম বা গড়ন বা আকারের ভিতরকার সম্বন্ধ সব সময়ই সেই পারেরগন। সেই আখ্যানবিশ্বে ইতিহাস-পুরাণ, মনুষ্যচরিত্রের আধার হতে পারে একমাত্র তখনই, যখন মনুষ্যচরিত্রই ইতিহাস-পুরাণের আধার। ইতিহাস বা মানুষ বা তাদের ভিতরকার সম্পর্কের অগুনতি ভাঁজ যদি সে-আখ্যানের সৌন্দর্যকে সংজ্ঞার ভিতরে আলোড়িত করে না তোলে ও সংজ্ঞার বাইরে নিয়ে না যায় তা হলে বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যও তৈরি হয় না, রূপকও তৈরি হয় না। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ'-এর আলোচনায় ১৮৭৪-এ বঙ্কিমচন্দ্র ভাগবতের 'গূঢ় তাৎপর্য' কথাটিকে জোর দিতে, ঐ শব্দ-সমবায়ের পরই, 'আত্মার ইতিহাস' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন, হয়তো গূঢ়তার চাইতেও স্থানাঙ্কহীন, ও তৎপরতার চাইতে অতাৎক্ষণিক কোনো কল্পনা বোঝাতে।

২০০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুপ্ত দেশ, গোপন গল্প

মার্কসবাদী ও মার্কসবাদবিরোধী তাত্ত্বিকদের মধ্যে এই একটা বিষয়ে চিরকালই মতৈক্য হয়ে এসেছে যে মানুষ ব্যক্তি হয়ে উঠেছে শিল্পবিপ্লবের ফলে। তাকেই বুর্জোয়া বিপ্লবও বলা হয়ে থাকে। এই মতৈক্যকে যখন শিল্প-সাহিত্যে ব্যবহার করা হয় তখনো তাঁরা একমত হন যে এই ব্যক্তি হয়ে ওঠা মানুষের কাহিনী লিখতেই গল্প-উপন্যাসের ফর্মের প্রয়োজন হল। এমন মতৈক্য আরো একটু ভিতরে ঢুকিয়ে তাঁরা একমত হয়েই গল্প-উপন্যাসের একটা প্রধান চরিত্রের কথা বললেন—তাকে কেউ বললেন 'হিরো', কেউ বললেন 'প্রোটাগনিস্ট'। আমরা এই দুই পক্ষের কাছ থেকেই এই এককথা শুনে আসছি যে এই 'হিরো' বা 'প্রোটাগনিস্ট' যেমন একজন ব্যক্তি, তেমনি সে আবার বৃহত্তর কোনো শ্রেণীর প্রতিনিধিও বটে।

এই-যে শিল্পবিপ্লব বা বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে ব্যক্তির ব্যক্তি হয়ে ওঠার তত্ত্ব তাতে প্রাথমিক একটা হোঁচট আছে। যে কারিগর শিল্পবিপ্লবের আগে খুব সূক্ষ্ম হাতির দাঁতের কাজ বা কাঠের কাজ করতে পারত, সে কেন ব্যক্তি নয়? বিশেষত তার তুলনায় যে শিল্পবিপ্লবে এমন একটা কাজের একটা অংশ মাত্র করতে পারে, এমনকী পুরো কাজটাও করে ওঠার সুযোগ তার থাকে না? এই হোঁচট সামলানো হয় এমন যুক্তি দিয়ে যে প্রাক্‌শিল্পবিপ্লব যুগের কারিগরটি তার শিল্পের ফর্ম নির্বাচন করত না, সে পুরুষানুক্রমিকভাবে সেই বৃত্তিতে ঢুকে যেত। তাতে অবিশ্যি এ হোঁচট পুরোটা সামলানো যায় না—তাঁকে তো তাঁর দক্ষতা অর্জন করতে হত ব্যক্তিগত, একেবারেই ব্যক্তিগত সামর্থ্যে। অজন্তার চিত্রশিল্পীরা কি ব্যক্তি ছিলেন না একমাত্র এই কারণেই যে তাঁরা তাঁদের নামটুকু স্বাক্ষর করে যাননি?

মার্কসবাদী ও মার্কসবাদবিরোধী তাত্ত্বিকদের এই মতৈক্য তৈরি হয়েছে ইতিহাসের কার্যকারণ সন্ধানে এই দুই দলের ভিতর বুর্জোয়াবিপ্লব ও ব্যক্তির আত্মবিকাশ সম্পর্কে মতৈক্য থেকেই। দুই দলই একমত যে নভেল বুর্জোয়া যুগেরই এক শিল্পকর্ম ও পৃথিবীর প্রধান শক্তি হিশেবে বুর্জোয়ার প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই এই নভেলের শিল্পকর্মও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এমন মতৈক্যের আবার কিছু অনুসিদ্ধান্ত থাকে। ফলে এমন একটা ইতিহাস থেকে নন্দনতত্ত্বে গ্রাহ্য হয়ে গেছে—বুর্জোয়াবিপ্লব থেকে জাতিরাষ্ট্র, জাতিরাষ্ট্র থেকে মুক্ত বাণিজ্য, মুক্ত বাণিজ্য থেকে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য থেকে নভেল।

বুর্জোয়া যুক্তিবিজ্ঞান, যাকে আমরা কার্টেসীয় লজিকও বলতে পারি, সব সময়ই একটা সাধারণ সত্যে বা ইউনিভার্সালে পৌঁছুতে চায়। অবরোহী পদ্ধতিতে সেই সাধারণ সত্য থেকে এই যুক্তিবিজ্ঞান যেন আমাদের ব্যক্তিসত্যে নিয়ে আসে, আরোহী পদ্ধতিতে এমন ব্যক্তিসত্যগুলি যেন আমাদের সাধারণ সত্যে নিয়ে আসে। যেন আরোহী আর অবরোহী পদ্ধতিতে পৃথিবীর সব ঘটনাকেই সাজিয়ে ফেলা যায়, তার বাইরে আর কিছু থাকে না।

কিন্তু বরাবরই তো এই আরোহী-অবরোহী সাধারণ সত্যের বাইরে একটা স্বতন্ত্র সত্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপুল জগৎ পড়ে থেকেছে। 'মানুষমাত্রেই মরে' এই সাধারণ সত্য থেকে এশিয়া-আফ্রিকার মানুষের মৃত্যু তো সবটা বোঝা যায় না। তখন আমাদের যোগ করতে হয়, ইয়োরোপীয় উপনিবেশ বিস্তারের ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষ ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্বে একটু অধিক মরণশীল। বা, এই-যে আমরা এখন ইতিহাসের যে-পর্বে বাস করছি সে পর্বে সোমালিল্যান্ডের মানুষ মার্কিন দেশের মানুষের চাইতে একটু বেশি মরণশীল। এখন, জাপানের একটি পাঁচ বছরের শিশু যে বাইশ শতক দেখতে পাবে এটা যত নিশ্চয়তা নিয়ে বলা যায়, ততটা নিশ্চয়তা নিয়েই বলা যায় যে আফগানিস্তানের একটি পাঁচ বছরের শিশু দশ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচবে না। তেমনি ঐ ধরণের ঐতিহাসিক-দার্শনিক সাধারণ সত্য আমাদের বোঝাতে পারে না ব্যক্তির বিকাশ কেন শুধু অবাধ বাণিজ্যের ফল বা কারণ, আর আফ্রিকা থেকে জাহাজ ভর্তি করে যে ক্রীতদাসদের পর্তুগালের রাজধানীতে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা হয়েছিল শিল্পবিপ্লবের পথিকৃৎ কলকারখানাগুলিতে শ্রমিক হিশেবে কাজ করতে আজ থেকে দুশ-আড়াইশ বছর আগেও, তাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়েছে কোন অবাধ বাণিজ্যের বাজারে? এই আফ্রিকানদের তো নিজেদের বলতে একটা দেশ ছিল, সেই সব দেশে তো তারা হাজার-হাজার বছর ধরে বেঁচে এসেছে—ইয়োরোপীয়রা তাদের খুঁজে বের করার আগে। বুর্জোয়া বিপ্লব এই আফ্রিকানদের দেশছাড়া করে নিজেদের দেশে নিয়ে এসেছে, তাদের জন্যে শ্রমিকবস্তি বানিয়েছে, দু-তিনশ বছর তারা নতুন পরিচয় পেয়েছে, আফ্রো-আমেরিকান। এখন এই আফ্রো-আমেরিকানদের একজন, টনি মরিসন, যখন উপন্যাস লেখেন—সুলা, টারবেবি, বিলাভেড—তখন তিনি কি লিখবেন বুর্জোয়া ব্যক্তির বিকাশের কাহিনী নাকী আফ্রিকান ব্যক্তিত্বের বিনাশের কাহিনী? তিনি কি লিখবেন এক জাতিরাষ্ট্রের জন্মকথা নাকী এক মহাদেশের মৃত্যুগাথা? বুর্জোয়া যুক্তিবিজ্ঞান এখন মাথায় ভর দিয়ে পা আকাশে তুলে আছে। সমস্ত সাধারণ সত্য এখন বিশেষ-বিশেষ ঘটনার আস্তরণ হয়ে পড়েছে। আর সেই পুরনো সংজ্ঞা দিয়ে নভেলকে চিনে নেওয়া যায় না। প্রায় কোনোদিনই যেত না, দেড়শ বছরের বেশি সময় হল যায় না, যে-সময় থেকে উপনিবেশের মানুষজন তাদের নিজেদের ভাষায় উপন্যাস লিখতে শুরু করেছেন, যখন অ্যাফো-আমেরিকানরা তাদের লুপ্ত মহাদেশ নিয়ে উপন্যাস লিখছেন, যখন ক্যারিবিয়ানরা তাঁদের নিজেদের এপিক লিখছেন—'ওমেরিয়াস'—এককালের ইয়োরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির ভাষাতেই—ইংরেজিতে, স্প্যানিশে। নভেল আর প্রভুদের শিল্প নেই। সম্ভবত, কোনো দিনই ছিল না।

টনি মরিসন, আলেন্দে, অ্যাঞ্জেলেউ—এই অ্যাফ্রো-আমেরিকানরা প্রভুদেশের ভিতরেই এক বিপরীত সংলাপ লিখেছেন—যে প্রভুদেশে তাঁদের ক্রীতদাস হিশেবে এনে নাগরিক বানানো হয়েছে। এঁরা, বিশেষত মরিসন, এই মার্কিন দেশটাকেই তাঁর দেশ বলে বিশ্বাস করেন। এ বিশ্বাস কোনো একটা শর্ত বা অবস্থা মেনে নেওয়া বিশ্বাস নয়। এ বিশ্বাস এক আস্তিক্যের অংশ। মার্কিন দেশের নাগরিক হিশেবে সেই আস্তিক্য থেকে দুই শতাব্দীর আগের এক স্মৃতি জাগিয়ে তুলছেন। 'বিলাভেড' সেই স্মৃতির উপন্যাস, দুই শতাব্দ ধরে যে স্মৃতি মুছে দেওয়া চলছিল। এই ক্রীতদাস করে নিয়ে আসার ঘটনা একটা সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীকে আলাদা করে দিয়েছে। অ্যাফ্রো-আমেরিকান বলতে আফ্রিকান বোঝানো যায় না। অ্যাফ্রো-আমেরিকান বলতে আমেরিকান বোঝানো যায় না। অ্যাফ্রো-আমেরিকান বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একমাত্র অ্যাফ্রো-আমেরিকানকেই বোঝানো যায়। কী সেই আত্মপরিচয়—টনি মরিসন এখন মার্কিন দেশের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করেন দুশ বছর আগের স্মৃতির সঙ্গে। স্মৃতির ঐতিহাসিকতা আর বাঁচার দৈনন্দিন তখন একটিমাত্র অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। মার্কিন দেশে কাল চামড়ার মানুষের দুঃখকষ্টের কাহিনী আমরা পড়েছি—যে কাহিনী ছিল ঐ ব্যক্তির দুঃখকষ্ট জানার কাহিনীর ছকে বাঁধা মর্মান্তিক ও মহৎ সব কাহিনী। সেই মর্মান্তিকতা ও মহত্ত্ব ঝেড়ে ফেলে স্মৃতি এখন ইতিহাস হতে চাইছে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায়। অভিজ্ঞতা তার ছক ভেঙে ফেলছে। এই স্মৃতি এমন এক সর্বনাশের স্মৃতি—যে সর্বনাশ লক্ষ-লক্ষ মানুষের স্বদেশ কেড়ে নিয়েছে, স্বভাষা কেড়ে নিয়েছে, মাতৃদুগ্ধ কেড়ে নিয়েছে। আর এমন সর্বনাশ ঘটানো হয়েছে শিল্পবিপ্লবের ধ্যানধারণা, দক্ষতা ও বিপুলতা দিয়ে। এই ঘটনা মার্কিন দেশের ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়া হয়েছিল। মরিসনের উপন্যাসের ফলে সে ইতিহাস যে এই ঘটনা স্বীকার করছে, তাও নয়। কিন্তু মরিসন তো অভিজ্ঞতার এক নতুন মাত্রা এনে দিলেন, যা দৈনন্দিন, যা ঐতিহাসিক, যা ঘটমান, যা স্মৃতি। এই দৈনন্দিন, ইতিহাস, ঘটমান আর স্মৃতির ভিতরকার বৈপরীত্যই এতদিন মার্কিন দেশের উপন্যাসে অভিজ্ঞতা বলে প্রমাণিত ছিল। মরিসন সেই বৈপরীত্যের দেওয়ালগুলো ভেঙে ফেলে অভিজ্ঞতার এক অখণ্ডতা তৈরি করলেন। অভিজ্ঞতার এই অখণ্ডতা এখন ঔপন্যাসিকরা খুঁজছেন—অ্যাফ্রো-আমেরিকান ঔপন্যাসিকরা, দক্ষিণ আমেরিকার ঔপন্যাসিকরা, আফ্রিকার ঔপন্যাসিকরা, আরব ভূখণ্ডের ঔপন্যাসিকরা, ভারতের ঔপন্যাসিকরা।

'বিলাভেড' সেই ভাঙনের উপন্যাস, যে-ভাঙনে এক জনগোষ্ঠী তার পূর্বপুরুষকে তর্পণের জন্যেও আর মনে আনতে পারে না। সেদ যে তার বাচ্চাটিকে মেরে ফেলে সেটা কোনো ব্যক্তিগত খুন নয়। সেই হত্যা হয়ে ওঠে যেন আফ্রিকার প্রসূতিদের এক সমবেত ভঙ্গি—সেই প্রসূতিরা শতাব্দ জুড়ে সন্তানের জন্ম দিয়েছে, সেই সন্তানদের কাছ থেকে তাদের এত দূরে এতই নিরাপত্তার সঙ্গে ছিঁড়ে আনা হয়েছে যে প্রসূতিরা তাদের জাতককে মনেও আনতে পারে না, ফিরিয়ে তো আনতেই পারে না। স্মৃতিও সেখানে অসমর্থ—মার্কিন দেশের নাগরিক টনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে মহাদেশের সীমা পেরিয়ে প্রসারিত করেন।

টনি মরিসন ও তাঁর সমকালীন অ্যাফ্রো-আমেরিকান ঔপন্যাসিকদের লেখা কিন্তু কোনোভাবেই আফ্রিকান উপন্যাস নয়। এমনকী মার্কিনি কাল লেখকদের উপন্যাসও নয়। এগুলোই এখন মার্কিন উপন্যাসের প্রধান অংশ আর এইভাবেই এককালের উপনিবেশবিস্তারী ইয়োরোপীয় জাতিরাষ্ট্রের উপন্যাসমালার বিপরীতে কার্পেন্তিয়ার, মার্কোয়েজ, হুয়ান রুলফোর উপন্যাস তৈরি হয়েছে। অভিজ্ঞতার মেরুই বদলে দেওয়া হয়েছে। এঁরা কেউই নির্বাসিত লেখক নন। নির্বাসন মানে তো কোনো বাসভূমি থেকে নির্বাসন। ইমপিরিয়্যালিজম এই বাসভূমির ধারণাটাই তো বদলে দিল। বাসভূমি বা হোম বলতে ইমপিরিয়্যালিজম বোঝায় একমাত্র সেই ভূখণ্ডকে, যেখান থেকে উপনিবেশে যাওয়া হচ্ছে। সেই ভূখণ্ড থেকে যখন উপনিবেশে যায় তখন তো সে জয় করতে যাচ্ছে। আর সেই উপনিবেশ থেকে যখন কোনো প্রজা প্রভুদেশে আসে, তখনো তো স্ববাসভূমিতেই আসছে, হোমে আসছে। কার্পেন্তিয়ার কখনোই ক্যারিবিয়ান ছাড়া আর-কিছু নন। হুয়ান রুলফো ও মার্কোয়েজ লাতিন আমেরিকান ছাড়া আর-কিছু নন। টনি মরিসন আমেরিকান ছাড়া আর-কিছু নন। যে দেশগুলিকে তাঁদের স্বদেশ বানানো হয়েছে, দুশ-তিনশ বছর পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁরা সেই স্বদেশকে এক গোপন স্মৃতির অভিজ্ঞতায় জাগিয়ে তুলছেন। সেই স্মৃতির সক্রিয়তা কোনো ব্যক্তির বিকাশের অংশ নয়, কোনো প্রোটাগনিস্টের অভিযান নয়। সে-স্মৃতি এক জনগোষ্ঠীর সমবেত স্মৃতি। সে-স্মৃতি এক ভূখণ্ডের স্মৃতি। সে-স্মৃতি এখনকার প্রতিদিনের বাঁচার সঙ্গে জড়ানো স্মৃতি।

আমি যে এঁদের লেখার কথা তুলছি, তার কারণ, এঁদের লেখা দিয়ে এই কথাটি বলা সহজ যে উপন্যাসের মেরুবদল ঘটে গেছে, সংজ্ঞাবদল ঘটে গেছে, যে অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসে একটা আকার দেওয়া হয়, তার গড়ন-ধরণ পালটে গেছে, আমরা আগে যাকে অভিজ্ঞতা বলতাম এখন অভিজ্ঞতা বলতে আর সেটুকু বোঝায় না। আমাদের, ভারতীয় গল্প-উপন্যাসে এই বদলটা ঘটেছে অনেক আগে। এমনকী হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রেই। কেমন করে সেটা ঘটেছে সেটা একটা জটিল প্রক্রিয়া—সেই জটিল প্রক্রিয়ায় লেখকের মন এক সক্রিয় উপাদান। আবেগ অনুভবও। আর, হয়তো সচেতনতার সঙ্গে বা ইতিহাসবোধের সঙ্গে তার বিরোধ আছে।

আমাদের অভিজ্ঞতার সেই জটিলতার বিশ্লেষণ এড়াতেই আমি অ্যাফ্রো-আমেরিকান, লাতিন আমেরিকান ও ক্যারিবিয়ান লেখকদের এখনকার লেখার কথা আগে বললাম। আমাদের ভাষা ইংরেজরা নষ্ট করে দিতে পারেনি। বরং ইংরেজির সঙ্গে বিনিময় ঘটার ফলে ভারতের সব ভাষারই এক ধরণের পুষ্টি এসেছে। অপুষ্টিও ঘটেছে এত, সে কথা এখন থাক। বলা হয়ে থাকে—ইংরেজদের কথা থেকে আমরা সাহিত্যের আধুনিক সব ফর্ম শিখেছি—লিরিক, নাট্য, উপন্যাস। এটা আংশিক সত্য। আর, সব আংশিক সত্যের মতই অর্ধসত্য। অর্ধসত্য কখনোই সত্যের অর্ধেক নয়। সত্যের বিকার। মিল্টন থেকে মধুসূদন কী নিয়েছিলেন আর কী নেননি—এটা শিল্পের ফর্ম তৈরির পক্ষে অপরিহার্য বিষয় নয়। ফর্ম হিশেবে, সাহিত্যের ফর্ম হিশেবে, 'মেঘনাদবধ কাব্য' বিশ্বসাহিত্যেই অতুলনীয় ও মৌলিক। যেমন অতুলনীয় ও মৌলিক স্কট-নিরপেক্ষভাবেই 'দুর্গেশনন্দিনী'। 'মেঘনাদবধ কাব্য' ও 'দুর্গেশনন্দিনী'তে, আমাদের সাহিত্যে ইংরেজের সাহিত্যপ্রভাবের এই দুই আদি নিদর্শনেই, ইংরেজের সঙ্গঅভিজ্ঞতার মেরু বদলে দেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতার এমন মেরুবদল ঘটে অজস্র উপমার ব্যবহারে, উৎপ্রেক্ষা সন্ধানে, অজস্র সব দেশীয় ভঙ্গিকে ভাষায় তুলে আনায়, অজস্র সব দেশীয় সম্পর্ককে কাহিনীর অবলম্বন করে তোলায়। সীতা-সরমার ভঙ্গি বোঝানো সেই বিখ্যাত উপমা মনে করলে ক্ষতি নেই। আরো বেশি করে মনে আনা যায় রাবণের অজস্র ভারতীয় মুদ্রা ও ভঙ্গি। অজস্র সম্বোধন আর নিসর্গ বর্ণনা সেই ভারতীয়তার ভূখণ্ড তৈরি করে। আমি এখানে 'মেঘনাদবধ কাব্য' বা 'দুর্গেশনন্দিনী' কীভাবে সাম্রাজ্যবিরোধী কাহিনী হয়ে উঠেছে, ইংরেজপ্রভাব নিরপেক্ষভাবেই মৌলিক ও অতুলনীয়, তার প্রমান হাজির করব না। তবু যাতে আপনাদের স্মৃতি জেগে ওঠে ও আমার এই কথাটুকুর সমর্থন নিজের মনে পাঠক চকিতে জুটিয়ে নিতে পারেন সেই কারণে উল্লেখ করছি 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ খাঁটি বাংলা ক্রিয়াপদ কী সংখ্যায় ব্যবহার করা হয়েছে আর 'দুর্গেশনন্দিনী'তে মানুষজন যখনই প্রাসাদের বাইরে আসে তখনই সে বাহির, এক ভারতীয় নিসর্গকে ঐ উপন্যাসের অব্যবহিত করে তোলে।

আমরা যদি মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে অনেকটা সরে আসি তাহলেও আমরা দেখব, সেই সব ছোট-বড় গল্পে-উপন্যাসে কত অসংখ্য ভঙ্গি, মুদ্রা, বেদনা, উল্লাস, নেশা, হাসিকান্না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রান্নাবান্না, রাগ, খেলাধুলো, সম্পর্ক, ডাকাডাকি, চুপ করে থাকা ও আমাদের ভারতীয় প্রতিদিন তৈরি হয় আরো এ-রকম অগুনতি যে সব আচার-আচরণে, সেগুলির ভিতর অস্পষ্ট অথচ নিশ্চিত এক সংযোগ গড়ে উঠছে প্রধান গল্পের আড়ালে-আড়ালে, প্রধান গল্পের সঙ্গে-সঙ্গে। সেই আচার-আচরণ-অভ্যাস এক অস্পষ্ট ইশারায় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রশক্তির বিরুদ্ধ এক শক্তি হিশেবে আভাসিত হচ্ছে। হয়তো এই আচার-আচরণ-অভ্যাস-মুদ্রা-ভঙ্গি প্রধান গল্পের গড়নে খুব অব্যবহিত নয়। এগুলোকে অনেক সময়ই মনে করা হয় গল্প-বলার সময় অবান্তর সব কথা টেনে আনার ভারতীয় এক অভ্যাস। অনেক সময় লেখক নিজেই আগ বাড়িয়ে বলে দেন, এগুলো সব অবান্তর কথা, এগুলোর কোনো গভীর অর্থ নেই, পুরনো কথা মনে পড়ে গেল তাই লেখক বলে ফেলছেন, এমন আরো একটা ঘটনা ঘটেছিল বলে লেখক শুনেছিলেন তাই কথাটা পাড়লেন।

এই-যে একটু ছল খুঁজে বাড়তি কথা বলা, একটু হাত কচলে পুরনো কথা তোলা, এই-যে একটু বিনয়পনা, নিজেকে একটু আড়ালে নেওয়া, নিজের বিশ্লেষণ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়া, এই-যে এক সহজ আত্মীয়তায় পাঠককে গল্প শোনানো, পাঠকের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলা, গল্পের ব্যাপারে গোপন এক আত্মবিশ্বাস, গল্পের আসল অর্থের ওপর ঢাকনার পর ঢাকনা দেওয়া, উপনিবেশের ভারতে যাঁরা গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, সে যে ভাষাতেই হোক—তামিল বা মালয়ালমে, রাজস্থানিতে বা উর্দুতে, ওড়িয়ায় বা বাংলায়, তাঁদের সকলেরই এক মুদ্রা, এক ভঙ্গি। এই ভঙ্গি চট করে পাঠককে ভোলাতে পারে। তাতে গল্পকার বা ঔপন্যাসিকের আসল মুখটা ধরা পড়ে না—সে-মুখ বেঁচে থাকার অভিজ্ঞ চাতুর্যে ঠাসা, সে মুখ যার, সে কথায়-কথায় ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে, ভুল কথা বুঝিয়ে দিতে পারে, সে কোনো সময়ই লক্ষভ্রষ্ট হয় না, কোনো সময়ই তার কায়দাকানুন ভুল করে না। কৌশল করে বেঁচে-থাকা ছাড়া, তার আর-কোনো উপায় জানা নেই বেঁচে থাকার।

একটা খুব বিখ্যাত গল্পের উদাহরণ নিচ্ছি। প্রেমচন্দের 'পৌষের রাত'। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের লড়াইয়ের গল্প হিশেবে এ গল্প চিরকালই বিখ্যাত। এখানে প্রকৃতি এসেছে শীত হয়ে। যদি এটাই এ গল্পের প্রধান বা একমাত্র গল্প হত, তাহলে গোর্কির সেই বিখ্যাত গল্প, 'শরতের এক রাতে', তার সঙ্গে এই গল্পটির তুলনা করা যেত। কিন্তু গোর্কির গল্পে প্রকৃতি আর মানুষ মুখোমুখি যুযুধান, কে কাকে হারাতে পারে। আর, প্রেমচন্দের গল্পে মানুষটি একটা চাষা, সম্ভবত পূর্ব উত্তরপ্রদেশের, জীবনসঙ্গী হিশেবে তার একটি স্ত্রী আছে ও একটি কুকুর আছে। তাকে আরো নানা কিছুর সঙ্গেই লড়তে হচ্ছে, ঠাণ্ডার সঙ্গেও। গল্পের শেষেও আমরা বুঝতে পারি না, সে হারল না জিতল। তার হারজিতটা অত স্পষ্ট কিছু কখনোই নয়। সেখান থেকে গল্পের অর্থের নির্দিষ্টতা ভেঙে যায়, অর্থের বহুবলিতা তৈরি হয়। রাত্রিতে ঠাণ্ডা তাকে এতটাই কাবু করে ফেলেছিল যে জন্তুরা এসে তার জমির পাকা ফসল নষ্ট করছে বুঝেও সে আঙুলটি নাড়ায় না। ঐ ফলনের ওপর তার ও তার পরিবারের সারা বছরের বেঁচে থাকা। হলকু সকালে সেই বিধ্বস্ত ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে হাসতে পারে, তাকে আর রাতে এই খোলা মাঠে শুতে হবে না এই স্বস্তিতে। আমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছি, ঘর বলতে হলকুর যে ছাউনিটা আছে তাতে ঠাণ্ডা থেকে সে খুব একটা বাঁচবে না। গল্পটা যেখানে শেষ হয়, সেখানে আর-একটা গল্প শুরু হয়। মাত্র ২০০০ শব্দের এই গল্পে চার-চারটি পরিচ্ছেদ। সময়ের বা পরিস্থিতির যে-বদল বোঝাতে সাধারণত পরিচ্ছেদ ভাগ করতে হয়, তেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো দরকার ঘটছে না। দুই পরিচ্ছেদের মাঝখানে প্রেমচন্দ উপনিবেশের এক মানুষের ভিতরের দেশ উদ্‌ঘাটিত করে দেন। সেই ভিতরের দেশে এই লোকটি নিজের জান বাঁচাতে পারে, সেই মুহূর্তে যে তার টুঁটি কামড়ে ধরছে আপাতত তাকে ঠেকিয়ে। তার কোনো পাকাপাকি বেঁচে-যাওয়া নেই। যে তিন টাকা সে কম্বল কেনার জন্যে জমিয়ে রেখেছিল সেটা দিয়ে মহাজনকে ঠেকিয়ে বাঁচে গল্পের শুরুতে। আর গল্পের শেষে বাঁচে পুরো ক্ষেতটাই জন্তুর মুখে দিয়ে। এমন করে বাঁচতে গিয়ে সে নিশ্চিত মরেছে—টাকা তিনটি দিয়ে দেওয়ায় সে পড়ল ঠাণ্ডার মুখে আর ক্ষেতটা নষ্ট হতে দিয়ে সে পড়ল বছর-ভর উপবাসের মুখে। এটা বাস্তবতার অভিজ্ঞতা নয়। এটা বিপরীত এক বাস্তব। এটাই হচ্ছে উপনিবেশের বিপরীত-বাস্তবের গল্প, এমন গল্প, যেখানে গল্পটাকে লুকিয়ে ফেলা হয়। এ হচ্ছে সেই গল্প যেখানে কোনো প্রটাগনিস্ট জন্মায় না, কারণ উপনিবেশের প্রজা প্রটাগনিস্ট হয় না। অথচ তার একটা গল্প আছে। সে-গল্পটি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের উলটোদিকে মাটি খুঁড়ে কোথাও লুকতে চাইছে। এই উলটো দিকটা হচ্ছে অপ্রটাগনিস্টের দিক। প্রট্যাগনিস্টের পাল্টা যদি অ্যানটাগনিস্ট হত, তাহলে সেটাও তো হত সেই আরোহী-অবরোহী যুক্তিবিজ্ঞানের থিসিস-অ্যান্টিথিসিসে ফেঁসে যাওয়া। উপনিবেশের একজন গল্পকার ঐ ফাঁস থেকে বেরবার হাজারটা ঘুরপথ জানেন—প্রাণের দায়ে তাঁকে জানতে হয়।

আমরা ভঙ্গির কথা, কষ্টের কথা, অভ্যেসের কথা বলছিলাম—গল্পের নিজস্বতাকে স্পষ্ট করতে বা ঢাকতে। প্রেমচন্দেরই আর-একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে, 'কাফন।' আরো অনেক গল্পের কথাই মনে আসতে পারে। 'কাফন'-এর কথাই যে মনে পড়ল তার কারণ এখানে ঘটনা একটাই, ঘটনা বা দুর্ঘটনা, আর সে-দুর্ঘটনাটা ঠেকানোও যেত। মাধবের বৌ প্রথম বাচ্চা দিতে গিয়ে মারা যাচ্ছে। বিয়ের এক বছরের মাথায় ঘটনাটা ঘটছে। প্রথমত, এমন ঘটনা তো প্রতিদিন ঘটে না, জীবনে একবারই ঘটে। মাধব এমন করে, যেন এ রকম ঘটনা তারা রোজই সামলায়। দ্বিতীয়ত, দুবার তাদের অঙ্গভঙ্গি বিশদে বলা হয়—একবার যখন তারা গরম আলু খাচ্ছে, আর একবার মাধবের বৌয়ের কাফনের জন্যে গাঁয়ের লোকদের দেওয়া টাকা দিয়ে তারা যখন খাচ্ছে, নেশা করছে, গান গাইছে। এই দুইবারই আমরা তাদের সব অঙ্গভঙ্গিতে দেখতে পাব ১. তারা যেন পালিয়ে যাচ্ছে, লুকিয়ে পড়ছে, পিছু হঠছে, ২. মানুষের মাথা, পিঠ ও পা কোনো জন্তুর মাথা, পিঠ ও পা হয়ে যাচ্ছে, ৩. আসল মানুষের নকল সব ভঙ্গি। শিল্পকর্মকে এমন লিস্টি করা যায় না, গল্পের বাক্যগুলির ফাঁকফোকরে, ফোঁড়গুলিতে সেই শিল্পকর্ম লুকনো থাকে।

১. 'দুজনে আলু বের করে গরম-গরম খেয়ে চলে। কাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। তাই আলু ঠাণ্ডা হওয়ার তর সইছে না। বার কয়েক দুজনেরই জিভ পুড়ে যায়। খোসা ছাড়ালে আলুর ওপরটা তো খুব বেশি গরম থাকে না, কিন্তু দাঁতের নিচে পড়ামাত্রই ভেতরটা জিভ, গলা আর টাকরা পুড়িয়ে দেয়। ওই অঙ্গারটাকে তখন মুখে রাখার চাইতে অনেক বেশি ভালো সেটাকে ভেতরে পাচার করে দেওয়া। ...দুজনে কপাকপ গিলছে। যদিও তা করতে গিয়ে চোখে জল এসে পড়ছে।'

২. 'আলু খাওয়া হয়ে গেলে দুজনেই জল খেয়ে ওখানেই আগুনের সামনে কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে পেটে পা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে। যেন দুটো বড়ো-বড়ো অজগর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. 'পেট ভরে খেয়ে মাধব বেঁচে-যাওয়া পুরির ঠোঙাটা নিয়ে গিয়ে একটি ভিখিরিকে দিয়ে দেয়। ...দেওয়ার গৌরব, আনন্দ আর ফুর্তি মাধব জীবনে এই প্রথম পেল।'

প্রেমচন্দ থেকেই এই বিকল্প আখ্যান আর অপ্রট্যাগনিস্টের সব আচার-আচরণের অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত তখন ভারতবর্ষ, তার কোনো গল্প এটা হতে পারে না। একে 'সাম্রাজ্যবিরোধী' বলার লোভ হলেও বলছি না—কারণ ঐ-কথাটির অন্য অর্থ আছে। বলা যাক, সাম্রাজ্যনিরপেক্ষ। অভিজ্ঞতা কী করে এই সাম্রাজ্যনিরপেক্ষ আখ্যানে মোড় নেয়, কলোনির প্রজা কী করে অপ্রট্যাগনিস্ট হয়ে যায়, তার নমুনা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহ খুললেই চোখে পড়বে। প্রেমচন্দের মতই বিভূতিভূষণও সেই শেয়ানা গল্পকার পুরো গল্পটাই তিনি গায়েব করেন অথচ সেই গল্পটার অছিলায় কত কথার ইশারা তৈরি হতেই থাকে। বিভূতিভূষণের গল্পে মানুষজন সব হারিয়ে যেতে থাকে, যে যেখানে পৌঁছতে বেরয় সে সেখানে পৌঁছয় না, সব গল্পই শেষ হয় আর-একটা গল্পের চৌকাঠে। এমন পরিসরের গল্প তাঁর আছে যে-গল্পে গাছপালারও মানুষজনের মতো নাম থাকে, এমনকী এক নদীর জলেরও আলাদা ঘাটে আলাদা নাম। অথচ এই বাড়িঘরকে যদি গোছানোর চেষ্টা করা যায় তাহলেই তারা আলাদা হয়ে যায়, অস্পষ্ট হয়ে যায়, অচেনা হয়ে যায়, স্মৃতিলগ্ন হয়ে যায়, অবাস্তব হয়ে যায়।

'পুঁইমাচা' তো তাঁর ও পৃথিবীরই চিরকালের শ্রেষ্ঠ একটি গল্প। ক্ষেন্তি কয়েকটা ফেলে দেওয়া পুঁইডাঁটা নিয়ে এসেছিল বলে তার মা তাকে বকুনি দেয়, ডাঁটাগুলি ফেলে দেয়, আবার একটুখানি রেঁধেও দেয়। ক্ষেন্তি একটা ডাঁটা পুঁতেও দেয়। ক্ষেন্তির বিয়ে হয়। তার খিদের জন্যে আর তার বাবা যৌতুক কম দিয়েছে বলে সে শ্বশুরবাড়িতে হেনস্তা হয়। শেষে বসন্তে মারা যায়। তার মৃত্যুসংবাদ আমরা পাই তার বাবা ও তাঁর প্রতিবেশীর এক অলস আলাপে। মৃত্যুসংবাদটা দেওয়ার জন্যে যোগ্য শব্দ ক্ষেন্তির বাবার মুখে আসে না। এ সংবাদ বইবার যোগ্য শব্দ মানবসভ্যতায় নেই। আলগোছে বুঝিয়ে সে তাড়াতাড়ি মাছ ধরার চারের কথায় চলে যায়। আর প্রতিবেশীর কৌতূহলের কারণ, তিনিও তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছেন। ক্ষেন্তির গল্প ঘটতেই থাকবে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি উর্বর জমিতে ফেলে দেওয়া পুঁইডাঁটা এক বর্ষায় ঝাঁপিয়ে ওঠে কিন্তু মেয়েরা এক বর্ষা বাঁচে না।

'তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হল। এমন চামার—বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর সম্পর্কের বোন আছে...তারই ওখানে ফেলে রেখে গেল। গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে... যাক, তা চলো যাওয়া যাক, বেলা গেল। চার কি ঠিক করলে? পিঁপড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধা হবে না।'

এ এমনই এক গল্প, এতই পলকা যেন টীকাটিপ্পনীর হাওয়া লাগলেও ঝরে যাবে। মানুষের সব সম্পর্ক, সম্পর্কের ভিতরের সব মানুষ, বাড়িঘরের সঙ্গে জড়ানো লতাপাতা—যেগুলো খাদ্যও বটে, দৃশ্যও বটে, প্রতিদিনের বাঁচা, রান্নাবান্না, সময়কাটানো, জীবনকাটানো, উৎসব আর মৃত্যু—এ সব যেন ঘূর্ণিপাকে ঘুরছে। ঘুরছে তো ঘুরছেই। এমন নিপাট, নিখাদ, কঙ্করময়, অসমতল, কুটিল, আয়রনিসঙ্কুল, সরল গল্প বিভূতিভূষণও হয়তো আর লিখে উঠতে পারেননি কারণ এ গল্প একটা স্তরের পর লেখক লেখেন না, লেখা হয়ে যায়। আর একটি গল্প মনে পড়ে যায় আমার, চেকভের 'ডারলিং'। কথাটা এই জন্যেই তোলা যে আমাদের এই কলোনির অধস্তন অর্থহীন বেঁচে থাকার কথা আমাদের এক লেখক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রট্যাগনিজম, শিল্পবিপ্লব, জাতিরাষ্ট্রের ধ্বংস ঘটিয়ে লিখেছিলেন। টনি মরিসনের 'বিলাভেড' উপন্যাসে সে যে তার শিশুকন্যাকে বধ করে আর সে-হত্যা যে হয়ে ওঠে দুশ বছরের মার্কিনি ইতিহাসের গোপন অভিজ্ঞতার এক উদ্‌ঘাটন, তেমনি, তেমনি, তেমনি স্মৃতিগর্ভ অভিজ্ঞানচিহ্নিত 'পুঁইমাচা'র ক্ষেন্তির মৃত্যু। বা, ঠিক করে বলতে গেলে, মৃত্যুসংবাদ।

আর-একটি গল্পের কথা আনা যায়। আর মাত্র একটি কেন, বিভূতিভূষণে এমন গল্পের সংখ্যা অজস্র। তবু আমি 'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ' গল্পটির কথাই আনছি—গল্পটি এমন শিথিল, এমন প্রায়-অবান্তর, এমন অস্পষ্ট সম্পর্ক, এমন লুকনো আর এমন উদ্দেশ্যহীন বলেই। গল্পটা শুরু হল কোথায় আর শেষই-বা হল কোথায়? হীরেনের বকুনি করার স্বভাব পৈতৃক। তার বাবাও বকতে-বকতেই মারা যান। হীরেনের এক বুড়ি পিসিমা থাকেন এমন এক গ্রামে যার বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যেও রেল-স্টিমার নেই। সেই পিসিমাকে হীরেন দেখতে গেলে কুটি বলে একটি মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়। সেও শুধু কথা বলতেই ভালবাসে। এরপর গল্পের বেশ অনেকটা জুড়ে হীরেন আর কুটি অনর্গল কথা বলে যায় আর কুটির জন্য একটা ভাল পাত্র জোগাড়ের চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে হীরেন। এরপর অনেকগুলো বছর চলে যায়—এতগুলো বছর, যার মধ্যে হীরেন হীরেনের মত করে একটা চাকরি পায়, যাকে উন্নতি বলে তেমন উন্নতি করে, বিয়েও করে। আবার, কুটিরও কুটির মত করে বিয়ে হয়, কুটি কুটির মতই স্বামীর সংসার করতে পারে না তার স্বামী এতই গরিব। এত বছরের ব্যবধানে পুনর্সাক্ষাতে দুজন আবার তাদের পুরনো বকুনির অভ্যাসে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে। ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপুজোর রাতে কুটি হীরেনকে অরন্ধনের নিমন্ত্রণে খাওয়ায় পান্তা ভাত, নারকোল কুমরি, কচুর শাক। সেই প্রায়ান্ধকারে তাদের প্রায় শেষ সংলাপ হয়,

—'আমি যদি এখানে থাকি তুই খুশি হোস?...

—'কি বলব, বলো দিকি...

এ গল্পে কিছুই ঘটে না। ঘটে-না বলতেও যেটুকু ঘটা বোঝায়, সেটুকুও ঘটে না। একবার, একবারই একটুখানি বলা হয়, 'আচ্ছা, আর কারো সঙ্গে কথা বলে অমন আনন্দ হয় না কেন?...সরমার সঙ্গেও তো রোজ কত কথা হয়...কই...', কিন্তু এমন অসম্পূর্ণ কথাও এতটা অসম্পূর্ণ নয় যে কোনো এলিয়েনেশন ভাবা যাবে, অথচ গল্পটি যে গল্প হয়েই ওঠে তার একটি কারণ আমাদের রোজকার চেনাজানা বা আমাদের পারিবারিক সূত্রে জানাবোঝা প্রসঙ্গগুলি গল্পটির মধ্যে অনবরত ওঠে আর মিলিয়ে যায়—বাঙালি হিন্দুবাড়ির সম্পর্কের নানা জট, বুড়ি পিসিমা, যোগ্য ছেলের বিয়ের নানা প্রস্তাব, গরিব মানুষজনের প্রতিদিনের বেঁচে থাকা, তাদের বিয়ে ও বিয়েভাঙা অথবা তাদের স্বামীর-ঘর করতে না পারা, তাদের রান্নাবান্নার নানা কৌশল। এ গল্প অসংখ্য অসংলগ্ন ইঙ্গিতে ঠাসা যা সত্যি ইঙ্গিত কী না তা বোঝাই যায় না। এত সব অবান্তরতা, অসংলগ্নতা, প্রসঙ্গান্তরে শুধু সেই সত্যটার ওপর ঢাকা পড়তে থাকে, একটার পর একটা ঢাকা, যা সত্য হয়ে উঠত, যদি আমাদের কলোনির জীবনে বেঁচে থাকার কোনো সত্য আদৌ থাকত। আর এমন এক গল্পের শুরু বা সংযোগ হচ্ছে—গ্রামের দুই বালক-বালিকার নিরর্থক বকে যাওয়ার অভ্যেস। এ অভ্যেস কোনো ব্যক্তিগত অভ্যেস নয়, এ এক জীবনের অভ্যেস, অনিশ্চয়তাহীন জীবনের অভ্যাস যা বস্তুত নিশ্চয়তাহীন, পরিণতিহীন, আরম্ভহীন জীবনের অভ্যাস।

শিল্পবিপ্লবের ফলে, বুর্জোয়াবিপ্লবের ফলে, ব্যক্তির বিকাশকে সাহিত্যে আকার দেওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে যে-নভেল তৈরি হয়েছিল বলে ভাবা হয়, সে-নভেলে এমন গোপন, অস্পষ্ট, বিশৃঙ্খল, ঘুরনো, সঙ্গে-সঙ্গে এমন জীবন-অভ্যাসময় গল্প-লেখা সম্ভব নয়। অন্তত সম্ভব হয়নি। এ গল্পে একটা খুব পরিষ্কার চেষ্টা আছে—কিছুতেই যেন কিছু কাল্পনিক হয়ে না ওঠে। তখনো তো জাতিরাষ্ট্রগুলি নতুন-নতুন দেশ জয় করছে আর প্রেমচন্দ-বিভূতিভূষণের গল্পের মানুষজন রেলস্টেশন বা স্টিমারঘাট অর্থাৎ সভ্যতার শেষচিহ্ন থেকে পঁচিশ-তিরিশ মাইল ভেতরে সরে যাচ্ছে। সেই সব মানুষজন যে গুঙিয়ে ওঠে তাও তেমন স্পষ্ট বোঝা যায় না, সে তাদের শ্বাসটানার ভঙ্গি নাকী তাদের কোনো কষ্ট, তারা স্বপ্নও যদি দেখে তাও বোঝা যায় না তাদের কি খিদের চোটে ভিড়মি লাগল নাকী ঘুমের মধ্যে সত্যি কিছু দেখছে, কিছু প্রাচীন ভঙ্গিতে বা অভ্যাসে তারা তাদের গ্রামের ভাষায় কিছু কথা বলে, তাদের গ্রামের মাটি যেমন তাদের চলনও তেমন, গভীর পল্লব তুলে তারা যখন চোখ মেলে তখন বুঝতে পারে না সে চোখে কী দেখা যাবে, কত দূর পর্যন্ত দেখা যাবে, তাদের ঘুমনোর ভঙ্গিও খুব পুরনো, তারা বাচ্চাদের খুব পুরনো সুর গুনগুনিয়েই ঘুম পাড়ায় বা দুধ দেয়, তারা যেন জেনে গেছে কথা দিয়ে কিছু বোঝানো যায় না, বা যে-কথা দিয়ে কিছু বোঝানো যায়, সে-কথা তারা জানে না, তাই তারা চুপ করে গেছে।

এ সব গল্প কোনো বুর্জোয়া বিপ্লবের গল্প নয়, শিল্পবিপ্লবের গল্প নয়, ব্যক্তির বিকাশের গল্প নয়। আমাদের ভারতীয় গল্প-উপন্যাসে, বাংলা গল্প-উপন্যাসে, ইংরেজের সঙ্গে সম্বন্ধ গড়ে ওঠার যে-পর্বকে আমরা 'আধুনিক' বলি, সেই পর্বে আমাদের লেখকরা তাঁদের গল্প-উপন্যাসে এমন একটা 'দেশ' খুঁজছিলেন, যে-'দেশ' সাম্রাজ্যের ম্যাপের বাইরে, সীমাসরহদ্দেরও যেন বাইরে, সে-'দেশ'-এর ভিতর রাস্তাঘাট রেল-স্টিমার-পোস্টঅফিসের কোনো সংযোগ নেই, সে-'দেশ'-এ সাম্রাজ্য এত স্বীকৃত ব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহও নেই, সে-'দেশ'-এর নিঃসীম বিস্তারে মানুষের বেঁচে থাকার জায়গা ও কারণ কিছু কম নয় অথচ মানুষের বেঁচে-যাওয়াটা সব সময়ই যেন একটা ব্যতিক্রম। এরকমই একটা দেশ গত পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে লাতিন আমেরিকান, আফ্রিকান, অ্যাফ্রো-আমেরিকান ঔপন্যাসিকরা খুঁজছেন—সাম্রাজ্যেরই ভিতরের সেই স্মৃতি থেকে লুপ্ত, ইতিহাস থেকে লুপ্ত দেশ—মার্কোয়েজ-এর মোকান্ডো থেকে টনি মরিসনের মধ্যসমুদ্র পথ।

অভিজ্ঞতার বদল ঘটেছে। সেই বদলে যাওয়া অভিজ্ঞতা আমাদের গল্প-উপন্যাসে লেখা আছে। এখন অন্য ভাষার গল্প-উপন্যাসে লেখা হচ্ছে।

আমি এই কথাগুলি লিখতে-লিখতে কখনো কখনো এই গল্প-উপন্যাসকে সাম্রাজ্যবিরোধী বা সাম্রাজ্যনিরপেক্ষ বলেছি। এই কথাগুলি শেষ করতে গিয়ে ঐ বিশেষণগুলি আর ব্যবহার করতে মন চাইছে না। এ এমনই এক গল্প যার ওপর সাম্রাজ্যের মালিকদের কোনো দখলই ছিল না। এ গল্প তৈরি হয়েছে সাম্রাজ্য সত্ত্বেও।

১৯৯৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপক ভেঙে রূপক
বাস্তব ভেঙে বাস্তব

পুরাণ ভেঙে পুরাণ

আমাদের আলাদা কথা বলবার আছে

ঘানার লেখিকা আমা আতা আইদুকে প্রথম দেখেছিলাম তাসকেন্তে ৭৬ সালের অক্টোবরে। কী একটা সম্মিলনে আমি এখান থেকে গিয়েছিলাম, সম্মেলনের নাম ও বিষয় এখন মনে নেই। গিয়ে বুঝেছিলাম—সারা পৃথিবীর শ-শ প্রতিনিধি নিয়ে লেখার কথা তেমন কিছু হবে না, আলাপ-পরিচয় কিছুটা হবে হয়তো।

২ অক্টোবর বিকেলে আমার বক্তৃতা ছিল। আমি শুরু করেছিলাম এই বলে যে আমাদের দেশে সব রূপকথায় লোককথায় এক দুয়োরানীর গল্প আছে। সে-ই রাজার আসল রানী। কিন্তু সুয়োরানীর চক্রান্তে সে থাকে রাজ্যের সীমায়, বনের ধারে, তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে। সে আমাদের ঘুঁটে-কুড়ুনি মা। সেই মা আর সেই ছেলে শেষ পর্যন্ত সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে রাজকন্যা নিয়ে আসে আর সুয়োরানী আর রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের রাজ্য উদ্ধার করে। এই নিজের দেশের ভিতরেই রানীমা আর রাজপুত্রের নির্বাসন আর তাদের সিংহাসনে ফিরে আসা—এটাই আমাদের সব লেখার বিষয়।

কী বলেছিলাম তা এই সবিস্তারে বলার কারণ, বক্তৃতার পর আমার পাশে এসে বসল আফ্রিকার ঘানা থেকে আসা এক মেয়ে। সে বিহ্বল হয়ে বলল, 'আমার আর কিছু বলার নেই, তুমি আমার সব কথা বলে দিয়েছ।'

পরদিন, তেসরা অক্টোবর সকালে তার বক্তৃতা ছিল। সে বলল—'আমি কী বলব, আমাদের কী আছে? সাম্রাজ্যবাদ তার বিষের মতো শ্বাসে আমাদের সব পুড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের, আফ্রিকার, ভাষা হারিয়ে গেছে।' সে আফ্রিকার কোনো উপজাতীয় ভাষায় একটা কবিতার কয়েকটা চরণ বলল। 'আমাদের গান লুট হয়ে গেছে।' সে এক কলি গাইল। 'আমাদের হাত-পায়ের আদি ভঙ্গিগুলি লোপাট হয়ে গেছে।' সে এক পাক নাচল। 'আমরা আমাদের দেশে চিরনির্বাসিত। আমাদের কোনো প্রত্যাবর্তনও নেই। এই নির্বাসন ও প্রত্যাবর্তনহীনতা ছাড়া আমাদের সাহিত্যের আর কোনো বিষয় নেই, আর কোনো বিষয় থাকতে পারে না। আওয়ার প্রেফারেন্সেস আর ডিফারেন্ট।'

অসামান্য ইংরেজিতে আমা তার কথা শেষ করে, খুঁজে, আমার পাশে এসে বসল। আমি তাকে বললাম, 'এই একটি বক্তৃতার জন্যে এই সম্মেলনটা সার্থক হয়ে গেল।' আমা বলল, 'আমি তোমার রূপক ভেঙে দিলাম'—আই ব্রোক ইয়োর অ্যালিগরি—'এখন দুটো বক্তৃতা মিলে একটা অর্থ তৈরি হতে পারে'—এ মিনিং মে অকার।' সেদিন ৩৪ বছরের আমা কি লেখার সম্পূর্ণ নতুন ধরণের কথা বলতে চেয়েছিল, যার অগ্রাধিকার আলাদা, যা রূপক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেঙে দেয়, আবার রূপকের সঙ্গে মিলে একটা অন্য অর্থ তৈরি করে।

পৃথিবীর গল্প-উপন্যাসের ধরণ-ধারণ অনেকদিন হল বদলে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে—কথাটা বললে ধরেই নেওয়া যায় একটা কোনো ধরণ সারা পৃথিবীতেই এক সময় চলিত ছিল। সেটা অবিশ্যি কোনো কালেই ছিল না। এমনকী যে উনিশ শতককে ইয়োরোপীয় উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ পর্ব বলে ধরে নেওয়া যায়, সেই সময়েও ইয়োরোপের দেশে-দেশে গল্প-উপন্যাসের আকার-প্রকার পরস্পর থেকে এত বেশি স্বতন্ত্র ছিল যে এক দেশের উপন্যাসের অভিজ্ঞতা দিয়ে আর-এক দেশের গল্প-উপন্যাসকে চিনে নেওয়া যেত না। এখন এটা ভাবতে একটু অদ্ভুতই লাগে যে একই শতাব্দে, প্রায় একই সময়ে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে গল্প-উপন্যাস লিখছেন তলস্তয়, দস্তয়েভ্স্কি, স্তাঁদাল, বালজাক, ডিকেন্স। তুর্গেনিভের মতো কোনো-কোনো লেখক হয়তো ছিলেন যাঁরা নিজেদের দেশীয় ধারা থেকে, তুর্গেনিভের বেলায় শ্লাভ-সাহিত্যের ধারা, আরো নির্দিষ্টভাবে, রুশ সাহিত্যের ধারা, খানিকটা বিচ্ছিন্ন একটা ইয়োরোপীয় উপন্যাসের ধরণ কল্পনা করেছিলেন ও উপন্যাসের সে-রকম একটা প্রকৃতি নির্মাণের চেষ্টাও করেছিলেন। সে চেষ্টার ফলে তুর্গেনিভের উপন্যাসের বিশিষ্টতা তৈরি হলেও ও সে-বিশিষ্টতা আজকের পাঠকের কাছেও তাঁকে স্বতন্ত্র করে রাখলেও, ইয়োরোপীয় উপন্যাসের সে-রকম কোনো একটিমাত্র চেহারা যে তৈরি হয়ে উঠতে পারেনি, তার একটি প্রধান কারণ নিশ্চয়ই পশ্চিম ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের উপনিবেশ বিস্তারের অভিযান ও জারের রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিরোধ। তাছাড়া ধর্মীয় সংস্কৃতির দিক থেকেও পশ্চিম ও পূর্ব ইয়োরোপ আলাদা ছিল—চার্চ অব ইংল্যান্ড, রোম্যান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্ম, গ্রিক অর্থডক্স চার্চ, রাশিয়ান চার্চ, সিরিয়ান চার্চ—এদের ধর্মীয় সংস্কৃতির মধ্যে বিরোধ ছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারশীল ইয়োরোপের বহিরৈক্যে তার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অন্তর্বিবাদ প্রায় কোনো সময়েই ইতিহাস চর্চার বিষয় হয়ে ওঠেনি, এক লুথারের নেতৃত্বে জার্মান ধর্ম-সংস্কারের বিশেষ কয়েকটি উপলক্ষ ছাড়া। এমনকী ইংল্যান্ডকে মাথায় রেখে যে-একটা পশ্চিম ইয়োরোপীয় সাংস্কৃতিক ঐক্যের চেহারা বাইরের পৃথিবীর কাছে গ্রাহ্য করে তোলা হত, তাও সংস্কৃতির বাস্তব চেহারার সঙ্গে মেলে না। আমরা এখানে গল্প-উপন্যাসের কথাই বলছি। পশ্চিম ইয়োরোপ থেকে যদি জার্মানিকে বাদও রাখা যায়, তাহলেও ফরাসি ভাষায় উপন্যাসের ধারণার সঙ্গে স্পেনীয় উপন্যাসের বা পর্তুগিজ উপন্যাসের আকার-প্রকারের মিলও কোনো কালে ছিল না। আর পূর্ব ইয়োরোপের ঐতিহ্য তো ছিল সম্পূর্ণই আলাদা। সাংস্কৃতিক পূর্ব ইয়োরোপ তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সোভিয়েত উদ্ভাবন, এমনকী চেকোশ্লোভাকিয়া বা পোল্যান্ডকেও তখন ভাবা হত পূর্ব ইয়োরোপ অথচ ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ঐ অঞ্চল জার্মানির সঙ্গে মিলে তো চিরকালই তৈরি করে এসেছে মধ্য ইয়োরোপের একটি স্বতন্ত্র ধারণা।

এমনকী গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও যে ইয়োরোপে একটি কোনো শিল্পরূপ গ্রাহ্য ছিল না তা প্রকট হয়ে ওঠে তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' শেষ হওয়ার পরে (১৮৬৯)। উপন্যাস হিশেবে 'ওয়ার অ্যান্ড পিস'-এর শ্রেষ্ঠতা নিয়ে কোনো বিবাদ এখন নেই কিন্তু তার রচনাকালে এ-বইয়ের সংজ্ঞা নিয়ে নানা কথা উঠেছিল। রুশ সাহিত্যিকদের অনেকেই যেমন এই মহাগ্রন্থের বিস্তারে, গভীরতায়, উচ্চতায় ও জটিলতায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনি দুটো বড় আপত্তিও কেউ-কেউ তুলেছিলেন যে এ-রচনাকে কোনোভাবেই উপন্যাস বলা সংগত কী না, আর, তলস্তয় তখনকার রুশদেশের দাসমুক্তি, মেয়েদের ভোট, গণতন্ত্রের আন্দোলন ইত্যাদি সব জরুরি বিষয় নিয়ে উপন্যাস না লিখে লিখলেন কী না পঞ্চাশ বছরের পুরনো এক যুদ্ধ নিয়ে। এই দ্বিতীয় অভিযোগ তুলেছিলেন তলস্তয়ের যুগন্ধর সমকালীন দস্তয়েভ্স্কি। এমনকী দস্তয়েভ্স্কি এমন কথাও বলেছিলেন যে 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' নিয়ে সাহিত্যে আসা মানে একটু দেরি করে ফেলা।

একটা বই নিয়ে এ-রকম নানা কথা তো উঠতেই পারে। কিন্তু এইসব নানা কথার প্রভাবে তলস্তয় দুটো উলটো কাজ করে বসেছিলেন। তিনি 'ওয়ার অ্যান্ড পিস'-এর তৃতীয় সংস্করণে উদ্ভট সব কাটাকুটি ও অদলবদল করলেন, পরে কাউন্টেস তলস্তয় 'ওয়ার অ্যান্ড পিস'-এর মূল পাঠ পুনরুদ্ধার করে দিয়েছিলেন। আর, তলস্তয় একটা ছোট লেখা লিখলেন, 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' নিয়ে দু-একটি কথা। তাতে তিনি বললেন—উপন্যাস বলতে পশ্চিম ইয়োরোপের ধরণই কেন একমাত্র উপন্যাস বলে বিবেচিত হবে? প্রত্যেক দেশ, জাতি ও ভাষা উপন্যাসের নতুন ধরণ আবিষ্কার করতে পারে। 'ওয়ার অ্যান্ড পিস'কে যদি কারো উপন্যাস বলতে ইচ্ছে না হয় তিনি তাহলে এ-বইটিকে উপন্যাস বলবেন না। কিন্তু সাহিত্যকর্মের কোনো একটা প্রকৃতি তো এই বইটির দ্বারা তৈরি হয়েছে। তার কোনো নাম যদি তৈরি না হয়ে থাকে তার জন্যে তো আর লেখাটি দায়ী নয়।

অর্থাৎ সেই প্রথম কথাটা উঠেছিল—উপন্যাসের কোনো একটিমাত্র প্রকৃতি পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে নেই ও উপন্যাসের একটা দেশীয় নতুন প্রকৃতি তৈরি হয়ে উঠতে পারে। আর এ-কথাটা সেই প্রথম আর কেউ তোলেননি, তুলেছিলেন কাউন্ট লিও তলস্তয়। কথাটি তোলার উপলক্ষ ছিল আর-কোনো বই নয়—'ওয়ার অ্যান্ড পিস'।

আমরা এবার এই লেখাটির শুরুতে ফিরে যেতে পারি—উপন্যাস বলতে সাহিত্যের একটা কোনো রূপ সারা পৃথিবীতে এক সময় চলিত ছিল কি, আর থাকলে কেন সেই বিশেষ প্রকৃতি এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

এটা ঘটেছিল ইয়োরোপীয় দেশগুলির উপনিবেশ বিস্তারের সংগতি রেখে, বিশেষত সূর্যাস্তহীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারের মানচিত্র অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইংরেজদের বসতি সম্পূর্ণতার দিকে গেলে, অস্ট্রেলিয়ায় ইংরেজদের আর-এক উপনিবেশ গড়ে ওঠার পর, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে মার্কিন উপনিবেশের প্রসারের কালানুক্রমে ও ইয়োরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার ভাগাভাগি সম্পূর্ণ হলে। তখন পশ্চিম ইয়োরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ ইংল্যান্ডই হয়ে দাঁড়াল পশ্চিম ইয়োরোপের প্রতিনিধি। আর আমরা, উপনিবেশের লোকজন ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস পড়ে জানলাম, উপন্যাস কীভাবে এল, কবে এল, কাকে উপন্যাস বলে। মার্কস হয়তো অনেকটা যথাযথই বলেছিলেন যে ইয়োরোপীয় সভ্যতার এই ঔপনিবেশিক বিস্তারের অভিঘাত প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশকে তাদের মধ্যযুগীয় নিষ্ক্রিয়তা থেকে টেনে বের করে এনেছে। আবার মার্কস হয়তো দেখেনওনি, সাম্রাজ্যবিস্তারী শক্তি যে-মুক্তি দেয় তা আবার আর-এক ধরণের অন্ধতাও তৈরি করে। যেমন আমরা পৃথিবী বলতে জানলাম শুধু ইংল্যান্ডকে, বিশ্বসাহিত্য বলতে জানলাম শুধু ইংরেজি সাহিত্যকে, সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব বলতে জানলাম শুধু ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে প্রাচীন গ্রিসীয় ও আধুনিক ইয়োরোপীয় যেটুকু নন্দনতত্ত্ব আমাদের কাছে এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছল, সেইটুকু। ফলে, আমরা কলোনির লোকজন উপন্যাস বলতে বুঝলাম ইংরেজি উপন্যাস—ক্লাসিক বলতে স্কট আর আধুনিক বলতে কিপলিং বা তার পরে সমার সেট মম, বা আরো আধুনিক গ্রাহাম গ্রিন, বড়জোর।

কিন্তু ইয়োরোপের ভিতরে একটি ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব নির্মাণের আবেগ ও মননও সক্রিয় ছিল এনলাইটেনমেন্টের ঐতিহ্য অনুসরণ করেই, যদিও ইতিহাসের কার্যকারণের অন্যবিধ সমাবেশে এই এনলাইটেনমেন্টের ঐতিহ্যকে উপনিবেশবাদ ও পরে ইয়োরোপেরই নিজস্ব ভূখণ্ডের ফ্যাসিবাদের সঙ্গেও যুক্ত করা যায়। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে এখন আমরা যাচ্ছি না। এখানে আমরা বলতে চাই, অখণ্ড ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির ধারণা তৈরি হয়েছিল একদিক থেকে উপনিবেশিত মানুষের মধ্যে উপনিবেশকারী সাম্রাজ্য শক্তির মাধ্যমে, আর একদিকে সেই অখণ্ড ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির ধারণা ইয়োরোপের মধ্যেও তৈরি হচ্ছিল এনলাইটেনমেন্টের ঐতিহ্য থেকে। তাই, গিয়র্গ লুকাচ সারা ইয়োরোপের উপন্যাসের অভিজ্ঞতা থেকেই তৈরি করে তোলেন তাঁর 'দি থিয়োরি অব দি নভেল', বা 'দি হিস্টরিক্যাল নভেল'। লুকাচ তাঁর নন্দনতত্ত্বে সাম্রাজ্যবিস্তারী উপনিবেশবাদী ইয়োরোপীয় সমাজের উপন্যাস চর্চার সঙ্গে সাম্রাজ্যবিরোধী ইয়োরোপীয় উপন্যাসের বিরোধ প্রমাণ করেছিলেন ও উপন্যাসের এক মানবাদর্শ কল্পনা করেছিলেন—কিন্তু সেই লুকাচীয় প্রমাণ ও কল্পনাও ছিল ইয়োরোপীয় উপন্যাসের সমগ্রতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আর তার পাশাপাশিই এই তত্ত্বও প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে যে উপন্যাস ধনতান্ত্রিক সমাজের সাহিত্যিক রূপ। এই তত্ত্বকে স্বতঃসিদ্ধ করে তোলার ভিত্তি ছিল শুধু ধনতান্ত্রিক ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়, আর দুই আমেরিকার, ক্যারিবিয়ানের, আরব আফ্রিকার ও নিম্ন-সাহারা আফ্রিকার, উপসাগরীয় আফ্রিকার, পশ্চিম এশিয়ার, মধ্য এশিয়ার, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার, আদিবাসী অস্ট্রেলিয়ার ও আরো অজস্র সব অঞ্চলের আখ্যান-সাহিত্যের, মৌখিক আখ্যান-সাহিত্যের বিপুল বিস্তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা। তাই লুকাচ, বা এমনকী বহু পরবর্তী গোল্ডমানের উপন্যাসতত্ত্ব আজকের পৃথিবীর উপন্যাস সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। এখন আমরা গল্প-উপন্যাসকে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি না। উৎপাদন ব্যবস্থা নিরপেক্ষভাবে যে সংস্কৃতি একটা লোকজীবনের গভীরে ও প্রসারে প্রোথিত ও বিস্তৃত থাকে সেই সংস্কৃতিই উপন্যাসের আধার। উপন্যাসের শিল্পকর্ম ততক্ষণ পর্যন্ত কল্পনায় আসেনি, যতক্ষণ-না ব্যক্তিমানুষ মানবক্রিয়ার প্রধান পুরুষ হয়ে উঠেছে, ব্যক্তিমানুষের সেই সুতিকাগার হল ধনতন্ত্র—এমন ধারণাও আর এখন টিকে নেই। ব্যক্তি নিরপেক্ষ, শুধু সমষ্টিকে নিয়ে উপন্যাস এখনো হয়তো কোথাও লেখা হয়নি কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকায় যে-উপন্যাস প্রয়াস চলেছে তাতে ব্যক্তি বারবার সমষ্টি থেকে উত্থিত হচ্ছে সেই সমষ্টিতে ফিরে যাবার জন্যেই। সমষ্টির সর্বাধিক নায়কতা হয়তো এখনো উপন্যাস শিল্পে সর্বৈব প্রতিষ্ঠিত নয় কিন্তু হিব্রু, আরবী ভাষার উপন্যাসকর্মেও ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির সম্পর্ক বা সংঘাত আর উপন্যাসের অন্বিষ্ট নয়, উপন্যাসের আধুনিকতম উপপত্তি হচ্ছে—সমষ্টির সংকট। উপন্যাসে ব্যক্তির এই লয় ও সমবায়ের এই উত্থান ঐতিহাসিক দিক থেকে আমরা প্রথম পড়েছিলাম টমাস মানের 'জোসেফ অ্যান্ড হিজ ব্রাদার্স'-এ বা আইসল্যান্ডের ঔপন্যাসিক হ্যালডর ল্যাক্সনেস-এর 'দি ইনডিপেন্ডেন্ট পিপ্‌ল'-এ, তবু, এ-কথা সত্যি, সমবায়ের সেই প্রতিনিধিত্ব মানে বা ল্যাক্সনেসে ব্যক্তিকেই আশ্রয় করেছিল আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্পেন্তিয়ার-এর 'দি কিংডম অব দিস ওয়ার্ল্ড' (১৯৪৯) বা হুয়ান রুলফোর 'পেদ্রে পারামো' (১৯৫৫) সেই ব্যক্তি-আশ্রয়কে তুচ্ছ করে দেয়। মার্কোয়েজ-এর 'অটাম অব দি পেট্রিয়ার্ক' (১৯৭৫) বা 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ারস অব সলিচিউড'-এ (১৯৬৭) সমষ্টি তার সমস্ত জটিলতা ও গতিবেগ নিয়ে ব্যক্তিকে নিজের অন্তর্গত করে উপন্যাসের প্রধান বিষয় হিশেবে এসে গেছে। এই লেখাটির শুরুতে আমরা আবার ফিরে যাচ্ছি—গল্প-উপন্যাসের একটা নির্দিষ্ট ইয়োরোপীয় ধরণ, বা, আমরা আরো একটু নির্দিষ্ট করে বলতে পারি, ইয়োরো-মার্কিন ধরণ একমাত্র-ধরণ হিশেবে একসময় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন সেই প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ ধসে যাচ্ছে—নন্দনচিন্তার দিক থেকে ও সৃষ্টির দিক থেকে।

এটা নিশ্চয়ই একদিনে হয়নি কিন্তু কবে হয়েছে তারও দিনক্ষণ একেবারে ছকে বের করে দেওয়া যায় না, যদিও একটা ঘটনাকে খানিকটা প্রতীকী তাৎপর্য দিতে ইচ্ছে হয়। কিউবা বিপ্লবের পর দক্ষিণ আমেরিকার প্রধানতম লেখকদের একজন, আলেহো কার্পেন্তিয়ার, ঘোষণা করেছিলেন যে ১৯৫০ সালের আগে লেখা তাঁর সব উপন্যাসগুলো তিনি বাতিল করে দিচ্ছেন ও তার পর থেকে লেখা তাঁর উপন্যাসগুলোকেই কেবল তিনি স্বীকার করবেন। এ-ঘটনাটি মনে আনার সময় এই কথাগুলিও মনে রাখার মত যে কার্পেন্তিয়ার-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক রচনা 'দি কিংডম অব দিস ওয়ার্ল্ড' বেরিয়েছে সেই ৫০ সালের আগেই। এই ঘটনার প্রতীকতার প্রতি দুর্বল থেকেও বলা যায় গল্প-উপন্যাসের কেন্দ্র ইয়োরো-আমেরিকা থেকে সরে এল বোধহয় গত প্রায় চল্লিশ বছরে—১৯৫৯-এ কাস্ত্রোর কিউবা বিপ্লবের প্রায় সমকালে ও সেই সময় থেকেই আফ্রিকার উপনিবেশগুলি একে-একে মুক্ত হচ্ছে। এ-কথাও আমাদের হিশেবে রাখতে হবে যে ভিয়েতনামের অবিস্মরণীয় সংগ্রামের পর্যায়ান্তর ঘটল ষাটের দশকেই। ফরাসি ভাষার শেষ ঔপন্যাসিক রব গ্রিয়ে আর ইংরেজি ভাষার শেষ ঔপন্যাসিক সল বেলো—এই ধরণের অতিসরলীকরণে সত্য অনেকটা ব্যাহত হয় কিন্তু সত্যের অনেকটা স্পষ্টও হয়। ইয়োরোপীয় সীমান্ত থেকে ইভো আন্ডিজ বা হ্যালডর ল্যাক্সনেস অন্য ধরণের উপন্যাস লিখছিলেন তো সেই পঞ্চাশ-ষাটেই। আর টমাস মান নিজেই ভাঙছিলেন ইয়োরোপীয় উপন্যাসের কাল্পনিক ঐক্য। কিন্তু এখন আমরা প্রায় একটা ব্যূহের মতই যেন দেখতে পাই—যেখানে ইয়োরোপ ভূখণ্ডকে ঘিরে ধরেছে টার্কি, ইজরায়েল, আরব দুনিয়া, ঘানা-নাইজেরিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার গল্প-উপন্যাসের এক বিকল্প ভুবন। জাপানের ঔপন্যাসিকরা বরাবরই আলাদা ধরণের উপন্যাস লিখে আসছেন। কোয়াবাতা ও মিশিমা জাপানি উপন্যাসের নিজস্বতাকে আধুনিকতর কাল পর্যন্ত টেনে এনেছেন এবং এটাই জাপানি উপন্যাসের মৌলিক ধাঁচের গভীর জাতীয়তার এক বড় প্রমাণ যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজয় ও প্রথম আণবিক বোমা আক্রান্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও জাপানি উপন্যাস এই অন্তর্লীন বিষাদ ও গড়ন ত্যাগ করেনি। অন্য অনেক দিক থেকে জাপানের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সম্পর্ক নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। কবিতা, উপন্যাসে ও নাটকে জাপান তার নিজস্বতায় অনড়। কেনজাবুরো ওয়ে ১৯৯৪ সালে তাঁর 'পার্সোন্যাল ম্যাটার্স' উপন্যাসের জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং লেখার প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে তিনি জাপানে এখন প্রায় প্রধানতম লেখক। তাঁকেই মনে করা হয়, অন্তত পশ্চিমে, জাপানি উপন্যাসকে যিনি দ্বৈপায়নতা থেকে মুক্তি দিচ্ছেন ও তাকে মিলিয়ে দিচ্ছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ্চাত্যের উপন্যাসচর্চার ঐতিহ্যের সঙ্গে। নোবেল কমিটিও তাঁদের প্রশস্তিতে এই কথা বলেছেন। কিন্তু ওয়ে-র এই চেষ্টা জাপানে সবাই খুব ভালভাবে নিচ্ছেন না। তাঁরা অনেকেই তাঁদের নিজেদের উপন্যাস-ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে চান। এটা ঠিক রক্ষণশীলতা বা প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্ব নয়। আমাদের এই সংকলনে জাপানের যে বড় গল্পটি গৃহীত হয়েছে তাতে রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক পক্ষপাত খুব স্পষ্ট, যাকে আমরা প্রগতিচিহ্ন বলেই ধরে থাকি, কিন্তু তার বিষাদ ও আচ্ছন্নতা, তার গভীর সব অনুভবের একাকিত্ব—জাপানি উপন্যাসের নিজস্ব। জাপানি উপন্যাস যদি একটু ব্যাপকতায় গভীরতায় জানা যেত, তাহলে হয়তো আমরা দেখতাম, ইয়োরোপীয় উপন্যাসে কাফকা যে বাস্তবের চাইতেও বাস্তবকে উপন্যাসে ধরেছিলেন, জাপানি উপন্যাসে সেটাই প্রধান অবলম্বন—অবশ্যই তা কাফকার মত তথ্যনির্ভর ও অনুপুঙ্খচিহ্নিত নয়, অনেক বেশি অনুভবনির্ভর ও ইঙ্গিতময়। মার্কিন যুক্তরাষ্টের কথা একটু আলাদা। সেখানে কাল লেখকরা শাদা লেখকদের ঐতিহ্যের বিপরীত একটা ঐতিহ্য তৈরি করছেন, এমনকী ইংরেজি ভাষার গড়ন পর্যন্ত পালটে ফেলছেন। টনি মরিসন, এলিস ওয়াকার, এঞ্জেলেউ—এঁরাই মার্কিন দেশের প্রধান ঔপন্যাসিক এখন। তাই মার্কিন উপন্যাসে প্রায় একটা অন্তর্ঘাত ঘটছে।

হিব্রু ভাষায় আখ্যান সাহিত্যের ঐতিহ্য শুধু প্রাচীন নয়, তার শিকড় নেমে গেছে হিব্রুভাষীদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে। ইহুদিদের জীবনের সঙ্গে জড়িত ব্রত-পার্বণে আখ্যানের এক স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে। সেই লোক-আখ্যানের বাইরে ওল্ড টেস্টামেন্ট তালমুদ ও মিদ্রাসের মহা-আখ্যান ইহুদি জীবনকে ঘিরে রেখেছে। অথচ তার সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হয়েছে আধুনিক জীবনের সম্পূর্ণ নতুন ধরণের কাহিনী। ইহুদিজীবন অনেক বেশি রক্ষণশীল কিন্তু হিব্রু সাহিত্য সে তুলনায় অনেক বেশি আধুনিক।

ইজরায়েলের প্রচলিত ভাষা ইদ্দিশ। সেই ভাষাতেই ইহুদিদের প্রতিদিনের কাজ চলে আর হিব্রু, খানিকটা আমাদের সংস্কৃতের মতোই ব্যবহৃত হত ধর্মকর্মে। মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে মধ্যযুগে ইদ্দিশের নানা উপভাষা তৈরি হয়, বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ভাষায় প্রভাবিত হয়ে। জার্মান, হিব্রু, প্রাচীন ফ্রেঞ্চ, প্রাচীন ইতালিয়ান ও শ্লাভ ভাষাগুলি ইদ্দিশের মধ্যে অনেকটা ঢুকে গেছে। ইহুদিদের বিরুদ্ধে ইয়োরোপের সব দেশেই যে-ঘৃণা ও বিদ্বেষ একসময় ছড়িয়ে পড়েছিল তার ফলে ইদ্দিশ ভাষার সাহিত্যে খুব একটা বড় ধরণের চেষ্টা অনেকদিনই হয়নি। তাছাড়া, ইহুদিদের মধ্যেই ইদ্দিশ ভাষা সম্পর্কে ছিল এক হীনম্মন্যতা। ১৮৮৮ সালেও ইহুদি লেখক শোলেম আলেইকেম বলেছিলেন, 'এ এক ছন্নছাড়া যাযাবরের লজ্জার ভাষা। আমি অন্তত মনে করি, প্রত্যেক শিক্ষিত ইহুদির চেষ্টা করা উচিত যাতে এই কথা বলার ভাষা ধীরে-ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যায়।' আবার, একই সঙ্গে গভীর ভালবাসায় ইদ্দিশকে ইহুদিরা বলে, 'মাতৃভাষা'—মামালোশেন। নাৎসিদের আক্রমণে ইদ্দিশের প্রধান কেন্দ্রই লোপাট হয়ে গিয়েছিল হারিয়ে গিয়েছিল সে-ভাষার ঐতিহ্য। কিন্তু ইহুদিরা আবার সেই মাতৃভাষাকে আঁকড়ে ধরেছে।

ভাষার এই দীর্ণতার মধ্যে ইহুদি লেখককে লিখতে হয়। স্মুয়েল ইয়োশেফ আগনন অবিশ্যি প্রবীণ লেখক (১৮৮৮-১৯৭০)—আধুনিক হিব্রু সাহিত্যের অন্যতম প্রধান স্রষ্টা, সাহিত্যের জন্যে হিব্রু ভাষায় তিনিই নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন প্রথম। তাঁর নামের শেষ শব্দটি, আগনন, তাঁর ছদ্মনাম। হিব্রুভাষায় 'আগুনাহ' শব্দটির অর্থ প্রোষিতভর্তৃকা স্ত্রী, যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বামী কোথাও চলে গিয়েছে কিন্তু সে ফিরে আসছে না বলে স্ত্রী আবার বিয়ে করতেও পারছে না। কারণ স্বামীর মৃত্যুরও কোনো প্রমাণ তার কাছে নেই। এই আধুনিক ইহুদিই আগননের গল্প-উপন্যাসের প্রধান মানুষ—দেশহারা, ঘরহারা, চিরনির্বাসিত, নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন। সেই ইহুদি মানুষের আছে এক পারাপারহীন বিচ্ছেদবেদনা। আগননের গল্প 'ইজরায়েলের ভূমির জন্যে মাটি' মাতৃভূমিহীন এক ইহুদির প্রবাস কাহিনী। তাঁর উপন্যাস 'সমুদ্রের ভিতরে' এক অতিপ্রাকৃত দিয়ে ঘেরা কাহিনীবলয়। আর 'রাত্রির অতিথি' আধুনিক ইহুদি জীবনের শূন্যতার গল্প।

এ. বি. যোশুয়া হিব্রুভাষার সেই আধুনিক লেখক যিনি আগননের প্রাচীন বিচ্ছেদ-কাতরতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন আর দেখছেন ইহুদি জীবনের সমকালকে। তাঁর কাহিনীর প্রকরণের ভিতর তিনি বিন্যস্ত করেন এক আপাত বিশৃঙ্খলতা আর সেই বিশৃঙ্খলতার ভিতর নিহিত রাখেন কোনো এক অকথিত ঐক্যসূত্র। পাঠক সেই ঐক্যসূত্রটির কাছে পৌঁছতে না পারলে, বা, সেই ঐক্যসূত্রটিকে উদ্ধার করতে না পারলে যোশুয়ার গল্প-উপন্যাস একটু দুরূহ-ই বোধ হতে পারে। আগনন ও যোশুয়ার ভিতরে মিলের চাইতে অমিলই বেশি, তাঁদের দুজনের লেখা থেকে বরং বোঝা যায় কতটাই বদলে গেছে হিব্রু-আখ্যান। কিন্তু বিস্ময়কর মিল আছে তাঁদের প্রকরণে। সে প্রকরণ এসেছে হিব্রু পুরাণ থেকে—তাঁরা যা বলতে চান সে-কথা বলেন না, মানুষ আর ঘটনা পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যায় তখনই যখন তাঁর পরস্পরের সবচেয়ে সংলগ্ন, বাস্তব হয়ে যায় পুরাণ, পুরাণ হয়ে ওঠে বাস্তব।

আরব দেশগুলির গল্প-উপন্যাস লেখা হচ্ছে এক ভিন্ন ধরণের নিষেধের মধ্যে। বেশির ভাগ আরব দেশই ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিশেবে স্বীকার করে ও কার্যত সে সব দেশই ইসলামি রাষ্ট্র। তাতে সামাজিক আধুনিকতার গতি এমন কিছু ব্যাহত হয় না, মরুভূমির রাজপথের ওপর দিয়ে মেয়েরা বোরখা পরে মোটরবাইকও চালায়, গাড়িও চালায় কিন্তু সাহিত্য-শিল্পের ব্যাপারে রাষ্ট্র খুবই সাবধানী। বেশিরভাগ আরব দেশেই সেন্সর ব্যবস্থা বেশ কড়া। নাজিব মেহফুজ যখন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তখন ইজিপ্টে তাঁর সব বই-ই নিষিদ্ধ। মেহফুজ অবিশ্যি এক অদ্ভুত লেখক। কিংবা লেখকরা হয়তো এরকমই হন। তাঁর বই ইজিপ্টে ছাপা হয় না কিন্তু তিনি কায়রোতে তাঁর বাড়ি ছেড়ে নড়বেনও না। তিনি কোরানে বিশ্বাস করেন না, ইসলামি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না আর কায়রোতে তাঁর সেই বাড়িতে বসে-বসেই লিখবেন ইজিপ্টের জনজীবনযাত্রার বাস্তব কাহিনী। প্রকরণের কোনো বিশিষ্টতা মেহফুজের লেখার চেষ্টার অন্তর্গত নয় অথচ তাঁর এই সব উপন্যাসেই প্রামাণিক হয়ে থাকছে এখনকার ইজিপ্ট তথা আরব দুনিয়া।

আরবি সাহিত্য যদি কোনো উৎসুক পাঠক পড়তে চান তবে তাঁর পক্ষে সেই সাহিত্য সংগ্রহ খুব কঠিন কাজ। ব্যবসায়ী প্রকাশক আরব দেশগুলিতে নেই বললেই হয়, কোনো পাঠকসমাজও তৈরি হয়ে ওঠেনি। ফলে বিদেশী ভাষায় অনুবাদ খুব কম। বোধহয় ইয়ুসুফ ইদ্রিশই একমাত্র লেখক যিনি প্রকাশ্যে সেন্সরের বিরোধিতা করেছেন ও পাঠক-সমালোচকের সচেতনতার অভাবেরও নিন্দে করেছেন। এই সেন্সর যে-কাগজকে প্রকাশের অনুমতি দিয়েছে, অল-কিসসা, তাতে যে-সব গল্প-উপন্যাস বেরোয়, তা পড়লে মনে হবে আরবি সাহিত্য অন্তত একশ বছরের বাসি। সেন্সরের নিজস্ব গল্পলেখক ও উপন্যাসিকও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছেন—রাসাদ রুশদি সে-রকম একজন লেখক।

এ থেকে পরিত্রাণের পথ লেখকরাই খুঁজে বের করেছেন। লেবাননের রাজধানী বেইরুট হয়ে উঠেছে আরবি সাহিত্য চর্চার আধুনিক কেন্দ্র। সেখানে 'আল আদাব' কাগজটি আরবি সাহিত্যের অন্বেষণশীল, পরিশ্রমী ও প্রকৃত শিল্পসংজ্ঞা-সন্ধানী লেখকদের লেখা বের করছে। সে-সব লেখায় আরব সমাজের বর্তমান বাস্তব নিয়ে নানা কাহিনী বেরুচ্ছে। এ-কথাটা বিশেষ লক্ষ করার মত যে গল্প-সাহিত্যের আধুনিকতার চর্চায় যেখানে বাস্তববাদের পর্ব অতিক্রম করার অভিযান চলছে নানা দেশে নানা ভাষায় সেখানে আরবি সাহিত্যে বাস্তবতার চর্চাই হয়ে উঠেছে দায়িত্ববান লেখকদের প্রধান কর্তব্য।

কিন্তু সময়ের চাপ সেন্সরের কর্তৃত্ব সত্ত্বেও আরব লেখকরাও অস্বীকার করতে পারছেন না। আরব দুনিয়ার আকাশে বাতাসে আখ্যান ছড়িয়ে আছে—আরব্য রজনীর কাহিনীমালা থেকে শুরু করে অসংখ্য উপজাতির নিজস্ব কাহিনীপুঞ্জ। আরবি গল্পে সিন্দবাদের কাহিনী নতুন নতুন অর্থ নিয়ে এখন ফিরে-ফিরে আসছে। সিন্দবাদের এই পুনরাগমন সবচেয়ে উল্লেখনীয়ভাবে ঘটেছে নাজিব মেহফুজ-এর উপন্যাস, 'লয়ালি আল্‌ফ লায়লা', 'আরব্য রজনীর রাত্রি'-তে। এটা বেরিয়েছিল ১৯৭৯-তে। যে সরল আখ্যানভঙ্গিতে মেহফুজ অভ্যস্ত তা থেকে তিনি এ উপন্যাসে সরে এসেছেন। এ উপন্যাসে সিন্দবাদের ভূমিকা প্রধান, সিন্দবাদই কাহিনী বুনে যায় আর কাহিনীর দৃষ্টিক্ষেত্র বদলে-বদলে দেয়। প্রতিষ্ঠান আর জনসাধারণের ভিতর প্রত্যাশা আর বাস্তবের যে বিরোধ আরব জগতের প্রধান সামাজিক বিষয় হয়ে উঠেছে, সিন্দবাদ তারই আধারচরিত্র হিশেবে গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও কবিদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে।

সিন্দবাদের মতোই 'আরব্য রজনী' থেকে শাহারজাদও আধুনিক গল্প-উপন্যাসে নতুন ভাবে এসে পড়েছেন। শাহারজাদ হয়ে উঠেছেন বেঁচে থাকার আর ফিরে আসার অনন্ত মানবিক আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এরকমই ফিরে এসেছেন আরবি কৃষকদের লোককথার নায়ক আবু-জইদ তাঁর অসামান্য শৌর্য, আক্কেলজ্ঞান আর সৌদি আরব থেকে মরক্কো পর্যন্ত তাঁর অবিশ্রান্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত নিয়ে। আবু-জইদ বস্তুত সিন্দবাদ ও শাহারজাদের মত আন্তর্জাতিক নন, অনেক বেশি আরবি, আরব দেশগুলির বাইরে প্রায় অচেনা কিন্তু সমস্ত আরব দেশের সব রকম মানুষজনের সবচেয়ে পরিচিত।

আফ্রিকাতে গল্প-উপন্যাস লেখার একটা উৎসব লেগেই আছে যেন প্রায় চল্লিশ বছর হল। তার একটা কারণ হয়তো, নাই জরিয়া থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত ইংরেজি ভাষার একমাত্র প্রাধান্য। আবার, সেখানেই হয়তো আফ্রিকার লেখকদের মধ্যে এক বিচ্ছিন্নতার বিষাদ ছড়িয়ে আছে, সেই বিষাদের সঙ্গে মিশে আছে দ্বন্দ্বও। একটা সম্পূর্ণ মহাদেশ তার মাতৃভাষা হারিয়ে ফেলেছে অথচ মাতৃভাষাহীন এক আধুনিকতার চেতনায় উত্তরিত হয়েছে। মাতৃভাষা হয়তো এখন তাদের অবশেষ নিয়ে টিকে আছে জনগোষ্ঠীর নিভৃততম আবাসভূমিগুলিতে। সেই মাতৃভাষার সঙ্গে আফ্রিকার আধুনিক লেখক তাঁর চেতনার সেতু স্থাপন করতে পারেন না। ঙগি ওয়া থিয়োঙ্গো একবার আর্তনাদ করেছিলেন, তাঁর লিখবার কোনো ভাষা নেই।

অথচ এই চল্লিশ বছরেই আফ্রিকায় ইংরেজিতে যে গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে সেই নতুন আফ্রিকাগদ্যের শিল্পতুঙ্গতা, বাস্তবের প্রাবল্য আর ভাষার বস্তুক্ষমতা ও প্রতীকশক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প-উপন্যাসের ইয়োরোপ কেন্দ্রিকতাকে তছনছ করে দিয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার গল্প-উপন্যাসে মহাদেশীয় ঐক্যের চাইতে স্থানিকতাই প্রধান। অথচ দক্ষিণ আমেরিকায় তো আফ্রিকার মতই একটি মহাদেশীয় বাস্তবতা খুব চাক্ষুষভাবেই বর্তমান। সাহিত্যে ব্যক্তিলেখকদের মধ্যে কোনো তুলনা চলে না, দু-একটি প্রসঙ্গ স্পষ্ট করে তোলার প্রত্যক্ষ প্রয়োজন ছাড়া। মার্কোয়েজ, ফুয়েন্তেস, কোর্তাজার, ঝোসা, বোর্হেস, রুলফো ও সবার ওপরে কার্পেন্তিয়ার-এর রচনায় গল্প-উপন্যাসের রূপ ও সত্তার এক অপরিবর্তনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে। বলা যায়, গল্প-উপন্যাসে একুশ শতক শুরু হয়ে গেছে। সেই দীর্ঘ একুশ শতকের সূচনায় আফ্রিকার সেমবেনে ওসমান, সোই ওয়িঙ্কা, ঙগি ওয়া থিয়োঙ্গো, তাবান লো লিয়ং, নাদাইন গর্ডাইমার, তায়েব সালি, চিনুয়া আচেবে, ডোরিস লেসিং, বেন ওকরি বাস্তবতার এক অভূতপূর্ব বিন্যাস আবিষ্কার করেছেন। একটি কথা এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যানের দায়িত্ব এড়িয়ে, সে-দায়িত্ব না-হয় পৃথক কোনো উপলক্ষে নির্বাহ করা যাবে, এখানে শুধু মন্তব্য হিশেবেই বলে রাখা যায়—দক্ষিণ আমেরিকার আখ্যানসাহিত্যে, বিশেষত মার্কোয়েজ-এ, পুরাণ সৃষ্টির কবিতাময় যে-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়, তাতে, সেই পুরাণের বাস্তব ভিত্তি সব সময় খুব স্পষ্টতায় নির্দেশিত হয় না। ফলে, সে-রচনায় কাহিনী অনেক সময় প্রায় মাধ্যাকর্ষণকে অস্বীকার করে উড্ডীন হতে চায়। অথচ উপনিবেশ বা প্রাক্তন উপনিবেশের যে-বিপুল ভূখণ্ডে এক বিশাল মানবসমাজের বসবাস সেখানে সাহিত্য, সে কবিতাই হোক, আর আখ্যানই হোক, আর নাটকই হোক, বাস্তবের নির্মম দলিলচিত্র রচনার দায় না মেনে পারে না। সে-দায় না মানলে উপনিবেশের মানুষকে কী দশায় দু-তিন শতক সময় কাটাতে হল, এখনো হচ্ছে, তার স্থায়ী শিল্পপ্রমাণ তৈরি করে তোলা যাবে না। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ার কোনো গল্পকার-উপন্যাসিক কলোনিয়ালিজম, উপনিবেশবাদকে, সাম্রাজ্যবাদকে, এক মুহূর্তের জন্যে ভুলে থাকলে তা শিল্পের মানবিক তাৎপর্যের কাছে অপরাধ হবে। দক্ষিণ আমেরিকার যাদু বাস্তবতায়, ম্যাজিক রিয়ালিজমে, এমনকী মার্কোয়েজ-এর লেখাতেও, কখনো-কখনো, বাস্তবতার চাইতে যাদু প্রধান হয়ে ওঠে। হুয়ান রুলফো বা কার্পেন্তিয়ার-এর রচনায় তেমন কখনো ঘটেনি। আফ্রিকার গদ্যকারদের নতুন বাস্তবচর্চা আর দক্ষিণ আমেরিকার গদ্যকারদের বাস্তবতার পুরাণচর্চা বিশ্বের নতুন গদ্যসাহিত্যে তুল্যমূল্য—ব্যক্তিগত ক্ষমতার পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে।

আফ্রিকার মহাদেশীয় জীবনের বহুবর্ণ এই লেখকদের রচনায় এক বহুবচনের উন্মোচন ঘটায়। নাইজেরিয়ার ইসলাম ধর্ম, ঘানার প্রতিহত গণতন্ত্র, ইগবো, ইয়োরুবা ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর জীবন, সোমালিয়ার গ্রাম, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য, পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় ও আরব জনগোষ্ঠী—এরা সবাই আফ্রিকার গল্প-উপন্যাসের বিষয়। আফ্রিকার নারী এই কথাকাহিনীতে এক নবীন প্রতীকার্থ নিয়ে হাজির হচ্ছে—অপ্রতিহতা সেই কাল নারী তার সন্তানকে ও তার সংসারকে রক্ষার জন্যে দুর্বিসহ দুঃখ বহন করে চলে, বেশির ভাগ সময়ই স্বামী নিরুদ্দিষ্ট বা জেলে, তার কোনো খবরের জন্যে সে-নারী কাতর অপেক্ষায় দিন গোনে, রাত কাটায়। সেই নারী সহ্যাতীত কষ্টের প্রতীক, অবিচার ও অত্যাচারের শিকার ও আফ্রিকার অপরাজেয় প্রাণশক্তির আধার। এই নারী আফ্রিকার নতুন কথাসাহিত্যের কেন্দ্রে আছে এক গভীরতর সভ্যতার ও নৈতিকতার নির্দেশ হিশেবে। এই নারী কখনো-কখনো গৃহ-পরিচারিকা—সেখানেও তার কঠিন শ্রম ও ধৈর্য শাদা মানুষের আলস্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের প্রতিতুলনায় অনুপুঙ্খে-অনুপুঙ্খে এক বীরত্বের কাহিনী হয়ে ওঠে, আফ্রিকায় আফ্রিকার নারী হয়ে বেঁচে থাকার বীরত্ব। আফ্রিকার নতুন গল্প-উপন্যাস এই নারীপ্রতিমাকে গড়ে তুলেছে—নারীশরীর ও নারীজীবনের এক নতুন ভাষ্যে।

খ্যাততমদের খবর তো অনেকেই জানেন—আমা আতা আইদু বা বেসি হেড আমাদের দেশে খুব বেশি চেনা নাম নয়। আমা-র জন্ম গোল্ড কোস্টে, যার নাম পরে ঘানা হয়, ১৯৪২-এ। তাঁর বয়স যখন মাত্র ২২, ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নাটক 'প্রেতের দ্বন্দ্ব' মঞ্চস্থ হয়। এই একাঙ্ক কাব্যনাট্যে অনাবাসী আফ্রিকানদের সাংস্কৃতিক সংঘাত, পুরনো পরিবার প্রথার ভাঙন, আফ্রিকার আর আমেরিকার কাল চামড়ার ভিতর পার্থক্য, বংশ-পরম্পরা তৈরি করার ধারণায় পুষ্ট সমাজে টেকনোলজির আক্রমণ—জন্ম-নিরোধক পিল—এই সব কথা এসেছিল আর আমা এই এক কাব্যনাট্যেই আফ্রিকার সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যান। কাব্যনাট্যের সংলাপের বিশেষ ধরণটির প্রতি আমা-র পক্ষপাত আছে। ৬৯-এ আমা-র দ্বিতীয় নাটক, 'আনোয়া'। ৭০-এ গল্প সংকলন, 'নো সুইটনেস হিয়ার'। ৭৭-এ তাঁর বিখ্যাত 'আওয়ার সিস্টার কিলজয়'—স্মৃতিকথা মেশানো উপন্যাস। ৮৫-তে প্রথম কবিতার বই, 'সামওয়ান টকিং টু সামটাইম', ৯২-এ দ্বিতীয় কবিতার বই, 'অ্যান অ্যাংগ্রি লেটার ইন জানুয়ারি', ১৯৯১-এ বেরিয়েছে তাঁর উপন্যাস 'চেঞ্জেস'।

আমা যে বেশি লেখেন না সেটা তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস। হয়তো একটু কমই লিখতে চান। দেশ-বিদেশে শিক্ষকতার কাজ করতে করতে হয়তো লেখার সময় পান কম। সেদিক থেকে আমা আফ্রিকার নতুন মেয়েদের সাফল্যেরই প্রতিনিধি।

আর, বেসি হেড (১৯৩৭-১৯৮৬) আফ্রিকার জটিলতার প্রতিনিধি। তাঁর মা ছিলেন খুব বড়লোক এক ইংরেজ মেয়ে। তিনি পরিবারের আস্তাবলের কাল লোকটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন ও অন্তঃসত্ত্বা হন। বাচ্চা হওয়ার আগেই তাঁর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, তাঁকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠাতে হয়। সেখানেই তাঁর এই মেয়েটি হয়। সেই নবজাতক মেয়েকে সবাই শাদা-ই ভেবেছিল, তাই তাকে এক শাদা-পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় প্রতিপালনের জন্যে। অবৈধ সন্তানদের জন্যে সে-রকম ব্যবস্থাই করা হত। কিন্তু কিছুদিন পরই পালক-পরিবারের সন্দেহ হয় তাঁর গায়ের রং নিয়ে। তাঁরা শিশুটিকে ফেরত দিলেন। তখন সেই বাচ্চাটিকে একটি 'কালার্ড' পরিবারে দেওয়া হল, অর্থাৎ সে-পরিবার শাদাও নয়, কালও নয়, ভারতীয়-চীনা-জাপানিদের মত। যখন বাচ্চাটির বয়স সাত তাঁর পালকপিতা ও গর্ভধারিণী মা দুজনেই মারা গেলেন। তাঁর তের বছর বয়সে পালক পরিবারেও আর তিনি থাকতে পারেন না, তাঁকে পাঠানো হয় একটি হোমে। সেই ত্রয়োদশী তখনো তাঁর নিজের জীবনের কথা কিছুই জানেন না, পালক পরিবারের মাকেই তাঁর নিজের মা বলে জানতেন। এক ছুটিতে বাড়ি ফেরার আয়োজন করলে সেই হোমের প্রিন্সিপ্যাল মিনিট দুয়েকের মধ্যে তাঁর সমস্ত জীবন বেসি হেডের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দেন। বেসি হেড তাঁর পালক পরিবারেও আর ফিরতে পারবেন না। নিজের সত্য পরিচয়ের নির্বাসনে বেসি হেড তাঁর পড়াশুনো শেষ করেন, চাকরি করেন, বিয়ে করেন, বিয়ে ভেঙে যায়, এক ছেলে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে প্রথমে বোতসোয়ানার সেরোওয়ে-তে, পরে ফ্রান্সিসটাউনে উদ্বাস্তু হিশেবে বসবাস করেন। পরে তিনি আবার সেরোওয়ে-তেই ফিরে আসেন। তাঁর মাত্র ৪৯ বছর বয়সের জীবনে বেসি হেড মাত্র ছটি বই ও ২৫টি গল্প লিখেছেন। তিনি যেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন সেই সেরোওয়ে-র মানুষজন, জীবনযাপন, পেশা, অর্থনীতি, সমাজ নিয়ে তিনি একাই এক প্রকল্প চালিয়ে যান। সাহারার দক্ষিণের বৃহত্তম গ্রামের সেই ইতিহাস 'সেরোওয়ে: ভিলেজ অব দি রেইন উইন্ড' (১৯৮১)। তাঁর তখনকার গল্পগুলিও তৈরি হয়ে উঠেছে সেরোওয়ে নিয়ে তাঁর প্রকল্পটির জন্যে নেওয়া অসংখ্য সাক্ষাৎকার থেকে, বুড়োদের কাছে শোনা নানা কাহিনী থেকে, নানা উপকথা থেকে।

প্রতিবাদ থেকে গল্প-উপন্যাস তৈরি হতে পারে, সরব বা নীরব প্রতিবাদ থেকে। প্রতিরোধ থেকে তো পারেই—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিরোধ থেকে। তেমনই তো হচ্ছে পূর্ব এশিয়ায়, ইহুদি সাহিত্যে, আরব জগতে, দক্ষিণ আমেরিকার বহুভাষী রচনায়। পূর্ব এশিয়া—ভিয়েতনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া—ষাটের দশকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের এক উত্তপ্ত রণক্ষেত্র ছিল। ভিয়েতনামে পৃথিবীর শক্তিমত্তম দেশের বিরুদ্ধে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দেশগুলির একটি যে-যুদ্ধ লড়েছে তা আমাদের শতাব্দীর ইতিহাসকেই নতুন এক ব্যাখ্যা দিয়েছে। তেমনি আর-এক যুদ্ধক্ষেত্র হয়েছিল ও হয়ে আছে পশ্চিম এশিয়া। একই ভূখণ্ডে ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইন দুই বিপরীত চেতনার কথা লিখছে তাদের গল্প-উপন্যাসে। বিস্ময়ের এইটিই যে শিল্পের বাস্তব, যুদ্ধের বিপরীতকে কীরকম ম্লান করে দেয়। আর প্রতিরোধের এইসব কাহিনীতে নিসর্গের একটা পৃথক ভূমিকা থাকে—পূর্ব এশিয়ার বনজঙ্গল, পাহাড়, নদীনালা আর পশ্চিম এশিয়ার মরুভূমি, ঊষরতা, সমুদ্র—এদের ছাড়া প্রতিরোধের গল্প রচিত হয় না। নিসর্গের এই এক নতুন উপস্থিতি তৈরি হল আধুনিক এইসব লেখায়। প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, জয়-পরাজয়ের ভিতর সঞ্চারিত হতে পারে জীবনযাপনের এক অপরাজেয় উল্লাস বা কৌতুক—তেমন গল্প-উপন্যাসও তো আমরা পড়ি, আফ্রিকায় লেখা, এমনকী আপারথিডের দক্ষিণ আফ্রিকায়। কিন্তু অস্তিত্বের পরিত্রাণহীনতা, যা ইতিহাসকে নিয়তির মতো দূরতিক্রম্য করে তোলে, আর এক ধরণের অন্তর্মুখী গল্প-উপন্যাস তৈরি করে তুলছে—সোভিয়েত ব্যবস্থার অবসানের আগে, মাত্র বছর ছয়েক আগেও, যে-ভূখণ্ডকে বলা হত পূর্ব ইয়োরোপ, আসলে যা মধ্য ইয়োরোপ, সেই পোল্যান্ড, হাঙ্গারি, চেকোশ্লোভাকিয়ায়, এখনকার শ্লোভাক গণতন্ত্রে, সার্বিয়ায়, ক্রোশিয়ায়। এই সেই ভূখণ্ড নাৎসিশাসন যেখানে সবচেয়ে বেশি দিন সক্রিয় ছিল, যেখানে সুন্দরতম প্রাকৃতিক নিভৃতিতে ইহুদিদের জন্যে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলি তৈরি হয়েছিল, গ্যাস চেম্বারগুলি বানানো হয়েছিল। এই সেই ভূখণ্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চার-চারটি বছরই যা সীমান্ত হিশেবে বিবেচিত হয়েছে। এই ভূখণ্ডের মানুষজন নাৎসিশাসনের ভিতর থেকে প্রতিরোধের বীরত্ব দেখিয়েছেন ও নাৎসিবাহিনীকে হারাতে হারাতে যে লালফৌজ এগিয়ে আসছিল, তার সেই সম্মুখযুদ্ধের সঙ্গে জনবিক্ষোভকে মিশিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু আধুনিক ইতিহাসে এ-সত্য নির্মম যে লালফৌজের হাতে সেদিন এ ভূখণ্ডের মুক্তি জোটেনি, যদিও নাৎসিশাসন থেকে মুক্তি ঘটেছিল। ঠাণ্ডা যুদ্ধের দ্বিখণ্ড পৃথিবীতে এই সব দেশ আর জাতি তখন যে-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল তার ভিতর অনেকখানিই ছিল বাধ্যতা। সমাজতন্ত্র এই সব দেশের ইতিহাসে অনেকখানি যেমন ছিল অনিবার্য, অনেকখানি তেমনি ছিল আরোপিত। যাঁরা সেই অনিবার্যতাকেই ইতিহাস বলে মেনে নিতে পেরেছিলেন, তাঁরা হয়তো একভাবে গড়ে তুলতেই চাইছিলেন নাৎসিবিধ্বস্ত দেশের সম্পদ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতিকে। আর যাঁরা সেই অনিবার্যতা মেনে নিতে পারেননি তাঁরা এই আরোপিত সমাজতন্ত্রকে ভাবতেন আর-এক শৃঙ্খল, আর-এক শাসন, আর-এক ভবিতব্য বলে। পোল্যান্ড, হাঙ্গারি, চেক ও শ্লোভাক গল্প-উপন্যাসে সেই বাধ্যতার কথা, সেই পরিত্রাণহীনতার কথা, সেই ভবিতব্যের কথা ফিরে-ফিরে এসেছে। সোভিয়েত ব্যবস্থার অন্তর্গত থাকার সময়ও এই সব ভাষার সাহিত্যে তা এসেছে, সোভিয়েত ব্যবস্থার অবসানের পরও কোনো উল্লাস সেখানকার গল্প-উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে না কোনো মুক্তিবোধ। এই পুরো ভূখণ্ডের গল্প-উপন্যাসের আদিপুরুষ ফ্রানৎস কাফকা। সেই আবছায়া, সেই পরিচয়হীনতা, সেই অগন্তব্য, সেই দীর্ঘ করিডর, সেই সরকারি প্রশাসন, সেই একা মানুষের নিজের কাছ থেকেও একা হয়ে যাওয়া, সেই ইতিহাসের কালানুক্রম হারিয়ে ফেলা, সেই বাঘবন্দী খেলা। কাফকা যেন এ ভূখণ্ডের গল্পকার-ঔপন্যাসিকদের কাছে এক ও একটিমাত্র, অদ্বিতীয় প্রভাব। হয়তো 'প্রভাব' কথাটি ঠিক হল না—কাফকা যে-বিবরণ শুরু করেছিলেন তাই এখনো এই ভূখণ্ডের লেখকরা লিখে চলেছেন।

তাই পোল্যান্ডের একটি গল্পে কোনো যুবক নিজের বাবার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের জীবনকে নিজের জীবনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে পারেন। আমরা বুঝতেও পারি না পিতৃকাহিনীর সঙ্গে আত্মকাহিনীর এই বিনিময় সচেতন কী না, নাকী আপতিক। এই ভূখণ্ডে-শত্রুতা-মিত্রতার ভেদ লোপ পেয়ে গেছে। একই ট্রেনের একই কামরায় একই বেঞ্চের একই গন্তব্যের দুই যাত্রী ঠোঁট খুলতে পারে না, 'আমার যদি কথা বলে উঠি, আমাদের মুখের কথায় ধরা পড়ে যাবে কে ক্রোট আর কে সার্ব, আমাদের মধ্যে শত্রু কে?' 'এমনকী ভূচিত্রও আর নিরীহ নেই।' কতটুকু দেশ বোসনিয়া? শ্লোভেনিয়া? বা ক্রোশিয়া? মহাজাতিগৌরবে অন্ধ ইয়োরোপ মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে উপ-জাতিগৌরবে আক্রান্ত? আরো কত টুকরো হবে ইয়োরোপ? এক বার্লিন দেয়াল ভেঙে দেশের ভিতর দেশ বানিয়ে কাঁটা তারের বেড়া টেনে আরো কত নতুন সীমান্ত তৈরি করা হবে।

ইয়োরোপের সেই ভিতর থেকে ভাঙনের কাহিনী লেখা হচ্ছে পোল্যান্ড, হাঙ্গারি, চেক, শ্লোভেনিয়া, ক্রোশিয়া, বসনিয়ার গল্প-উপন্যাসে।

আজকের পৃথিবীতে গল্প-উপন্যাস যাঁরা লিখছেন, তাঁদের কাছে পৃথিবীটা অনেক ছোট। দু-দুটো মহাযুদ্ধ পৃথিবীতে এক নতুন বিশ্বচেতনা তৈরি করেছে। খুব ছোট মাপে এর তুলনা হয়তো ক্রুসেডের ভিতর দিয়ে চোদ্দ শতকে তৈরি ইয়োরোপীয় চেতনা। বা, খ্রিস্টাব্দেরও আগে বৌদ্ধধর্ম প্রসারণের ভিতর দিয়ে রচিত এক এশীয় চেতনা। বা, পশ্চিম এশিয়া থেকে পশ্চিম ইয়োরোপের অংশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত প্রাক্-ক্রুসেড ইসলামি চেতনা। কিন্তু অতীতের এই সব তুলনাই আজকের বিশ্বচেতনার আয়তন ও ব্যাপকতার চেয়ে অনেক সংকীর্ণ। ভারত-আবিষ্কার বা আমেরিকা-আবিষ্কার ছিল রেনাসাঁসের নতুন সাহসী দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কীর্তি আর আজকের মানুষ ভিন্নতর সৌরলোকে তার বার্তা পাঠাচ্ছে, যদি সেখানে কোনো শ্রোতা থাকে সেই আশায়। আর, একই সঙ্গে চলছে বাংলাদেশ ও সোমালিয়ার স্থায়ী দুর্ভিক্ষ, বোসনিয়ার বীভৎস যুদ্ধ, আর পৃথিবীর বহু মেরুকতাকে বিকৃত করে এক-মেরুকতায় রূপান্তরণের সশস্ত্র ও অর্থবান যুদ্ধ ও শান্তি। আজ কোনো লেখক বা কবি শুধুমাত্র তাঁর ভাষাভাষী স্থানাঙ্কে সীমাবদ্ধ নন। বাংলা ভাষার লেখকও নন। সমগ্র ভারতের বাস্তবতা বাংলা ভাষার লেখকের বিষয়কে আকার দেয়। সমগ্র পৃথিবীর বাস্তবতা ভারতের লেখকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়কে আকার দেয়। এখন একজন লেখক শুধু সারা পৃথিবীর লেখকই হতে পারেন।

সারা পৃথিবীর লেখক হয়ে ওঠার সেই যোগ্যতা উপনিবেশের মহাদেশ তিনটির, এশিয়া-আফ্রিকা-দক্ষিণ আমেরিকার লেখকরা শতাব্দ-শতাব্দ ব্যাপ্ত দুঃখব্রতের মধ্য দিয়ে অর্জন করেছেন। আর সাম্রাজ্য বিস্তারের দাম ইয়োরোপ-আমেরিকাকে শুধতে হচ্ছে পৃথিবীকে হারিয়ে। আমেরিকার প্রধানতম লেখক যাঁরা তাঁরা তাঁদের লেখার বিষয় হিশেবে পুনরুদ্ধার করছেন আফ্রিকার স্মৃতি।

বাংলা ভাষার লেখকের গল্প-উপন্যাসে পৃথিবীর স্মৃতি-সত্তা ভবিষ্যৎ আলোড়ন জাগাক, সপ্তসমুদ্র মন্থনের আয়তন।

১৯৯৬

প্রতিক্ষণ-প্রকাশিত 'সেই মোহানার ধারে' অনুবাদ গল্প-সংকলনের ভূমিকা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোঁয়া, শোঁকা, স্বাদ, শ্বাস

১. 'পূজারী বললেন—এবার অনর্থ হয়ে গেল। সুখিয়া মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরকে ভ্রষ্ট করে এসেছে।

আর কিছু বলার দরকার হল না। কয়েকজন ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এল আর সুখিয়ার ওপর লাথি আর ঘুষি পড়তে লাগল। সুখিয়া এক হাতে বাচ্চাকে আকড়ে ধরে, অন্য হাতে তাকে রক্ষা করছিল। একের পর এক বলিষ্ঠ ঠাকুরেরা তাকে ধরে এমনভাবে টানা হ্যাঁচড়া করতে লাগল যে ছেলেটা তার হাত থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল ; কিন্তু সে কাঁদল না, কথা বলল না, নিশ্বাস নিল না। সুখিয়াও মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। কোনোরকমে সামলে উঠে যখন সে ছেলেকে তুলতে গেল তখন তার মুখের দিকে ভালো করে তাকাল। তার মনে হল সে যেন জলে ছায়া দেখছে। তার গলা দিয়ে একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল।'

২. 'জামিদ তেজি জোয়ান। ফোঁটা তিলককাটা যুবককে সে মাটিতে ফেলে দিল। সে একেবারে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ল। সে যেই পড়ল, অমনি যে-ভক্তের দল এতক্ষণ মন্দিরে বসে-বসে তামাশা দেখছিল তারা সবাই মিলে জামিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং চারদিক থেকে জামিদের ওপর মার পড়তে লাগল। জামিদ বুঝতে পারছিল না যে লোকে আমাকে মারছে কেন? কেউ কিছু জানতেও চাইছে না। ফোঁটা-তিলক কাটা যুবককে কেউ কিছু বলছে না। যে আসছে সেই দেখছি আমাকে পেটাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে একেবারে আধমরা হয়ে গেল। ...জামিদ রাতভর রাস্তার ধারে পড়ে-পড়ে কাতরাল।'

৩. 'চাঁদহীন রাতে কিছুই সেদিন অস্বাভাবিক ছিল না...। অন্য রাতগুলোর মতই গ্রামের লোকজন রাত আটটাতেই লণ্ঠন নিবিয়ে শুতে গেছে। এ গাঁওয়ে হাজার দুয়েক লোক থাকে। শোয়ার মিনিট দুয়েকের মধ্যেই দু-বছরের সুমিত্রা তার মায়ের কোলের মধ্যে ঢুকে ঘুমে কেত্‌রে পড়ল।

কিন্তু নদীর ওপারে অস্বাভাবিক কিছু ঘটছিল। বাতাসে বিপদের গন্ধ ছিল। শ-আড়াই লোক, হাতে গাঁওয়ে তৈরি দেশী বন্দুক আর ছোরা-তলোয়ার নিয়ে পাঁচ মাঝির আস্তানায় ঢুকল। তারা মাঝিদের গলার নলী কেটে তাদের নৌকো নিয়ে নদী পার হল। কোথাও কোনো আওয়াজ হয়নি—যখন সেই নদীর পাড় দিয়ে দেড় কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে সেই গ্রামটাকে ঘিরে ফেলল।

হঠাৎ সেই মধ্যরাত্রি গুলিগোলা আর মানুষের আওয়াজে ভরে গেল। ঘণ্টাখানেক গুলি চলল। ৫৯ জন মারা গেল। তার মধ্যে সুমিত্রাও ছিল, তার তলপেটে গুলি করা হয়েছিল। তার পাঁচ বছরের ভাই অরবিন্দের গুলি লেগেছে মাথায়। তার পিসি, ষোলো বছরের সীতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ে হওয়ার কথা পাঁচ দিন পর। সে মরে পড়ে ছিল।'

৪. 'মংরু কিছুক্ষণ চিন্তা করে লাঠি নিল...। সে শাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শাহেব তাকে দূর থেকে দেখামাত্র ধমকে উঠল—সেই মেয়েমানুষটা কোথায়? তুই তাকে তোর নিজের ঘরে রেখেছিস কেন?

মংরু—হুজুর, সে আমার বিয়ে করা বউ।

শাহেব—তাই বুঝি, তা অন্যটা কে?

মংরু—সে আমার আপন বোন, হুজুর।

শাহেব—আমি কিছু শুনব না। তোকে নিয়ে আসতে হবে। যে-কোনো একটাকে,

...মংরু—হুজুরের যত খুশি আমাকে মারুন, কিন্তু আমাকে এমন কাজ করতে বলবেন না, যা আমি মরে গেলেও করতে পারব না।

এজেন্ট—আমি তোকে একশো ঘা লাগাব।

...এজেন্ট নেশায় চুর হয়েছিল। সে হান্টার নিয়ে মংরুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর তাকে এলোপাথারি মারতে লাগল। মংরু দশ-বারো ঘা মুখ বুজে সহ্য করবার পর আর না পেরে কাতরাতে লাগল। তার গায়ের চামড়া ফেটে গিয়েছিল আর ফাটা চামড়ার ওপর যখন ঘা পড়তে লাগল তখন তার চুপ করে থাকার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল আর তার গলা থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে এল। তখন পর্যন্ত একশোর মধ্যে মাত্র পনেরোটা ঘা পড়েছে।

রাত দশটা বেজে গিয়েছে। চারদিক নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারে মংরুর করুণ বিলাপ কোনো পাখির বিলাপের মতো আকাশে-আকাশে ছড়িয়ে পড়ছিল। গাছের সারিগুলো হতবুদ্ধির মতো স্থির। তারা কান্নার প্রতিমূর্তি হয়ে গিয়েছিল।'

এই চারটিই হিংস্রতার কাহিনী। প্রথম তিনটিতে অনেকে মিলে একজনকে মারছে, কতজন যে মারছে তার হিশেব নেই, যদিও একটি কাহিনীতে ২৫০-সংখ্যার উল্লেখ আছে। শেষ কাহিনীতে একজনই একজনকে মারছে। সেই একজনকে 'শাহেব' বা 'এজেন্ট' বলা হয়েছে—অর্থাৎ সে-ও একটি সমষ্টিই। যাকে মারছে সে কিন্তু একা, তার নাম আছে, পরিচয় আছে—সুখিয়া, জামিদ, সুমিত্রা, অরবিন্দ, সীতা, মংরু। যারা মার খাচ্ছে, এমন এক নামহীন সমষ্টির হাতে এমন মার খাচ্ছে যার ফলে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটছে, বা ঘটতে পারে—তাদের কারো বাচ্চা আছে, কারো মা-পিসি-ভাই আছে, কারো সম্ভাব্য স্বামী আছে, কারো স্ত্রী আছে। অর্থাৎ তারা একটা জীবনযাপনের ভিতরে আছে। সমষ্টির হিংস্র আক্রমণটা ঘটছে সেই জীবনযাপনের ওপর।

কোনো প্রতিশোধের জন্যে নয়, যদিও হয়তো এই সমবেত হিংস্রতাকে যথাসম্ভব যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করতে একটা প্রতিশোধের কথা বলা হয়। সুখিয়ার বিগ্রহ ছোঁয়ার অধিকার নেই—কারণ সে নিচু জাতের। তাই উঁচু জাতের লোকরা 'প্রতিশোধ' নিচ্ছে। জামিদ একজন হিন্দু গুণ্ডাকে মেরেছে, তাই মন্দিরের অন্য হিন্দু 'প্রতিশোধ' নিচ্ছে। সুমিত্রা ও আরো ৫৮ জন একটা নিচুজাতের গাঁয়ের মানুষ, তাই উঁচুজাতের মানুষরা নদী পেরিয়ে এসে 'প্রতিশোধ' নিচ্ছে। মংরু এক কুলির সর্দার, শাহেব বা এজেন্ট তার আদেশ-অমান্যতার 'প্রতিশোধ'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচ্ছে। 'প্রতিশোধ' কোনো সমবেত হত্যাকে নৈতিক বা সামাজিক বা মানবিক সমর্থন দিতে পারে কী না সে বিষয়ে হত্যাকারীদের সমর্থনকারী কারো মনেও যুক্তিসঙ্গত সংশয় দেখা দিতে পারে বটে, কিন্তু, 'প্রতিশোধ'-এর যুক্তি কোনো-কোনো সময় কিছু ব্যবহারিক সুবিধে দিতেই পারে।

প্রেমচন্দ-এর গল্পে তিনি এই সমবেত হত্যাকারীদের এই ব্যবহারিক যুক্তিটুকু দিতে চান। দিতে চান, কারণ, গল্পকার হিশেবে, বা কথক হিশেবে, প্রেমচন্দ নিশ্চিত জানেন হত্যার পক্ষে যুক্তির এই ব্যবহারিকতার ফাঁক দিয়েই এই হত্যার সমস্ত নৈতিকতা মুঠোখোলা বালির মত ঝুরঝুরিয়ে ঝরে যাবে। সমবেত হত্যার ব্যবহারিক যুক্তিকে যত লাগসই করতে থাকেন প্রেমচন্দ, ততই তাঁর প্রায় সব গল্পে পাতালগঙ্গার মতো বহমান করুণা থেকে ঠাট্টা, বিদ্রূপ, শ্লেষ, ঘৃণা, উছলে উঠে। করুণার বহমান পাতালগঙ্গা আর উচ্ছ্রিত ঘৃণা—প্রেমচন্দ-এর গল্পের প্রধান নন্দনগুণ, এই দুটোর জোরেই তাঁর গল্প শিল্প হয়ে ওঠে। এই কথাটিকে আমরা একটু ছড়িয়ে দেখব, পরে। আপাতত, আমরা এই কথাটুকুই বলতে চাই, ব্যক্তি, পারিবারিক ব্যক্তি, সামাজিক ব্যক্তির ওপর, সামাজিক বা আর্থিক বা ধর্মীয় সমষ্টির এই হিংস্র শারীরিক আক্রমণ তাঁর গল্পের একটি স্থায়ী বিষয়। ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির হিংস্রতার কথা তিনি প্রায় বলেনই না, যদি-বা বলেন তার জন্যে তৈরি করেন ভিন্নতর এক পরিবেশ।

গল্পকার বা কথক হিশেবে তাঁর লেখার এই ঝোঁক বা মোচড় যে কতটাই প্রাসঙ্গিক তা আমাদের কাছে প্রামাণিক হয়ে ওঠে, যখন, আমি জানি, ওপরের এই চারটি উদ্ধৃতির প্রথমটি প্রেমচন্দ-এর 'মন্দির' গল্প থেকে, দ্বিতীয়টি 'হিংসা পরমো ধর্মঃ' থেকে, তৃতীয়টি প্রেমচন্দ-এর গল্প নয়—'ইন্ডিয়া টুডে'র ১৫ ডিসেম্বর ৯৭-এর সংখ্যায় ১ ডিসেম্বর রাতে লছমনপুর বাথে গ্রামে গণহত্যার রিপোর্ট, চতুর্থটি প্রেমচন্দ-এর 'শূদ্রা' গল্প থেকে—ঘটনাটি ঘটছে মরিসাস দ্বীপে। উল্লিখিত প্রথম গল্পটি লেখা ১৯২৭-এ, দ্বিতীয় গল্পটি ১৯২৬-এ, চতুর্থটি ১৯২৫-এ।

প্রেমচন্দ-এর গল্পের ভিতর লুকনো হিংস্রতার সত্যের সাক্ষী হিশেবে আমরা তাঁর তিনটি গল্পের তিনটি উদ্ধৃতির সঙ্গে 'ইন্ডিয়া টুডে'র সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টের আরভট্টুকুর বাংলা অনুবাদ মিলিয়ে দিই নি। যদিও সেটাও একটা উদ্দেশ্য হতে পারত যে বিশের দশকে লেখা গল্পগুলি এখনো সমকালীন ঘটনা। একজন লেখক, গল্পলেখক যখন তাঁর বিষয়ের কাছে পৌঁছন তখনই তাঁর লেখার কাজ শুরু হয় মাত্র। তারপর, তিনি শব্দের সঙ্গে শব্দ গেঁথে, অর্থ থেকে অর্থান্তর টেনে এনে তাকে কতদূরের ভবিষ্যতের ভিতর এক অন্তহীন শলাকার মত ঢুকিয়ে দিতে পারেন, তা নির্ভর করে গল্প লেখায় তাঁর দক্ষতার ওপর। সে-দক্ষতা গল্প-বানানোর দক্ষতা নয়। সে-দক্ষতা নির্ভর করে গল্প লেখার জন্যে তাঁর হাতে যে-উপকরণগুলি আছে, সেই উপকরণগুলির ওপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ওপর। এমনও নয় যে সেই কর্তৃত্ব অর্জনের কোনো নিশ্চিত পদ্ধতি আছে। এমনও নয় যে সেই কর্তৃত্ব একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, সব সময়ই সে-প্রতিষ্ঠা সমান ফলপ্রসূ হবে। এমনও হতে পারে যে সেই প্রতিষ্ঠাই বাধা হয়ে দাঁড়াল। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর তাঁর পুত্রকে চক্রব্যূহ থেকে বের করে আনতে তাঁর যুদ্ধবিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্ব বা তাঁর শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, গাণ্ডীব, ব্যবহার করতে পারেন নি। যুদ্ধেরই যুক্তিতে তিনি তখন যুদ্ধক্ষেত্রের এমন দূরত্বে সংগ্রামেই ব্যস্ত ছিলেন, যে-দূরত্ব পুত্রকে বাঁচাতেও পেরনো যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিপোর্টটির বাংলা অনুবাদ আমরা এমন মিলিয়ে দিয়েছিলাম এটুকু দেখতে যে ভাষার দিক থেকে, ঘটনা বলার দিক থেকে, ঘটনার কোন দিকটার ওপর জোর দেয়া হবে তা স্থির করতে, প্রেমচন্দ তাঁর সময়কে কতটাই উত্‌রে গিয়েছিলেন যে তাঁর গল্পের সমতুল্য ঘটনা এই তিনটি দিক থেকেই এখনকার একটি সাংবাদিক রিপোর্টের সঙ্গে মিলে যায়। এর বিপরীতটি কোনোদিনই সত্য হয় না। বিশের দশকে ঘটা কোনো সমষ্টির হিংস্রতার খবরের রিপোর্ট এখন, এই ১৯৯৭-এর কোনো গল্পের, বা এমনকী কাগজের রিপোর্টের ভাষার সঙ্গে কখনোই মিলবে না।

তাই, কাগজের রিপোর্ট, তাও আবার ইংরেজি রিপোর্টের বাংলা-অনুবাদের সঙ্গে প্রেমচন্দ-এর গল্পের কোনো পরিস্থিতি মিলে গেলে এমন কথা কারো মনে, ভুলভাবে হলেও, ওঠা ঠিক নয় যে সাংবাদিকতার সঙ্গে প্রেমচন্দ-এর লেখার কোনো মিল আছে। এবং, এই তুলনা থেকে আমরা প্রেমচন্দ পড়ার একটি পদ্ধতি তৈরি করতে পারি, কোন গুণে তাঁর গল্প এই এমনকী ১৯৯৭-এর সাংবাদিকতার মতই প্রাসঙ্গিক প্রস্তুত ও তৎপর থাকে।

বিষয়ে নয়, নিশ্চয়ই। অন্য সব লেখকদের গল্পের বিষয়ের মতই প্রেমচন্দ-এর গল্পও তাঁর সময়ের দ্বারা অতিমাত্রায় চিহ্নিত। যে-লেখক তাঁর নিজের সময়ের লেখক নন, তিনি কখনোই তাঁর ভবিষ্যৎ সময়ের লেখক হয়ে উঠতে পারেন না। আর বিষয়ের সঙ্গে গল্পের শিল্প হিশেবে সাময়িকতা ও সময় পেরনোর কোনো অন্যোন্য সম্পর্ক নেই। মহৎ সমকালীন বিষয় নিয়ে যেমন মহৎ গল্প লেখা হয়েছে, 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'জাগরী', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', তেমনি বিষয়ের নিহিত মহত্ত্ব সত্ত্বেও গল্প হিশেবে তা বিপর্যস্ত হয়েছে এমন উদাহরণও নেহাত কম নয়, বরং অনেক-অনেক বেশি।

ভাষায়ও নয়, নিশ্চয়ই। বাংলা গল্পের খুব ছোট ইতিহাসেও তো আমরা দেখেছি, যখনই লেখক ভেবে বসেছেন, তাঁর বেশ ভাল একটা ভাষা হাতে আছে, তখনই, সেই ভাষার চোরাবালিতে তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই কিন্তু নিশ্চিতভাবে হারিয়ে গেছেন। কোনো-কোনো সময় গল্পলেখকের একটা ভাষার ধরণ তৈরি হয়ে যেতেও পারে, অনেক সময় সেই ভাষা দিয়ে তাঁকে চিনেও নেয়া যায়, কিন্তু যখনই গল্পলেখক নিজে তাঁর ভাষা দিয়ে নিজেকে চিনে ফেলতে শুরু করেন, তখনই সর্বনাশের শুরু। আমাদের বিখ্যাত 'কল্লোলযুগ'-এর প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব যে কোনো এমন একটিও গল্প লিখে যেতে পারলেন না, যা ভবিষ্যতের সমকালীন, তার প্রধান কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই সেই ভাষাটা নিজের-নিজের মত করে আয়ত্ত করে ফেলেছেন, যে-ভাষা হল আধুনিকতম, আর ভাষাই তো ঠিক করে দেবে, কোনটা শিল্প হল আর কোনটা হল না। এই জিগির এমনই উঠেছিল যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত 'শেষের কবিতা' বা 'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলি, বা 'বাঁশরী' নাটক লিখে সেই কল্পিত আধুনিকতার সঙ্গে তাল ঠুকতে হয়েছিল। আজ কে আছেন এমন পাঠক, যিনি আধুনিকতার খোঁজে প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-অচিন্ত্যর খোঁজ করেন, তাও, এঁদের মধ্যে শিল্পের ভাষাতিরিক্ত কোনো নিরিখের আঁচে প্রেমেন্দ্র মিত্র-র কয়েকটি গল্প আধুনিক পাঠকেরও ভাল লেগে যেতে পারে। ঐ ভাল লাগা পর্যন্তই। এখন আমরা জানি, 'শেষের কবিতা', 'তিনসঙ্গী', 'বাঁশরী'-র সমকালীন বা প্রায় সমকালীন 'যোগাযোগ', 'গৃহপ্রবেশ',

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' শুধু ভাষা হিশেবেই কত আধুনিক। আজকালকার পাঠকরা শুনে কৌতুক বোধ করতে পারেন যে এমনকী প্রবোধকুমার সান্যালও এই আত্মবিশ্বাসে ভুগতেন যে তাঁরও একটা ভাষা আছে আর তাঁর সমতুল্য 'ডায়ালগ' আর-কারো নেই। ভাষার ওপর ভরসাধিক্যে সুবোধ ঘোষ বা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর আত্মলোপ তো খুবই সাম্প্রতিক ঘটনা।

গল্পকারের বাঁচার অবলম্বন তাঁর ভাষা। আর, এই ভাষাতেই তাঁর মৃত্যুও নিহিত। তাঁকে ভাষা বানাতে হয়, আর, সেই ভাষা ভুলতে হয়। গল্পকারের নিজের ভাষা না থাকলে তিনি কী করে তৈরি করে তুলবেন গল্প? আর, ভাষা যদি তাঁরই একার হয়, তাহলে কী করে লেখকের ভাষাকে পাঠক তাঁর নিজের ভাষা করে নেবেন? বাংলা গল্প-উপন্যাসের নাবালকত্ব কতদূর যে 'পথের পাঁচালী' আর 'পঞ্চগ্রাম' বেরবার পর বিভূতিভূষণ আর তারাশঙ্করকে এই সমালোচনা শুনতে হয়েছে সমকালীন গল্পকার-ঔপন্যাসিকদের কাছ থেকে যে ওঁদের নিজের একটা ভাষা তৈরি হল না।

ভাষাও যদি একজন গল্পকারকে তাঁর অনির্দিষ্ট, অভাবিত ও অনাগত ভবিষ্যতের পাঠকের অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা ও বোধের সমকালীন করে তুলতে না পারে, তাহলে কী পারে?

গল্পের বেলায় এই প্রশ্নের কোনো নিশ্চিত উত্তর নেই। গল্প বলতে এখানে ছোটগল্প-বড়গল্প-উপন্যাস-প্যারাবল-কথামৃত সব কিছুকেই বোঝানো হচ্ছে। উত্তর নেই, অথচ প্রতিটি আলাদা উপলক্ষে আমরা পৃথক উত্তর খুঁজতে, যে-উত্তর পাই তা বদলে নিতে, বাধ্য হই। গদ্য আধুনিকতম শব্দশিল্প। কবিতা যখন মানুষের সচেতন শিল্প হয়ে উঠেছে, তার আগে হাজার-হাজার বছর গেছে যখন শব্দের কোনো অর্থ ছিল না, শুধু ধ্বনি ছিল, আর সুর ছিল। সেই ধ্বনি আর সুর নিয়ে শব্দগুলো হাজার-হাজার বছর পেরনোর পর কবিরা পারলেন সেই সব শব্দের ভিতর অর্থ ভরে দিতে। কবিতার শব্দ এতই ভঙ্গুর যে অর্থের বেশি চাপ কবিতা এখনো বইতে পারে না।

গদ্যের বেলায় প্রায় তার উল্টো। গল্পেরও একটা প্রাগিতিহাস আছে। সেই প্রাগিতিহাসেও গল্প কখনো গল্প হতে পারত না, যদি-না সেই গল্পের ভিতর থেকে শেষে কোনো একটা অর্থ ঠিকরে বেরত। গল্পের সেই অর্থ তো তৈরি হবে শব্দগুলির অর্থের ওপর ভর দিয়েই। গল্পই হচ্ছে মানুষের একমাত্র শিল্প যার ভিতর দিয়ে মানুষ একটা অর্থ তৈরি করতে পারে। অথচ কেউ ঠিক জানে না, বা সে-কথা জানতে নেই, লেখকেরও জানা থাকতে নেই, পাঠকেরও জানতে-চাওয়া থাকতে নেই—কী সেই অর্থ। তেমন জানাজানি ঘটলে শিল্পের আড় ভেঙে যায়—গল্প যখন শিল্প হতে চায়, গদ্য যখন শিল্প হয়ে যায়।

তাই নন্দনতত্ত্ব সবচেয়ে অস্বস্তিতে পড়ে যখন তাকে মীমাংসা করতে হয়, এটা কি একটা গল্প হয়েছে, বা, আর যাই হোক এই লেখাটিকে কি একটা উপন্যাস বলা যায়। পৃথিবীতে এই প্রশ্ন কতবার কত লেখাকে নিয়ে উঠেছে তার এমন লিস্টি বানানো যায় যে পঞ্চাশ-একশ-দুশ-চারশ বছর টিকে থেকে সেই গল্পকে প্রমাণ করতে হয়েছে যে সেটা একটি গল্প ও গল্পই, সেটা একটি উপন্যাস ও উপন্যাসই। 'ডন কুইকজোট' ও 'ওয়ার অ্যান্ড পিস'ও এই লিস্টের মধ্যে পড়ে।

গল্পই একমাত্র অর্থ তৈরি করতে পারে বলে আর অর্থের ব্যক্তিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক নানা অন্বয় থাকে বলে, অনেক দীর্ঘ একটি অতীতকে অতিক্রম করে না এলে, ও অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরবর্তী একটি ভবিষ্যৎকে সম্বোধন না করলে, গল্প শিল্প হিশেবে তৈরিও হয়ে উঠতে পারে না, শিল্প হিশেবে গৃহীতও হয় না।

গল্পকার যে-শব্দ নিয়ে আর অর্থ দিয়ে গল্পটি লিখছেন, সেটা তো শুধু তাঁর সময়েই তৈরি হয় নি। নানা অভিজ্ঞতার স্তর, নানা মূল্যনিরূপণের স্তর, নানা শতাব্দের নানা ঘটনার অভিঘাত অর্থের স্তরের পর স্তর তৈরি করে, উচ্চারণের ভঙ্গির পর ভঙ্গি তৈরি করে। গল্পকারকে গল্প লিখতে হচ্ছে নেহাতই একটা আটপৌরে ঘটনা নিয়ে। সেই আটপৌরে দৈনন্দিনের দিকে মন দিতে তাঁর দরকার হয় শতকপুঞ্জের পরিপ্রেক্ষণ। যাকে উপন্যাস সম্পর্কে এই শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলেছেন, 'গ্রেট টাইম', বাংলায় তাকে 'মহাকাল' না বলে উপায় কী?

এই 'গ্রেট টাইম' বা মহাকালকে মনে রেখেই এই শতকের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাস-দার্শনিক বলেছিলেন, ইতিহাসের বিষয় কোনো সঙ্কট বা নাটকীয় ঘটনা নয়; অসংখ্য অনির্দিষ্ট রোজকার ঘটনা, অভ্যাস, ছন্দ সেই সব বড় সঙ্কট বা চরমবিন্দু তৈরি করে। ইতিহাস-আখ্যান তাই উপেক্ষা করে মানুষের দৈনন্দিনের সেই সব অজস্র ছোট-ছোট অভ্যাস যা বহুযুগেও বদলায় না, সেই সব অভ্যাস আর কাজকর্ম ঠিক বর্ণনাযোগ্যও নয়। তাই আমাদের তৈরি থাকতে হবে এমন ইতিহাসের জন্যে, যা সভ্যতাগুলির ইতিহাসের চাইতে অনেক অনেক শ্লথগতি। একে সেই দার্শনিক-ঐতিহাসিক ফরাসি ভাষায় বলেছেন, 'লগেঁ দুরে', তারও বাংলা করলে 'মহাকাল'ই দাঁড়ায়। তিনি এই দৈনন্দিনের ইতিহাসের এক উদাহরণ দিয়েছেন—১৫১৩ সালে আঁকা একটি ছবিতে তিনি দেখেছেন, অস্ট্রিয়ার সম্রাট ম্যাকসিমিলিয়ান হাত দিয়ে খাচ্ছেন; দুশ বছর পরে রাজকুমারী প্যালাতাঁ বলছেন, ফরাসি সম্রাট চতুর্দশ লুই যেদিন প্রথম ছেলেমেয়েদের তাঁর সঙ্গে টেবিলে বসে খাওয়ার অনুমতি দিলেন, সেদিন তাদের সাবধান করে দেন, তিনি যেভাবে হাত দিয়ে খাচ্ছেন, সে-ভাবেই ছেলেমেয়েদের খেতে হবে, তাদের গার্জেন-টিউটররা যে-কাঁটা চামচ দিয়ে খাওয়া শিখিয়েছেন, সে-ভাবে খাওয়া চলবে না। তাহলে বিখ্যাত ইয়োরোপীয় টেবিল-ম্যানার্স-এর শুরু কবে?

সেই উপন্যাস-দার্শনিকই একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'যখনই উপন্যাস নিয়ে কিছু ভাবতে হয় তখনই সাহিত্যতত্ত্বের চরম অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে যায়। ...আরিস্তোতলের নন্দনতত্ত্ব, যদিও কখনো-কখনো এতই সূক্ষ্ম যে প্রায় অদৃশ্য, সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীভাগের একটি নির্ভরযোগ্য স্থায়ী ভিত্তি। যতক্ষণ-না উপন্যাসের কথা তোলা হয়, ততক্ষণ সবই ঠিকঠাক চলে। কিন্তু গল্প-উপন্যাস ধরণের লেখার কথা উঠলেই সব তত্ত্ব কানাগলিতে গিয়ে ঠেকে। গল্প-উপন্যাসের সমস্যার মুখোমুখি হতে হলে, সাহিত্যের শ্রেণীভাগের তত্ত্বকে ঢেলে সাজাতে হবে।'

প্রতিষ্ঠিত নন্দনতত্ত্বে, সে গ্রিকই হোক আর ভারতীয়ই হোক, জানা যাবে না একটা গল্প কখন শিল্পবস্তু হয়ে উঠল। আর যেহেতু গদ্যই একমাত্র শিল্প যা অর্থনির্মাণ করে আর শব্দের অর্থ তৈরি হতে থাকে, বদলাতে থাকে, শ-শ বছর ধরে সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক এমনকী পারিবারিক সব কারণে, সেই কারণে, গল্প-উপন্যাসের শিল্পনির্ণয়ে সহজেই গল্পের বিষয়ের আলোচনা এসে যায়, সেখান থেকে আলোচনা চলে যায় সেই বিষয়ের সন্নিহিত সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিশ্লেষণে। ভাষার কিছু উদ্ভটত্ব থাকলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'স্ট্রাকচারালিজম', বা, 'পোস্টস্ট্রাকচারালিজম', বলতে আমরা যা বুঝি সেই কথাবার্তায়। একটু ডিকনস্ট্রাকশন, বা, বিনির্মাণেও। কিন্তু কোথাও সেই মূল প্রশ্নটির জবাব মেলে না—এটা প্রবন্ধ না-হয়ে গল্প হল কেন? কামুর 'আউটসাইডার' একটি উপন্যাস কেন? ও 'মিথ অব সিসিফাস' একটি উপন্যাস নয় কেন? শুধু গল্পে যা থাকে, তেমন কিছু ভঙ্গি, যেমন বর্ণনা বা সংলাপ বা চেতনাস্রোত বা আত্মচিন্তা, এই রচনাটিতে ব্যবহার করা হয়েছে বা হয় নি বলে? অথচ এই ভঙ্গিগুলির কোনো-কোনোটি থাকা সত্ত্বেও তো রবীন্দ্রনাথের 'ভানু সিংহের পত্রাবলী' বা 'পঞ্চভূত'কে কেউ গল্প বা উপন্যাস বলে ভুল করেন না। আবার, এই ভঙ্গিগুলি খুব অল্পসল্প থাকা সত্ত্বেও প্রায় কুড়ি বছর একটা জাহাজের খালাশির লেখা বলে ভুলে থাকা মার্কোয়েজ-এর 'দি স্টোরি অব এ শিপরেকড সেইলার' (১৯৫৫) রচনাটি বিশ বছর পর মার্কোয়েজ-এর একটি প্রধান উপন্যাস হিশেবে পুনর্পঠিত হতে শুরু করে—৬৭-তে 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড'-এর চোখ ধাঁধানো বিক্রির পর। আর মার্কোয়েজ-এর শেষ লেখা (১৯৯৬) 'নিউজ অব এ কিডন্যাপিং'-কে তিনি নিজে বলেছেন, এখন আর গল্প উপন্যাস লিখতে পারছি না বলে এই রিপোর্টটা লিখলাম, আর, তাঁর পাঠকরা বলছেন, সে তুমি যাই বলো-না, আমরা উপন্যাসই পড়ছি। মার্কোয়েজই অন্য এক কথায় বলেছিলেন, 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড' প্রসঙ্গে, 'আমাকে বিশ বছর কাটাতে হল আর চারটি উপন্যাসে অ্যাপ্রেনটিসশিপ করতে হল, এইটি বুঝতে...যে গল্পটা সোজাসুজি যে-গলায় আমার দাদু-দিদিমা বলতেন, সেই গলায় বলতে হবে।' আর-এক কথায় মার্কোয়েজ বলেছিলেন, 'যে-সব গল্প বহু বহু বছরের হেলাফেলা কাটিয়ে ফিরে-ফিরে মনে আসতে পারে না, সে-সব গল্পে আমার মন লাগে না।'

প্রেমচন্দ-এর তিনটি গল্পের উদ্ধৃতির সঙ্গে একেবারে হালের একটি ইংরেজি রিপোর্টের বাংলা-অনুবাদ মিশিয়ে, ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমষ্টির সন্ত্রাসের কথা একটুখানি তুলে, ইয়োরোপের দুই মনীষীর কাছে মানবিক দৈনন্দিনতার শ্লথতমগতির মধ্যে নিহিত উপন্যাস আর ইতিহাসের কথা জেনে, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকের গল্পের গর্ভধারণকাল নিয়ে মন্তব্য শুনে, আমরা এতক্ষণে এই কয়েকটি অনুমানে মাত্র পৌঁছুতে পেরেছি—১. গল্প-উপন্যাসের বিচারকাল অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের ভিতর জড়িয়ে থাকে ; ২. কোনো প্রতিষ্ঠিত নন্দনতত্ত্বে এটা জানা যায় না, একটি গল্প কখন ও কেন শিল্প হয়ে ওঠে ; ৩. প্রত্যেকটি গল্প-উপন্যাস পড়ার সময় আমাদের আলাদা-আলাদা করে বুঝে নিতে হয় সেই লেখাটি কেন একটি শিল্পবস্তুতে বদলে যাচ্ছে, কখন ও কেন সেই বদলটা ঘটছে ; ৪. একই লেখকের সব লেখায় যে এই বদল একইভাবে ঘটে তা নয় অর্থাৎ কোনো সূত্র তৈরির সুযোগ নেই ; ৫. তবু তাঁর সব লেখা মিলিয়ে সেই লেখককে বুঝে নিতে হয় ; ৬. লেখকের ভিতরে কতদিন ধরে একটি গল্প পাকতে থাকে তার কোনো হিশেব নেই।

গল্প-উপন্যাসে এমনই এক শিল্পকর্ম, যা রচনা হয়তো-বা সহজতর, তেমন সহজ বা সরল শিল্পীর কাছে, কিন্তু তার নির্মাণতত্ত্ব বা পরিণতি নিয়ে কথা বলা এক ভুলভুলাইয়ায় পথ খোঁজার মত—সেখানে সব পথই খোলা, অথচ সব পথই বন্ধ, অথচ কোনো পথই শেষ নয়, কারণ সব পথ থেকেই একাধিক বিকল্প পথান্তর আছে।

প্রেমচন্দকে পড়তে সেই ভুলভুলাইয়ার এই মাঝখানে মনে পড়ছে, এই ক-রাত আগের এক রাতের মধ্যপ্রহরে, বয়সে আমার অর্ধেক এক যুবকলেখক, কোনো এক শারদীয়তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেরনো তাঁর সবেমাত্র দ্বিতীয় উপন্যাসটি কাটাকুটি করে বই বানাতে-বানাতে ফোনে বিহ্বলস্বরে আমাকে বলেছিলেন, একটু প্রশ্নের আকারে, উনিও জানেন যে-প্রশ্নের কোনো জবাব হয় না, 'সবাইই তো আমাকে উপন্যাসটির কথা বলছেন কিন্তু কেউই তো আমাকে *উপন্যাসটির* কথা বলছেন না।' ইংরেজিতে ছাপা হলে দ্বিতীয় 'উপন্যাস'টির ইটালিকস আর-একটু স্পষ্ট হত। আমি তাঁকে একটা আত্মপরিচয় দিয়েছিলাম, এক লাইনে, উত্তরে। আমার স্বর নিশ্চয়ই মন্থর ছিল, অভিজ্ঞতায় ও রাত্রিতে। হয়তো একটু উদাসীনও ছিল—সেই মধ্যরাত্রি থেকে সেই যুবক ঔপন্যাসিককে আরো কত-কত বছর পেরতে হবে সঙ্গীহীন, পড়শিহীন সেই কথা ভেবে, যদি সে নিজেই মাঝপথে থেমে না যায়। কোনোদিন সে হয়তো এই কথাটি জানাবার সুযোগ পাবে—আমি সে-রাতে আমার গোত্রপরিচয় কী দিয়েছিলাম। আশা করি। কিন্তু সে-হয়তো তার প্রশ্নের কোনো একরকমের উত্তর এখানে খুঁজতে পারে, যখন আমরা ১৯৯৮-এ এমন এক লেখকের কয়েকটি গল্পের ভিতর দিয়ে যাব যাঁর শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছে আঠার বছর আগে।

আমরা ভারতবর্ষের এমন একজন লেখকের লেখা পড়ছি, যিনি মাত্র ৫৬ বছর বয়সে মারা গেলেও খুব অনায়াসে প্রমাণ করছেন যে তিনি আসলে তাঁর জন্মের পর ১১৮ বছর ধরে বেঁচে আছেন ও লেখা, শুধুমাত্র লেখার কারণেই তাঁর পিতৃদত্ত নাম, তাঁর খুড়োর দেয়া নাম সবই তাঁকে বদলাতে হয়েছিল। ১৯০৯ সালে 'সোজ-এ-বতন' নামে একটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশ ও সম্পাদনা করেছিলেন ধনপৎ রায় শ্রীবাস্তব। তাতে একটা গল্প লিখেছিলেন নবাব রায়। নবাব রায়-এর এই গল্পটির জন্যে ঐ বই নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হল। সম্পাদক ও প্রকাশক ধনপৎ রায় শ্রীবাস্তব বিপদে পড়লেন, কারণ নবাব রায় তাঁরই নিজের নাম, তাঁর এক কাকা আদর করে ঐ নামে তাঁকে ডাকতেন। নবাব রায় নামে তাঁর একটি ছোটগল্প, বস্তুত তাঁর প্রথম ছোটগল্প, বেরিয়ে গেছে (১৯০৭), দুটি উপন্যাসও ধারাবাহিক বেরচ্ছে ও প্রথম স্ত্রী বহাল থাকা সত্ত্বেও তিনি 'কায়স্থ বালবিধবাদের উদ্ধারের পথ' গ্রন্থের লেখক মুন্সি দেবীপ্রসাদ-এর বালবিধবা কন্যা শিবরাণী দেবীকে বিয়ে করেছেন, তখন তাঁর বয়স ২৬। মাসে ৫০ টাকা মাইনেয় হামিরপুর জিলার মাহোবাতে ডেপুটি ইনস্পেক্টর অব স্কুলস-এর চাকরিও পেয়েছেন। ৩০ বছর বয়সে যেমন ভাবে একজন উত্তরপ্রদেশী কায়স্থ নিজেকে গুছিয়ে বসতে পারেন, তাই বসেছিলেন তিনি। সেই ৩০ বছর বয়সে তাঁর নামটাই নিষিদ্ধ হয়ে গেল রাজদ্রোহিতার অপরাধে, অথচ তিনি নিজে তখনই সরকারি কর্মচারী। ১৯১০-এ মুন্সি দয়ানারায়ণের পরামর্শে তিনি প্রেমচন্দ নামে লিখতে শুরু করেন ও জীবনের বাকি ২৬ বছর সেই নামেই লিখে গেছেন। ১৯১৩ থেকে ১৫-র মধ্যে প্রেমচন্দ ধীরে-ধীরে উর্দু ছেড়ে চলে আসেন হিন্দিতে।

আমরা ভারতবর্ষের এমন একজন লেখকের লেখা পড়ছি যিনি তাঁর লেখক-নাম স্থির করেন তাঁর ৩০ বছর বয়সে আর ৩৫ বছর কেটে যায় তাঁর লেখার ভাষা স্থির করতে। অথচ তাঁর মৃত্যুর ৬২ বছর পরও তিনি শুধু উর্দু ও হিন্দি দুটি ভাষায় গল্প-উপন্যাসের প্রথম স্রষ্টা বলে তর্কাতীত স্বীকৃতই নন, তিনি এখনো এই দুই ভাষারই প্রধানতম গল্পকারদের একজন। প্রেমচন্দকে বাদ দিয়ে উর্দু-হিন্দি গল্প উপন্যাসের কোনো আধুনিকতা আলোচিতই হতে পারে না। সারা ভারতের সমস্ত ভাষা থেকেই ভাষানিরপেক্ষভাবে যদি শ্রেষ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকটিমাত্র উপন্যাস নির্বাচন করতে হয়, তাহলে সেখানে 'গোদান' থাকবেই।

এইটিই আমরা বুঝতে চাই, নান্দনিকভাবে, শুধু তাঁর গল্পগুলি দিয়ে। কোনো সামাজিক ইতিহাসের সমর্থন নিয়ে নয়, কোনো স্ট্রাকচারালিজম, পোস্টস্ট্রাকচারালিজম বা ডিকনস্ট্রাকশনের পদ্ধতি প্রয়োগের সাহায্য নিয়ে নয়, তাঁর জীবনের সঙ্গে তাঁর রচনার অদৃশ্য যোগগুলির রহস্য ব্যাখ্যা করে নয়, তখনকার হিন্দি-উর্দু সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে দাঁড় করিয়ে নয়—শুধু তাঁর গল্পগুলির ভিতর আমরা খুঁজব সেই অমরতার কোষ, যেমন চোখে দেখতে পায় না এমন কোনো প্রবীণ ছুতোর প্রাচীন কোনো আশবাবের গায়ে হাত বুলিয়ে ঠাহর করে নিতে পারে কয়েক পুরুষ আগের কোনো ওস্তাদ কারিগরের বাহাদুরি আর রঙ উঠে যাওয়া কাঠে আঙুল বুলিয়ে-বুলিয়ে হিশেব করে দুশ বছরের কোন্ সেগুন, বা চারশ বছরের কোন্ মেহগনি থেকে তৈরি হয়েছিল, এ আশবাব।

আমাদের কাজটা সেদিক থেকে একটু হাস্যকরই। যিনি নিজেকে ভারতীয় সাহিত্যে নিঃসংশয়ে অমর প্রমাণ করেছেন, আমরা বুঝতে চাইছি তাঁর অমরতা তাঁর রচনার কোন ভিতর থেকে এমন অখণ্ড হয়ে উঠছে প্রতিদিন এখনো। শিল্পে অমরতার এই একটাই অর্থ—সে-রচনা এখনো শিল্পের জন্যে আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটায় কী না ও সে-রচনা এখনো প্রতিদিন নতুন করে সঞ্জীবিত হয় কী না। অমর শিল্পের অখণ্ডতা প্রতিটি দিনে, শতকে, সহস্রকে নির্মীয়মাণ। সে-নির্মাণ কোনোদিন শেষ হয় না। শিল্পে স্বোপার্জিত ছাড়া অন্য রকমের কোনো অমরতা হয় না। যিনি নিজেই সেই অমরতা নিজের জন্যে তৈরি করে ফেলেছেন, তাঁর অমরতাকে নতুন করে বোঝার চেষ্টায় হাস্যকরতা একটু আছে বৈকী।

আবার, আমাদের কাজটা অনেকখানি আত্মপরীক্ষাও বটে। আমরা যখন তাঁর অমরতার একমাত্র উপাদান, কতকগুলি ছাপানো পৃষ্ঠার মধ্য দিয়ে যাব, তখন, তো আমাদের সামনে কোনো দিশারি নেই, যে-পথ চেনে, আসলে কোনো পথই নেই যা আমরা অনুসরণ করতে পারি। আমরা কোথায় চিনে নিতে পারি অমরতার সেই সব ছোট-ছোট লক্ষণ তা তো নির্ভর করবে, আমাদের দৃষ্টিশক্তির ওপরই শুধু নয়, দৃষ্টিপাতের শিক্ষা বা অভ্যাসের ওপরও। যেখানে চোখে দেখা যাবে না সেখানে সেই এখন-বৃদ্ধ ওস্তাদ ছুতোর যেমন তাঁর কয়েক পুরুষ আগের কোনো ওস্তাদের ওস্তাদি বুঝতে স্পর্শ করেন প্রাচীন সেই আশবাবের কাঠের আঁশ, সে-আঁশ কাঠের ভিতর থেকে বাইরে বের করে আনতে হাতের কী চাপে র‍্যাঁদা ঘষতে হয়েছিল সেই শিল্পীকে, তেমনি করে আমাদের প্রেমচন্দের রচনাগুলির শরীরে হাত বোলাতে হবে, যদি আমাদের হাতের সেই স্পর্শক্ষমতা থাকে। আমাদের গন্ধ শোঁকার শক্তিরও পরীক্ষা হবে—বেনারস থেকে লখনৌ-কানপুর-এলাহাবাদ পর্যন্ত ছোট্ট ভূখণ্ডকে প্রেমচন্দ অমরতা দিয়ে গেছেন। এখন নিশ্চয়ই সে-ভূখণ্ড বদলে গেছে, তার গঞ্জ বদলে গেছে, খেত বদলে গেছে, যানবাহন বদলে গেছে, গ্রাম বদলে গেছে, শহর বদলে গেছে। কিন্তু যা মাত্র ১১৮ বছরে বদলায় না, মাত্র ৮৬ বছরে বদলায় না, মাত্র ৬২ বছরে বদলায় না, মানুষের সেই খাওয়ার অভ্যেস, খোলা আকাশের নীচে শোয়ার ভঙ্গি, ঘরের মেয়েদের সন্দেহ করার বাই, জানোয়ারের হাত থেকে ফসল পাহারা দেয়ার আওয়াজ, মরদের ভালবাসার একরোখা জেদ, ভালবাসার মরদের জন্যে মেয়েদের ঘর ভাসানো, কুল ভাসানো, দেশ ভাসানো, গভীর রাতে নতুন তৈরি রাস্তায় নতুন বাস থেকে নেমে পুরনো অন্ধকার বা ছায়া-চাঁদনির ভিতর দিয়ে পুরুষানুক্রমিক ভূতদের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে নিজের গাঁয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছনো, মাল্টি-ন্যাশনালের চকোলেট বাজারে পৌঁছে যাওয়ার পরও পুরনো আখিগুড়ের ওপর টান। সেই চিরস্থায়িতার এই সব লক্ষণ চিনে নেয়া তো আমাদেরই আত্মপরীক্ষা।

আর যে-লেখককে আমরা পড়ছি তিনি তাঁর নিজের জীবনকে এমনই অনাটকীয় রেখেছেন, দৈনন্দিনে এমনই বাঁধা রেখেছেন যে তাঁকে ধরে খুব বেশি এগনো যায় না।

তাঁর জীবৎকালে দেশ জুড়ে যে বড়-বড় ধর্মসংস্কার আন্দোলন চলছিল, তিনি সেই সব সংস্কারের সঙ্গে বাস্তবের সংযোগ ঘটাতেন তাঁর গল্পে। গান্ধী ও তাঁর সত্যাগ্রহ, স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ-রূপান্তর, ১৯৩৬-এ প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘের প্রথম সম্মিলনে প্রেমচন্দের ভাষণ—প্রেমচন্দ সারা জীবনই এই সব নানা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। তাঁর গল্পও নিশ্চয়ই জড়িয়ে ছিল, কিন্তু আমরা পড়তে গিয়ে দেখব, প্রেমচন্দের সঙ্গে এই সব বড়-বড় ঘটনার যোগ আর তাঁর গল্পের সঙ্গে এই সব ঘটনার যোগের মাত্রা আলাদা, লয় আলাদা।

জীবনে স্বীকৃতি আর প্রতিষ্ঠা তিনি যতই পান না-কেন, নিজের জীবন কাটিয়েছেন নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থের মত। উর্দু কথাসাহিত্যের এই জনক উর্দুকে তাঁর গল্পে নবাবি দরবার থেকে নিয়ে এলেন বেনারস-লখনৌ-এলাহাবাদ এই সব পুরনো শহরের ঘিঞ্জি অলিগলিতে, বা চাষ-আবাদের খোলা মাঠে। হিন্দি কথাসাহিত্যের এই জনক হিন্দি থেকে সরিয়ে দিলেন উচ্চবর্ণের তিলকচন্দন, হিন্দিকেও নিয়ে এলেন শহরের পুরনো ভেঙে পড়া বাড়িগুলোর ভিতরে, বা চাষের খেতের আলে, বা মঠ-মন্দিরের সিঁড়িতে।

নিজের জীবন নিয়ে ঠাট্টা করে তিনি বলেছেন, 'এ একেবারে সিধেশাদা জমি, যারা চড়াই-উৎরাই ভাঙতে চান, তাঁদের কপাল চাপড়াতে হবে।' আবার বলেছেন, 'আমি তো নদীর স্রোতের পাশের শরগাছের মত, বাতাস যেদিকে হেলায় সেদিকে হেলি।' এতটাই সমতল ছিল না তাঁর জীবন। তাতে নানা ঘুরপাক ছিল। বাড়িতে অনেক দিন পরে তিনিই প্রথম ছেলে, আদরে-আব্দারে মানুষ। সাত-আট বছর বয়েসে মা মারা যান। বছরখানেকের মধ্যেই বাবা আবার বিয়ে করেন। চোদ্দ-পনের বছর বয়সে স্কুলের পরীক্ষা পাশ করে গোরখপুর থেকে বেনারসের কুইনস কলেজে পড়তে যান। বৃত্তি পান। বৃত্তির টাকা থেকে নিজের খরচ চালান, বাড়িতেও পাঠান। ১৬ বছর হতে না-হতেই তাঁকে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়—তিনি থাকেন বেনারসে আর বৌ থাকে লামাহিতে। পরে তিনি নিজের পছন্দ অনুযায়ী এক বালবিধবাকে বিয়ে করেন। বাইশ বছর স্কুল মাস্টার। হিশেবে ও পরে ইনস্পেক্টর হয়ে সরকারি কাজ করেন। গান্ধীজির ডাকে সরকারি চাকরি ছেড়ে একটা বড় প্রেস ও প্রকাশনা সংস্থার মালিক হন। বম্বেতে বছর খানেক থেকে ফিল্মের স্ক্রিপট রাইটারের কাজও করেন। তাঁর সহজ-সরল স্বভাবের ভিতর ছিল কৃষকের ধূর্ততা। শান্তশিষ্ট মানুষটি যখন হেসে উঠতেন তখন এমনই হাসতেন যেন আকাশ ভেঙে পড়বে। কোথাও একটা ঠাট্টা লুকিয়ে ছিল তাঁর মধ্যে, যা সব সময় লুকিয়ে রাখতে পারতেন না। ছাপোষা গৃহস্থ মানুষ অথচ সারা জীবনই যেন ঢুঁড়ে বেরিয়েছেন, নিজের পছন্দমত একটা ঠাঁইয়ের জন্য। দুঃখকষ্টের দিন তাঁরও ছিল, কিন্তু তিরিশ বছর বয়সে পৌঁছুবার আগেই তিনি মোটামুটি মধ্যবিত্ত জীবনে থিতু হয়ে গেছেন। একটু বানিয়েই ভাবা হয়ে থাকে যে প্রেমচন্দ খুব দুঃখকষ্টে সারা জীবন কাটিয়েছেন, যেন এই বানানো গল্পে তাঁর গল্পগুলি মহত্তরতা পাবে। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্যে যে-সম্পত্তি রেখে গেছেন, তা খুব হিশেবি না হলে রাখা যায় না। সম্পত্তি করতে তাঁর আগ্রহই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। তাঁর তৈরি সেই সম্পত্তি ছেলেদের আমলে এতই বেড়েছে, তাঁর পরিবারের লোকজন বেনারসের কাছে লামাহি গ্রামে প্রেমচন্দের পৈতৃক বাড়ি সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠানকে দিতে চাইছেন। তিনি নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল ছিলেন। অথচ নিজের একমাত্র মেয়েকে কোনো পড়াশুনো শেখান নি—গোঁড়ামি থেকে। হিন্দুসাম্প্রদায়িক আর্যসমাজের দিকে তিনি এক সময় বেশ খানিকটা ঝুঁকে ছিলেন। তারপর অবিশ্যি সারা জীবন হিন্দু-মুসলমানের একতা ও হিন্দি-উর্দুর মিলনের ওপর জোর দিয়ে গেছেন। যে-সময়টিতে তাঁকে কমিউনিস্টদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মনে করা হত ও কমিউনিস্টরা সেরকম প্রচারও করত, তিনিও তাতে আপত্তি করতেন না, সেই সময়ে লেখা তাঁর গল্প-উপন্যাসে এক নির্বেদ বাধ্যতাকে যেন তিনি স্বীকার করে নিচ্ছিলেন, 'গোদান', অথচ বিশের দশকে যখন তিনি প্রকাশ্যতই গান্ধীবাদী তখন তাঁর লেখায়, মানুষের জীবনযাপন বদলে ফেলা যাবে, এ-বিশ্বাস অনেক স্পষ্ট।

প্রেমচন্দের জীবনের এই সব সরলতা, কৌতুক, ঘোরপ্যাঁচ, নিজের কথার বিরুদ্ধে কাজ, নিজের জীবনযাপনের জেদ ও ব্যর্থতা, চাকরি করা ও ছাড়া, ব্যাবসা তৈরি করে তোলা, ক্রমেই গ্রাম থেকে শহর ও আরো শহরের দিকে চলে আসা, তার শান্ত জীবন, আর সেই আপাতশান্ত দিনযাপনে পাখি উড়ে যায় এমন অট্টহাস্য, একটু তির্যক চাউনি—এ-সব আমাদের মনে পড়বে যখন আমরা তাঁর গল্পগুলির ভিতর দিয়ে যাব। কিন্তু এগুলোকে আমরা তাঁর গল্পের ভিতর ঢুকতে দেব না। আমরা এ-কথাও মনে রাখব, শিল্পের রহস্যময় সত্য হিশেবে ও জীবনের অপার কৌতুক হিশেবে ভারতীয় গ্রামজীবনের এই অমর মানবদলিল রচয়িতা তেমন ভাবে কোনোদিন গ্রামে থাকেনই নি। ন-দশ বছর বয়স থেকে গোরখপুরে, সেখান থেকে বেনারসে, সেখান থেকে চাকরির জন্যে চুনার, বাহারাইচ, প্রতাপগড়, এলাহাবাদ, কানপুর, মাহোবা, বস্তি, লখনৌ। এ-সবই বড় বড় শহর, অন্তত জিলা-শহর। আর এও সত্য ও কৌতুক যে যিনি ভারতীয় কৃষককে কাহিনীর নায়কের মর্যাদা প্রথম দিলেন, তিনি বা তাঁর বাবা কোনো ভাবেই চাষ-আবাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, ছোট ভূস্বামী হিশেবেও না, চাষি হিশেবে তো নয়ই। তবু, এবং তবু, যমুনা-গঙ্গা-ঘাঘরা-বারগঙ্গার অববাহিকা ত্রিভুজ আজ তাঁর পাঠকের কাছে 'মুলুক-প্রেমচন্দ'। এই ভূখণ্ডের কথাও আমাদের মনে পড়বে কিন্তু আমরা যখন গল্পগুলো পড়ব তখন তার ভিতর থেকে এই ভূখণ্ডকে আর বেরতে দেব না। উত্তরে ঘাঘরা নদী, দক্ষিণে যমুনা নদী আর পুবে গঙ্গা-ঘাঘরার সঙ্গম—এই ত্রিভুজের মধ্যে পূর্ব-উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর, বস্তি, লখনৌ, প্রতাপগড়, বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর, লখনৌ-এর ভিতরই প্রেমচন্দের তিনশতাধিক গল্প ও পনেরটি উপন্যাসের ঘোরাফেরা। অথচ, কোথাও তিনি তাঁর গ্রামের অঞ্চলকে চিহ্নিত করেন না, আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেন না, এমনকী অনেক সময় সংলাপেও নয়, তেমন বড়-বড় নদী-জঙ্গলের ধারকাছ দিয়েও যান না। অথচ তাঁর মানুষরা আস্ত-আস্ত জঙ্গল, খেতি, নদী নিয়ে গল্পের ভিতর ঢুকে বসত গাড়ে।

প্রেমচন্দ-এর গল্পের শুরুতেই থাকে এক নিরবধি গল্পের সুর। যেন, এই গল্পটি অনেক আগে থেকেই বলা হয়ে আসছে, প্রেমচন্দও সেই বলায় গলা মিলিয়ে দিলেন। গল্পটা শেষ করার পর আমরা কিন্তু কখনোই আর শুরুতে ফিরে আসি না। গল্পকার হিশেবে প্রেমচন্দ শুরুতে এমন কোনো কৌতূহল উশকে দেন না যার নিরসনের জন্যে গল্পটার ভিতর আমাদের ঢুকতে হয়। কোনো কৌতূহলও নেই, কোনো নিরসনও নেই, কোনো ফিরে আসাও নেই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো মিলিয়ে নেয়াও নেই। গল্পের শুরুতে এই বয়ে আসার স্বরটা আনেন কী করে প্রেমচন্দ? তার ফলে এমন একটা মায়া তৈরি হয় আমরা যেন একটা প্রবাহের মধ্যে আছি।

'আমার ইংরেজিয়ানার ভক্ত বন্ধুরা মানুন চাই না-মানুন, আমি বলব ডাংগুলি হল সব খেলার রাজা। আজও কোথাও যদি ছেলেদের ডাংগুলি খেলতে দেখি, ইচ্ছে করে, ছুটে গিয়ে, তাদের দলে ভিড়ে যাই আর খেলা শুরু করে দিই। লনের দরকার নেই, কোর্টের দরকার নেই, নেটের দরকার নেই, ব্যাটের দরকার নেই। গাছ থেকে একটা ডাল কাটো, গুলি বানিয়ে নাও, আর যেই দুজন হয়ে গেল, খেলা শুরু করে দাও।'

(ডাংগুলি)

দুখি চামার ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল আর তার বউ ঝুরিয়া ঘরে গোবর লেপছিল। দুজনের কাজ যখন মিটল তখন চামারবউ বলল—তা গিয়ে বামুনঠাকুরকে একবার বলে এসো-না। বলা যায় না, আবার হয়তো কোথাও বেরিয়ে গেলেন।

দুখি—যাচ্ছি। কিন্তু বামুনঠাকুরকে কোথায় বসতে দিবি সেটা ভেবেছিস?

ঝুরিয়া—একটা খাটিয়া কি আর কেউ দেবে না? ঠাকুরদের বাড়ি থেকে একটা চেয়ে এনো।

(সদ্‌গতি)

পৃথিবীতে এমন কিছু লোকও আছে যারা বিশেষ কারুর চাকর না হয়েও সবার চাকর হয়, যাদের নিজেদের কোনো কাজকর্ম না থাকা সত্ত্বেও কাজের ঠেলায় তাদের দম নেয়ার ফুরসৎ থাকে না। জামিদ ছিল সেই জাতের মানুষদের একজন। একেবারে চিন্তাভাবনাহীন মানুষ, কারুর বন্ধুত্বের ধার যেমন ধারত না, তেমনি ধার ধারত না কারুর শত্রুতার। যদি কেউ একবার হেসে কথা বলল, অমনি তার বিনি পয়সার গোলাম হয়ে গেল। যত অকাজের কাজ করে সে আনন্দ পেত।

(হিংসা পরমো ধর্মঃ)

গঙ্গুকে সবাই ব্রাহ্মণ বলে জানে আর সেও নিজেকে ব্রাহ্মণ মনে করে। আমার সহিস আর চাকর আমাকে দূর থেকে সেলাম করে। গঙ্গু কখনো আমাকে সেলাম করে না। সে হয়তো আমার কাছ থেকে নমস্কার পাওয়ার আশা করে। আমার এঁটো গেলাস সে কখনো তোলে না আর আমার এতটা সাহস কখনো হয় নি যে তাকে পাখার বাতাস করতে বলি।

(শিশু)

গাঁয়ের এক ধারে এক কুঁড়ে ঘরে মা আর মেয়ে থাকে। মেয়ে বাগানের পাতা কুড়িয়ে আনে মা উনুন জ্বালে। সেটাই তাদের জীবিকা। দু-এক সের খুদকুড়ো জুটে যায়, খেয়ে দেয়ে পড়ে থাকে। মা বিধবা, মেয়ে কুমারী, সংসারে আর-কেউ নেই। মার নাম গঙ্গা, মেয়ের নাম গৌরা।

(শূদ্রা)

সেপাই তার লাল পাগড়ি নিয়ে দেমাক করে, সুন্দরী তার গয়না নিয়ে দেমাক করে, ডাক্তার তার সামনে বসা রুগিকে নিয়ে দেমাক করে আর চাষি দেমাক করে তার সামনে দুলতে থাকা ফসলের খেত নিয়ে। ঝিঙুর যখন তার আখের খেতের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকাত, তখন তার যেন কেমন নেশা লাগত।

(মুক্তিমার্গ)

এক গাঁয়ে শঙ্কর নামে এক চাষা ছিল। সে জাতে কুরমি। সাদাসিধে গরিব লোক, নিজের কাজকম্ম নিয়েই থাকত, কারুর সঙ্গে লেনদেনের ধার ধারত না।

(সোয়া সের গম)

এই উদাহরণগুলি না দিয়ে শুধু গল্পগুলি উল্লেখ করলেও হত। সবই এই সংকলন থেকে নেয়া। অন্য কোনো সংকলন থেকেও নেয়া যেত। প্রায় যে-কোনো গল্পেরই এরকম আরম্ভ, যেন একটা স্থায়িত্বের মধ্যে লেখক ঢুকে পড়েছেন। এই আরম্ভ থেকে কোনো পাঠক অনুমান করতে পারবেন না, গল্পে কিছু ঘটবে। আর, এমন আরম্ভের জন্যে একজন আধুনিক পাঠক প্রস্তুত থাকেন না। কিন্তু দুঃসাহসী এই সরলতা, এই এক স্থায়িত্বের মায়া, এই বহতা এক গল্পের মাঝখানে ঢুকে পড়া ইত্যাদি ১৯৯৮-র অপ্রস্তুত পাঠককে কেমন টলিয়ে দেয়। আর সে গল্পটার ভিতর না-ঢুকে পারে না। পৃথিবীর গল্পের ইতিহাসে এমন কথক খুব বেশি নেই, যিনি গল্পে খেই ধরেন এত নিচু স্বরে, এমন সব সাধারণের চাইতেও সাধারণ কথা বলে, যে পাঠককে কানের পেছনে হাত দিয়ে শুনতে হয়—কিছু কথা শুনতে পেল না, এমন হয় নি তো?

প্রেমচন্দকে তাই ব্যাখ্যা করা যায় না, পাঠকের তিনি এতই আয়ত্তগম্য। তিনি কোনো নিহিত অর্থের ব্যঞ্জনা আনেন না, সবটাই খুলে দেন। যে-কোনো গল্পই ঠারেঠুরে এমন ভরা আর পাঠককে এমন সচকিত করে দেয় যে মাঝখানে কোনো টীকাকারের প্রয়োজন হয় না।

প্রেমচন্দের কাছে পাঠকের এমন সহজগম্যতা একটু অন্য ধরণের। তিনি কোনো জটিলতাকে সরল করেন না, যেমন, ভাগবত পাঠকরা শ্রোতাদের জন্যে করে থাকেন, গভীর তত্ত্ব তাঁরা শ্রোতাদের সুবিধের জন্যে গল্পটল্প মিশিয়ে সোজা করে দিচ্ছেন। প্রেমচন্দ খুব গভীর জটিলতা খুব সহজভাবে বলতে পারেন। আর, পাঠককে এই সরল শুরুতে সেই স্থায়িত্বের, সেই বহমানতার কথা জানান যে তাঁর সময়ের পাঠক ও মার্কোয়েজোত্তর পাঠক সহজতায় বিহ্বল হয়ে গল্পের ভিতর ঢুকে পড়েন।

মার্কোয়েজ-এর গল্পে বেশির ভাগ সময়ই বাক্যগঠনে একজন প্রথম পুরুষ থাকে কিন্তু গল্পে প্রথম পুরুষের কোনো অর্থ থাকে না। প্রেমচন্দ-এর গল্পে বাক্যগঠনে একজন উত্তমপুরুষ থাকে কিন্তু গল্পে কখনো-কখনো সেই উত্তমপুরুষ বদলে যায় প্রথম পুরুষে, অথবা, গল্প শুরু হতে না-হতেই সেই উত্তম পুরুষ উহ্য হয়ে যায়।

এই নিচুস্বরে সহজতম কথায় যে-গল্প শুরু, তা শেষ হয় কোথায়? লেখক ততক্ষণে পাঠককে গল্পের আরম্ভ থেকে সরিয়ে আনতে পারেন। তিনি একটা সিদ্ধান্তের কথা পাঠককে জানিয়ে দেন, যা জানানোর কোনো দরকারই ছিল না, পাঠক তার চাইতে বেশি ইতিমধ্যে জেনে গেছে। তবু প্রেমচন্দ যেন সমাপ্তিসূচক মন্তব্য না-করে গল্পটা শেষ করতে পারেন না। সব সময়ই যে এমন হয়, তা নয়, কিন্তু প্রায়ই হয়। প্রেমচন্দ গল্পের একটি ব্যাকরণসম্মত অবসান ঘটান, যেন, দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ছেলেবেলা ছিল, তখন আমি তার সমকক্ষ ছিলাম। আমাদের মধ্যে কোনো ভেদ ছিল না। এই পদ পেয়ে এখন আমি কেবল তার দয়ার যোগ্য হয়েছি। সে বড় হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছে, আমি ছোট হয়ে গিয়েছি।

(ডাংগুলি)

ওদিকে জমিতে পড়ে থাকা দুখির লাশ নিয়ে শেয়াল আর শকুন, কুকুর আর কাকের কামড়াকামড়ি ছেঁড়াছিড়ি চলছিল। তাই ছিল তার আজীবন ভক্তি, সেবা আর নিষ্ঠার পুরস্কার।

(সদ্‌গতি)

মা, তুমি ধন্য! তোমার মতো নিষ্ঠা, তোমার মতো শ্রদ্ধা, তোমার মতো বিশ্বাস দেবতাদের মধ্যেও দুর্লভ।

(মন্দির)

যত তাড়াতাড়ি পারে সেই শহর থেকে পালিয়ে তার নিজের গাঁয়ে পৌঁছোতে চাইছিল, যেখানে ধর্মের নাম সহানুভূতি, প্রেম ও সৌহার্দ্য। ধর্ম আর ধার্মিক লোকদের প্রতি তার ঘৃণা এসে গিয়েছিল।

(হিংসা পরমো ধর্মঃ)

সকালে দুটো লাশ পাশাপাশি ভাসছিল। জীবনের যাত্রায় সেই সাহচর্য তারা কখনো পায় নি। স্বর্গযাত্রায় দুজনে পাশাপাশি চলেছিল।

(শূদ্রা)

পাঠক! এ কাহিনীকে কপোলকল্পিত মনে করবেন না। এ সত্য ঘটনা। এরকম বহু শঙ্কর আর বহু ব্রাহ্মণে পৃথিবী ভরে আছে।

(সোয়া সের গম)

উদাহরণ হিশেবে নয়, আমাদের বলার কথাটার প্রমাণ হিশেবে উদ্ধৃতিগুলি দেয়া হল। পাঠক যে-কোনো সংকলনে দেখে নিতে পারেন, প্রেমচন্দ উপক্রমণিকায় যেমন একটা চলমানতার মধ্যে ঠাঁই নিয়ে নেন আর যেমন একটা খোলামেলা প্রচল থেকে কথা শুরু করেন, উপসংহারে ঠিক তার উল্টো, একটা কিছু বলে গল্পটা শেষ করে দেন। খানিকটা উপদেশের মত কিছু, মন্তব্যের মত কিছু, প্রমাণের মত কিছু। তখন তেমন কোনো উপদেশ বা মন্তব্য বা প্রমাণের প্রয়োজনই আর নেই। এমনকী যেখানে কোনো ঘটনা বলা হচ্ছে, সেখানে তার একেবারে নিকেশ না হওয়া পর্যন্ত প্রেমচন্দ থামেন না—যেমন 'শূদ্রা'য় যুগল আত্মহত্যা, 'মুক্তিমার্গ'-এ দুজনেরই দুজনের পূর্বকীর্তি জেনে যাওয়া বা 'মন্দির'-এ মায়েরও মৃত্যু।

এর ভিতর, এই উপক্রমণিকা ও উপসংহারের ভিতর, গল্পটার কী ঘটে? এক-এক গল্পে এক-এক রকম ঘটে কিন্তু প্রেমচন্দ-এর বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদের প্রায় শতাধিক গল্প থেকে কি তাঁর শিল্পের সংগঠন নিয়ে কোনো অনুমান তৈরি করে তোলা যায়?

প্রেমচন্দ অমন এক সাবলীল ধারাবাহিকতার নিচু স্বরে কারো না কারো ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাই বলেন, বা, কোনো একটা নির্দিষ্ট ঘটনার কথাই বলেন, কিন্তু কী এক ধরণের স্বরক্ষেপের কাজে তিনি আমাদের একবারও ভুলতে দেন না, তিন যে-লোকদের কথা বলছেন, বা যে- ঘটনার কথা বলছেন, তাঁরা এমন হাজার-হাজার লোকেরই একজন, বা সে-ঘটনা তুলনীয় অজস্র ঘটনার একটি মাত্র। গল্পের ভিতর গল্পের এই বহুতুল্যতা তৈরি করে তোলা প্রেমচন্দের গল্পের একটা প্রধান কাজ। তিনি কিছুতেই তাঁর গল্পকে একমুখী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে তোলেন না। গল্প কিছুতেই লেখার ভিতর দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। উল্টে, লেখার ভিতর দিয়ে গল্পের শিকড় গজায়।

'সদ্‌গতি' গল্পের শেষে কি কোথাও এমন কোনো ইশারা আছে যাতে মনে হয় ঐ পণ্ডিত ঘাসিরাম-এর ব্যক্তিগত আর চরিত্রগত নিষ্ঠুরতা আর দুখি চামারের ব্যক্তিগত ও চরিত্রগত ভীতিপ্রবণতার জন্যেই ঘটনাটি এমন ঘটে গেল? প্রেমচন্দ গল্পটিকে যে-রকম একটা মন্তব্যে, অপ্রয়োজনীয় মন্তব্যে, শেষ করে দেন যে তাতে আমরা ইশারা পেয়ে যাই—এমন ঘটনা কত ঘটে! সেই শুরুতে যে-একটা দৈনন্দিনের প্রবহমাণতার ভিতর আমাদের টেনে এনেছিলেন, শেষে, সেই দৈনন্দিন প্রবহমাণতার ভিতরই আমাদের ছেড়ে দিয়ে লেখক আলাদা হয়ে যান। তাই তাঁর শেষের মন্তব্যের অপ্রয়োজনীয়তাটুকু দরকার, পাঠকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় কিন্তু লেখকের দরজা বন্ধ করে দেয়ার জন্যে দরকার। পাঠককে সেই ধারাবাহিকতা, প্রবহমাণতা, চলমানতা, দৈনন্দিন, প্রবাহ, 'লগেঁ দুরে', 'গ্রেট টাইম', মহাকালের মধ্যে ছেড়ে দেন লেখক, তার গল্পেরই সঙ্গে।

বা, 'ডাংগুলি' বা 'মুক্তিমার্গ'-এর মত দৈনন্দিনের কঠিন গল্প। হয়তো, এ-দুটি প্রেমচন্দ-এরও লেখা সবচেয়ে ভালো গল্পগুলির মধ্যে পড়ে। 'ডাংগুলি' গল্পের বিস্তার অনেকটা সময় জুড়ে। বাল্যের যে-সামাজিক একতায় চামারের ছেলের সঙ্গে অফিসারের ছেলে খেলতে পারে, তেমনি এক খেলায় বালক গয়ার ডাংগুলির খাটনি না দিয়ে অফিসারের ছেলে পালিয়েছিল। এখন অফিসারের ছেলে নিজে অফিসার হয়ে নস্টালজিয়ার তাগিদে গ্রামে ফিরে এসে কত বছরের ব্যবধান এক নির্জন মাঠে নিয়ে গিয়ে গয়ার সেই পাওনা খাটনি শোধ দিতে চায়। গয়া ইচ্ছে করে হেরে গেল। পরদিনই আর-এক ডাংগুলি খেলায় গয়ার হিংস্রতা, দক্ষতা ও নিপুণতা বুঝে ফেলে অফিসার। তারপরই আসে, শেষের ঐ অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য, যার ফাঁক দিয়ে গল্পটি আবার জীবনে ফিরে যাবে, যেখানে ছড়িয়ে আছে এমন অজস্র প্রতিশোধ আর অপার ধৈর্য। গল্প ঐ অপ্রয়োজনীয় উপসংহারটির ওপর ভর দিয়ে আবার দৈনন্দিনে, প্রাত্যহিকতায়, জীবনযাপনে, প্রবাহে, 'লগেঁ দুরে', 'গ্রেট টাইম', মহাকালে ফিরে যায়।

সভ্যতাগুলির বিকাশ আর পতন ঘটে যে-গতিতে তার চাইতে অনেক শ্লথ ও শিথিল গতিতে বদলায় ডাংগুলি খেলার হারজিত, গমের খেতের আলে ভেড়ার পাল ঢুকিয়ে দেয়ার অভ্যেস, হাতে সময় থাকলে একটু ঘাস কেটে রাখা, ভুখা বলদের জন্যে মাঝরাতে কয়েকগুছি জোয়ার বা বাজরা অন্যের খেত থেকে কেটে আনা, ব্রাহ্মণত্বের গোপন গৌরববোধ, বাৎসল্যের আবেগ, লোকের মনের অকারণ সন্দেহ ('শূদ্রা' গল্পের দ্বিতীয় প্যারা), হোলির ছুটিতে বাড়ি ফেরার অনিবার্য আবেগ, আরো এই সব। এই সব বদলায় সামুদ্রিক গ্লেসিয়ারের গতিতে। প্রেমচন্দ তাঁর গল্পে খুব তুচ্ছ ঘটনা বেছে নেন প্রায়ই, সেদিকেই তাঁর টান বেশি আর তাতে তীব্র নিখাদে যে-মোচড় ওঠে তা জোয়ারির তারে খোলে না, কিন্তু তিনি জোয়ারিতেই ফিরে আসেন, কারণ সেই তার ছাড়া তো রাগ চেনা যাবে না।

১৯০৮-১০ থেকে ১৯৩৬—এই ২৬ বছর লিখেছেন প্রেমচন্দ, ইংরেজ রাজত্বের ২৬ বছর। আর সেই বিশ্ববিস্তারী সাম্রাজ্যের একটি বিন্দুতুল্য ভূখণ্ডে তিনি সাম্রাজ্য ও তার প্রজার সম্পর্কের কোনো প্রমাণ খুঁজতে যান নি, যদিও তেমন প্রমাণ তো পাওয়াই যায় তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প-উপন্যাসে, কিন্তু তিনি প্রমাণ খোঁজেন এমন এক ভারতবর্ষের, যা এই সাম্রাজ্যের ভিতরেই অথচ বাইরে। গান্ধীজি এই ভারতবর্ষের কথা বলেছিলেন ১৯০৮ সালে তাঁর 'হিন্দ স্বরাজ'-এ—ইংরেজ তো ভারতের সীমান্তমাত্রে ঢুকেছে, আসল ভারত তো পড়ে আছে ভিতরে কোন অজ্ঞাত ভূমণ্ডলে, ইংরেজদের সাধ্য আছে সেই অন্তর্লীন ভারতবর্ষে প্রবেশ করে? রবীন্দ্রনাথ এই ভারতবর্ষের কথা বলেছিলেন বারবার, উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে—ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাবাহিকতার হাজার-হাজার বৎসরে ইংরেজের সরকার তো একশ-দেড়শ বছরের এক প্রক্ষেপমাত্র, সেই দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় এই প্রক্ষেপের কি কোনো স্থায়ী মূল্য আছে ('স্বদেশী সমাজ' ১৯০৫, 'গোরা' ১৯১০)। আর প্রেমচন্দ এই ১৯০৮-১০ থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৩৬) এই ভারতবর্ষে বেঁচে থাকার, দৈনন্দিন বেঁচে থাকার, রোজকার বেঁচে থাকার এক তালিকা তৈরি করছিলেন—গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত যে-ভারতবর্ষ সমকালীন ইতিহাসের সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও বেঁচে আছে। চিরকালীন, চিরবিস্তারী, পুনরাবৃত্ত মানুষের জীবন বছরের পর বছর পার করে দিচ্ছে—সেই ফসলের চারা রুয়ে যা তার ঠাকুরদার বাবার বাবাও রুয়ে গেছে, গম, যব, আরো কত রকমের স্থানীয় ফসল, যা এক-এক মাটিতে পরিমাণে অনেক বেশি হয়, কারণ, এই ভারতবাসীদের খিদে কখনো মেটে না। তারা তাদের বলদদুটোকে বাঁচাতে বা নিজের ভাঙা ঘরের সামনে একটা খুঁটিতে বলদ বেঁধে রেখে নিজের সম্মান বাঁচাতে জীবন পর্যন্ত দিতে পারে। তারা অজস্র ছোট-ছোট নদী আর খালে ফেরি নৌকো চালায় বা হেঁটে-সাঁতরে মধ্যরাতে সেই জল পেরিয়ে যায়। এক-একটা মানুষের স্বল্পায়ু জীবন গ্রাস করে নেয় অতীতের অভ্যাস, রীতি, বিশ্বাস, সংস্কার। এই স্থির অনড় ইতিহাসের স্তর বিরাট ও ব্যাপক, প্রায় মহাদেশ, ভারতের ৯০ শতাংশের বেশি লোক সেই ইতিহাসের মধ্যেই বাঁচে। তাদের সময়ের হিশেব মাপা হয়—নতুন বলদ কেনা দিয়ে, নতুন বাছুরের জন্ম দিয়ে (মানুষের শিশু তো জন্মায়ই কিন্তু একটা বকনা বা এঁড়ে তো পরিবারের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির নিয়ামক), বন্যায় বাড়ি ভেসে যাওয়া দিয়ে, বা ঝড়ে গ্রামের কোনো মহীরুহের পতন দিয়ে, বা কোনো বুড়ি গরুর বাচ্চা দেয়ার ক্ষমতা হারানো দিয়ে। আর, এই উচ্চাশাহীন নিত্যকর্মপদ্ধতির প্রতি আনুগত্যের ভিতর কোথায় ঢুকে যায়, মার্ক্স যাকে বলেছিলেন, কৃষকের 'বিষাদ', 'মেলানকলি'। গান্ধী যেমন ভারতবর্ষকে তত্ত্বের অনুভবে ও কর্মের বাস্তবে দেখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতবর্ষকে বোধে, অনুভবে, কল্পনায় চিনেছিলেন আর এই দুজনই যেমন সাম্রাজ্যবিরোধী সংগ্রামকে যুক্ত করতে চাইছিলেন আত্মশক্তি অর্জনের ধ্যান ও কর্মের সঙ্গে, তেমনি, প্রেমচন্দ ভারতীয় সমাজেরই আরো ভিতর থেকে গল্প খুঁড়ে আনছিলেন। তাঁর বেশির ভাগ গল্পই ভারতীয় সমাজের ভিতরের গল্প, ইংরেজশাসনের সঙ্গে বিরোধের গল্প ততটা নয়।

কিন্তু কীভাবে দেখছিলেন প্রেমচন্দ এই ভিতরের ভারতবর্ষের বহুকালব্যাপী অভ্যস্ত দৈনন্দিন। তাঁর গল্পের উপক্রমণিকা ও উপসংহারের মধ্যে এই দেখার বিবরণটুকুই থাকে। সেখানে নিরন্তর ভাঙন। যাকে হায়ারার্কি বলে, স্তর পরম্পরা, তার ভাঙন। সে-ভাঙনের মধ্যে কোনো 'বিষাদ' বা 'নস্টালজিয়া' তিনি আরোপ করেন না। সেই স্পষ্টতাতেই তাঁর আধুনিকতা। ভিতর-ভারতবর্ষে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন স্তরে স্তরপরম্পরার এই ভাঙন তিনি কীভাবে লিখেছেন, সেটা আমরা দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই বিস্তারের মধ্যে আপাতত না গিয়ে আমরা এই সংকলন থেকে একটা তালিকা তৈরি করছি, পাঠক গল্পগুলির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে সেই তালিকা মিলিয়ে পড়লে আমরা যে-কথা বলতে চাইছি তার একটা নিশানা পাবেন। এ নেহাতই এক আন্দাজি তালিকা, মাত্র ১৫টি গল্প থেকে। কখনোই যেন এ তালিকাকে বিষয়ভাগ বলে ধরে নেয়া না হয়। তাহলেই আমরা শিল্প আলোচনা থেকে সরে যাব সমাজজিজ্ঞাসার আলোচনায়।

বর্ণভেদের স্তরের মধ্যে সক্রিয়তার গল্প—সোয়া সের গম, শূদ্রা, মন্দির, সদ্‌গতি, শিশু

শাসক-শাসিতের স্তরের মধ্যে সক্রিয়তার গল্প—শূদ্রা, শিশু, ডাংগুলি

নারীপুরুষ স্তরের মধ্যে সক্রিয়তার গল্প—শূদ্রা, হিংসা পরমো ধর্মঃ, মন্দির, নতুন বিয়ে, শিশু

বৃহত্তর সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সক্রিয়তার গল্প—হিংসা পরমো ধর্মঃ, সদ্‌গতি, মন্দির, শূদ্রা, সভ্যতার রহস্য

চাষীর বা তুলনীয় জনগোষ্ঠীর নিজের মধ্যে একই স্তরে পরস্পরবিরোধী সক্রিয়তার গল্প— মুক্তিমার্গ, সদ্‌গতি, প্রেমের উদয়

এই প্রতিটি গল্পে আমরা দেখব, প্রেমচন্দ ভাঙনের গল্প লিখছেন, হায়ারার্কি ভাঙনের গল্প, স্তরপরম্পরা ভাঙনের গল্প, আত্মকলহের গল্প, বর্ণভেদ ভাঙনের গল্প। সব মিলিয়ে যে-হাজার-হাজার বছরের দৈনন্দিনে কোটি-কোটি ভারতবাসী বাঁধা তার নিঃশব্দ, নিস্তরঙ্গ, চিহ্নহীন ভাঙনের বদলের গল্প। দিশাহীন সমুদ্রে শুধু বাতাসের নিশানা থেকে যে-নাবিক তার দিক চিনে নিতে পারে, সেই-ই আসল নাবিক—আকাশের তারারা তাকে দিক চেনায়, জলের রঙ তাকে দিক চেনায়। প্রেমচন্দের গল্প ভিতর-ভারতের মানুষের সমুদ্রে শিল্পীর অভিযান। সে-অভিযানে তাঁর চোখে আধুনিক দূরবীক্ষণ নেই কিন্তু তাঁর চোখ আছে। সে-চোখ মন দিয়ে দেখে। তা দূরবীক্ষণকে ছাড়িয়ে যায়। সে-অভিযানে তাঁর হাতে কম্পাস নেই কিন্তু তাঁর পা আছে, যে-মাটি তিনি পা দিয়ে মাড়িয়েছেন, সে-মাটির স্মৃতি তাঁর স্থায়ী হয়ে যায়। তিনি কখনো, কখনোই, অতীতচারণ করেন নি, কারণ, অভিযাত্রী কখনো ফেলে আসা পথে ফেরে না। তাঁর সরল উপক্রমণিকায় আর প্রায় অপ্রয়োজনীয় উপসংহারের মাঝখানে তিনি ঢেউ ভেঙেছেন, চড়াই ভেঙেছেন, মাটি ভেঙেছেন, পাহাড় ভেঙেছেন। এই ভাঙনের ক্ষমতাই তাঁকে গল্প-উপন্যাসের অমর আধুনিক শিল্পী করে তুলেছে। তাঁর ২৫-২৭ সালে লেখা গল্প তাই আমাদের ৯৭-এর অভিজ্ঞতায় এসে ঠেকে।

আমাদের বন্ধু রণজিৎ সিংহ পুরনো প্রেমচন্দ-রসিক। তাঁর একটি বাড়তি সুবিধে আছে—তিনি হিন্দি এতই ভাল জানেন যে প্রেমচন্দকে মূলভাষায় পড়তে পারেন। এ এক দুর্লভ সুবিধে। আজ থেকে বছর পনের আগে রণজিৎ সিংহ ও কমলেশ সেন-এর সম্পাদনায় 'প্রস্তুতিপর্ব' কাগজটির প্রেমচন্দ বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছিল। তাতে প্রেমচন্দ সম্পর্কে ও তাঁর লেখা নিয়ে, খুব অর্থময় কয়েকটি লেখা বেরিয়েছিল। অথচ, মুশকিল এই জায়গায় যে তখন তাঁর লেখা ইচ্ছে করলেও বাংলায় পাওয়া যেত না। এখন অবস্থা কিছু বদলেছে। প্রিয়রঞ্জন সেন 'গোদান' উপন্যাসের অনুবাদ করেছিলেন শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা সেন-এর সঙ্গে ১৯৪৫-এ। সেই বইটি 'যুব প্রকাশনী' এখন আবার বের করেছেন। শ্রীমতী চিত্রা দেব 'গোদান'-এর একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন যোগ্য অনুবাদ করেছেন। ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট প্রেমচন্দের কয়েকটি গল্পের বাংলা অনুবাদের একটি সংকলন বের করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি প্রেমচন্দের গল্পের একটি বড় সংকলন প্রকাশ করেছেন। সাহিত্য অকাদেমি রণজিৎ সিংহ কৃত 'গোদান'-এর একটি নতুন অনুবাদ ৯৮-এর বইমেলাতেই হয়তো বের করবেন। তাঁরা 'গোদান'-এর ওপর একটি আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশেরও উদ্যোগ নিচ্ছেন। এরই মধ্যে কথায়-কথায় আমরা জানতে পারি রণজিৎ সিংহ নিজের ভালবাসার তাগিদে প্রেমচন্দ-এর বার-চোদ্দটি গল্প বহু কাল হল অনুবাদ করে রেখে দিয়েছেন। এও কি হয়? লেখা ও লেখকের ওপর এমন টান? রণজিৎ-এর সেই গোপন ভালবাসাকে এই বইয়ে প্রকাশ করে দেয়া হল। এমন একটি সংকলনের ভূমিকা লেখার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু অযোগ্যের আস্ফালন তো চিরকালের প্রবাদ। অন্ধই পূর্ণিমার চাঁদনি দেখতে চায়।

প্রেমচন্দের সঙ্গে আমার সম্পর্ক একটু জটিল।

ভারতীয় কথনরীতির একটা কল্পনা আমি করে আসছি প্রায় বছর কুড়ি হল। কোনো হীনম্মন্যতা থেকে নয়। আত্মবিশ্বাস থেকে। কোনো ভাষায় শিল্পমর্যাদায় তুঙ্গ গল্প-উপন্যাস লেখা হয় নি—যদি সে ভাষা তার নিজের কথনরীতি খুঁজে বের না করে। আর, এই কথনরীতি প্রবন্ধ লিখে বোঝানো যায় না। ১৯০২ সালে ওড়িয়া ভাষায় ফকির মোহন সেনপতি-র 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা' উপন্যাস, ১৯৩৬-এ হিন্দিতে প্রেমচন্দ-এর 'গোদান', ১৯৫৯-এ মালয়ালমে ভৈকম মোহম্মদ বশীরের 'পাতুম্মার ছাগল', ও এখনো সক্রিয় আমাদের সহকর্মী বিজয়ন দেথা-র রাজস্থানী ভাষায় 'দুবিধা' ও 'উলিমান'—প্রায় একশ বছরের ভারতীয় গল্প উপন্যাসের একটি বহমান সমান্তরাল ধারার প্রমাণ দিতে পারে। অথচ এই ধারা ভারতীয় গল্প উপন্যাসের প্রধান ধারার উপাদান হিশেবে চিহ্নিত হয় নি, অংশত বিভূতিভূষণে ছাড়া। অথচ এই সমান্তরাল ও প্রধান ধারা বলে স্বীকৃত ধারাদুটির সম্মিলন ছাড়া ভারতীয় উপন্যাসের নিজস্ব বাচন তৈরি হতে পারবে না।

প্রেমচন্দের ভিতর আমি সেই প্রাচীন ওস্তাদ ছুতোরের কাজ ছুঁতে চাই, যাঁরা যে-গাছ অন্তত দুশ বছরের পুরনো নয়, তার গায়ে ছেনি বা করাত বসাতেন না।

১৯৯৮

রণজিৎ সিংহ অনূদিত প্রেমচন্দের গল্পসংকলনের ভূমিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনলাইন যোগাযোগের যুগান্তকারী পরিবর্তনে বইয়ের প্রসার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পাঠযজ্ঞে বাংলা বই যেন ব্রাত্য। একদল বাংলা বইপ্রেমী অনলাইন বাংলা বই পঠন-পাঠনে বিপ্লব সাধন করেছে। ২০১২ সালে 'বইয়ের হাট'-এর যাত্রা শুরু। আজ সারা বিশ্বে ১২০,০০০ বইপ্রেমী এর সদস্য। ৬০,০০০-এর বেশি বই অনলাইনে। সেই চমকপ্রদ গল্প শুনুন অন্যতম পরিচালক **এমরান হোসেন রাসেল**-এর কাছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও
বইয়ের হাট

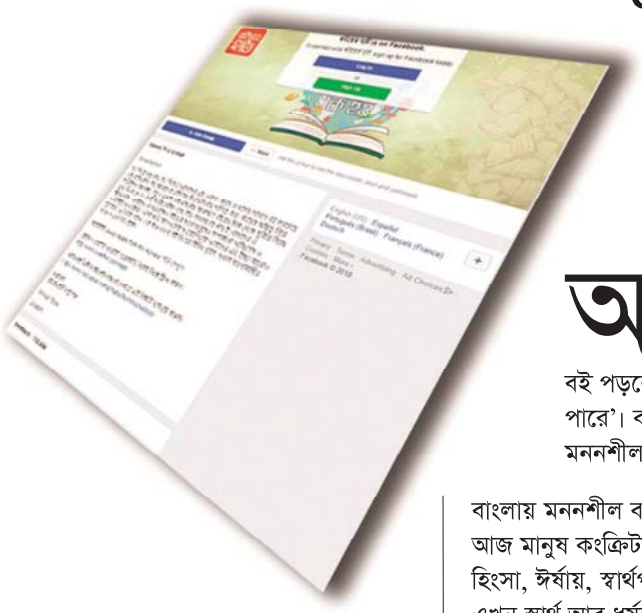

আমরা বলি 'বই পড়লেই মানুষ মননশীল হয়।' বলা উচিৎ 'মননশীল বই পড়লে মানুষ মননশীল হতে পারে'। বইয়ের হাট হলো এমনই মননশীল বইয়ের আধার। শুধুমাত্র বাংলায় মননশীল বইয়ের আধার।

আজ মানুষ কংক্রিটময় পৃথিবীতে যান্ত্রিকতা, হিংসা, ঈর্ষায়, স্বার্থপরতায় কাতর, জীবন-দর্শন এখন স্বার্থ আর ধর্ষণের প্রবৃত্তির কাছে পর্যুদস্ত, সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রীয় আঙিনা পেরিয়ে গ্রাম্য কুটিরে, ধর্মগুলো আত্মোন্নয়নের খোলস ছেড়ে অপরাধের বর্ম। এমন দুঃসময়ে মানুষকে সুস্থভাবে বাঁচতে হলে মননশীল হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই।

যখন রাষ্ট্রনায়কের হীন স্বার্থে ফরমায়েশি অছিয়তনামা হয় ইতিহাস, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে বলা হয় উন্নয়ন, কোমলমতি শিশু-কিশোরদের কলহাস্যমুখর কৈশোর ধর্মীয় উন্মাদনায় বা টিকে থাকার অসম প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হয়, প্রকৃতির উদার উপহার সবুজ বনানি কেটে তৈরী হয় পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ঘরের বাইরে বের হলে ঘরে-ফেরা অনিশ্চিত– তখন মানুষকে মানবিক হতে হলে মননশীল হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই।

সাহিত্য মানুষকে ভেতর থেকে গড়ে তোলে, এটাই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য; মানব মনের ভেতরে প্রণোদনার সৃষ্টি করে। 'সবকিছুর পরেও যে জীবন অমূল্য জিনিস'– এই বোধ জন্মাতে, জন্মানো বোধে শান দিতেই সাহিত্য।

জগতের ছড়িয়ে থাকা ইন্টারনেট-সেবী বাঙালি আর ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা বাংলা বইয়ের মেলবন্ধন বইয়ের হাট। সাহিত্য নিয়েই বইয়ের হাট-এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড; নির্দিষ্ট করে বললে ভিন্ন-ভাষার সাহিত্য বাংলায় অনূদিত এবং বাংলা-সাহিত্যের আধারই বইয়ের হাট। সাহিত্য বুঝতে হলে বিজ্ঞান, অংক, দর্শন, সংগীত, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, পুরাণ, মিথের উপযোগিতা অপরিহার্য, বইয়ের হাট-এ এসব বিষয়ভিত্তিক বইয়ের চর্চা হলেও সাহিত্যই প্রধান। মূলত বই দেওয়া-নেওয়া দিয়ে শুরু হলেও, বইয়ের হাট এখন সাহিত্য-নির্ভর আরও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত।

ফেসবুকে বাংলা-ভাষী সাহিত্যপ্রেমীদের গ্রুপরূপে বইয়ের হাট-এর পথ চলা শুরু। ২০১২ সালের ২৮সেপ্টেম্বর রিটন খানের হাতে বইয়ের হাট ফেসবুক গ্রুপটির সৃষ্টি। গ্রুপ তৈরি হলো বটে কিন্তু তেমন একটা সক্রিয় হলোনা। ২০১৫ সালের জানুয়ারির দিকে আমার সাধারণ সদস্য হিসেবে বইয়ের হাটে যুক্ত হওয়া। তখন মাত্র ১,০০০ কি ১,২০০ সদস্য নিয়ে গ্রুপ, পরিচালকদের মধ্যে রিটন খান ছাড়া তেমন কেউ সক্রিয় ছিলেন বলে মনে করতে পারি না। সম্ভবত ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চের দিকে রিটন খান ছাড়া আগের সব পরিচালক পরিবর্তন হয়ে পল্লব সরকার (ফেসবুকে 'শিশির শুভ্র' নামে পরিচিত)-কে নিয়ে নব কলেবরে পরিচালনা পর্ষদ গঠন হয়। শিশিরকে প্রচুর পরিশ্রম করতে দেখেছি। তার কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয়েছে ছেলেটির সারাদিনের একমাত্র কাজ গ্রুপ চালানো, এর বাইরে অন্য কোন কাজ

এমরান হোসেন (রাসেল) -এর সম্পাদনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভালোবাসা, প্রেম নয়', বেলাল চৌধুরীর 'নিরুদ্দেশ হাওয়ায় হাওয়ায়' বৈদ্যুতিন সংস্করণ ও ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদারের আত্মজীবনী 'প্রকাশিত হয়েছে।

নেই। গ্রুপে সদস্য ক্রমে বাড়তে লাগল। ব্যক্তিগতভাবে ফেসবুক পছন্দ না, কিন্তু এই বইয়ের হাটের নেশায় প্রথম প্রথম দিনে দশ-পনের মিনিটের জন্য এক-আধবার, পরে দিনে দু'তিন ঘন্টা কেটে যেতে লাগল। নতুন নতুন বন্ধু হলো। বইয়ের আদান-প্রদানের সাথে সাথে, বিচিত্র অথচ মনোগ্রাহী সব তথ্যের কারণে অবসর পাওয়া মাত্রই বইয়ের হাট-এ চলে আসি। অনেক নতুন লেখকের লেখার সাথে পরিচিত হতে থাকি; অল্প-সল্প পড়া অনেক লেখককে বিস্তারিত জানতে, তাঁদের লেখা পড়তে বইয়ের হাট সুযোগ করে দিতে থাকে। যেখানে ২০১৫ সনের জানুয়ারীতে প্রতি পোস্টে সদস্যদের সক্রিয়তা অতি নগণ্য, সেখানে ২০১৫ সনের মাঝামাঝি গিয়ে সক্রিয়তা বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট দেখা গেল।

সম্ভবত ২০১৫ সনের আগস্ট মাসে কোন একদিন– তখন গ্রুপে সদস্য সংখ্যা বড়জোর দু'হাজার কি দু'হাজার দু-একশ'; সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি ফেসবুক মেসেঞ্জারে রিটন খানের নোটিফিকেশন: 'আপনাকে বইয়ের হাট গ্রুপে এ্যাডমিন করতে চাই, আপত্তি থাকলে জানান' এবং এর পরের নোটিফিকেশনটাই এ্যাডমিন হয়ে যাওয়ার । ততদিন গ্রুপটাকে বেশ ভালোবেসে ফেলেছি, গ্রুপের বহু বন্ধু-বান্ধবের (ফেসবুক-বন্ধু) সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি–সবই বই সম্পর্কিত নানান বিষয়ে। গ্রুপে ঢুকে দেখলাম আমার মত আরো দু'জন নতুন পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। একজন মলয় দেবনাথ, অন্যজন মালিহা নাজরানা। কীভাবে গ্রুপ চালাতে হয়, সদস্য নির্বাচন কীভাবে করতে হয়, পোস্টগুলো অনুমোদন দেওয়ার ভিত্তিই বা কি – কিছুই জানি না। তখনই যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। সে রাতেই সবার সাথে মেসেঞ্জারে পরিচয় ও আলাপ হলো– ধীরে ধীরে সবকিছুই জানা হয়ে গেল, বলা যায় বইয়ের হাটের আসক্ত হয়ে গেলাম।

অল্পকিছু দিন হলো চার নতুন মুখ বইয়ের হাটের পরিচালক নিযুক্ত হয়েছেন: সুমন বিশ্বাস, নায়লা নাজনীন, মধুমন্তী সাহা আর দিব্যজ্যোতি চক্রবর্তী। আচ্ছা, একটি কথা বলতে ভুলেই গেছি – গ্রুপের সব কর্মকাণ্ডই বাংলা-সাহিত্যকে ভালোবেসে আর স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। গ্রুপ আজ এক লক্ষ বাইশ/তেইশ হাজার বাঙালির প্রাণের স্থান, যেখানে প্রতিদিন গড়ে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার বাঙালি পদচিহ্ন রাখেন; কোন কোন দিন আরো বেশি। এই কর্মযজ্ঞে প্রত্যেক পরিচালক তাঁর দৈনন্দিন জীবন থেকে সময় বের করে হাসিমুখে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে গ্রুপকে সচল রাখতে সহায়তা করে যাচ্ছেন। এই মহতী কর্মকাণ্ডে আরেক জন নিরলস, হাসিমুখ আর প্রাণবন্ত মানুষ আছেন, যিনি পরিচালকমণ্ডলীর বাইরে থেকেও গ্রুপকে সন্তানের মত ভালোবাসেন, তিনি আশফাক স্বপন। তাঁর স্বেচ্ছাশ্রম আর বৌদ্ধিক ভাবনা গ্রুপের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বিস্তারে প্রভূত সাহায্য করেছে।

২০১৬ সাল – গ্রুপে তখনও প্রতিদিন বই আদান-প্রদানই প্রধান আর একমাত্র কাজ। সাধারণ সদস্য থাকা অবস্থায় অনেককেই রোমান হরফে বাংলায় মন্তব্য করতে, পোস্ট করতে দেখেছি। অথচ বইয়ের হাট বাংলা বইপ্রেমী একটি গ্রুপ, যেখানে সবার বাংলা বই নিয়েই যত সব কার্যক্রম সেখানের অবস্থাটি এমন– কেমন যেন খাপছাড়া মনে হয়। সদস্যদের বাংলা বর্ণে লেখার অনুরোধ করা শুরু করলাম; এই কাজে অনেকেই সহমত হলেন, তাঁদের মধ্যে একজন সদস্য– 'বন্দন কুমার বড়ুয়া' অন্য সবার চেয়ে সক্রিয় হয়ে এগিয়ে এলেন। কীভাবে কম্পিউটারে/মোবাইলে বাংলা লিখতে হয় তিনি এমন একটি ডক তৈরি করলেন। শুধু তাই না। তিনি প্রায় পোস্টে গিয়ে বেহায়ার মতো যাঁরাই রোমান হরফে বাংলায় পোস্ট বা মন্তব্য করেন তাদের বাংলা বর্ণে ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা শুরু করে দিলেন, এতে অনেকেই কম্পিউটারে/মোবাইলে বাংলা বর্ণ লেখায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। কাজ হলো বটে– সমস্যা দেখা দিল অন্য জায়গায়; বাংলা টাইপ করা তো শুরু হলো কিন্তু অনেকেই যুক্তবর্ণের ব্যবহার জানেন না বা ভুলে গেছেন। হায়াৎ মামুদ মহাশয়ের বহুল চর্চিত 'বাংলা লেখার নিয়মকানুন' বইটি থেকে যুক্তবর্ণের ব্যবহার, কোন কোন বর্ণ মিলে কোন যুক্তবর্ণ হয় ইত্যাদি গ্রুপে প্রতিদিন একটি করে পোস্ট দিয়ে গেলে অনেকেরই বাংলা টাইপে স্বচ্ছন্দ ও অভ্যস্ত হয়ে পড়েন । একটা সময় এমন দাঁড়াল যে, গ্রুপের সদস্যরা বাংলা ভিন্ন

(ওপরে) কথাসাহিত্যিক ও কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে বইয়ের হাটের পরিচালক রিটন খান। বইয়ের হাটের অন্যান্য পরিচালক (বাঁয়ে, বাঁ থেকে) দিব্যজ্যোতি চক্রবর্তী, সুমন বিশ্বাস; (নিচে, বাঁ থেকে) মধুমন্তী সাহা, এমরান হোসেন রাসেল, পল্লব সরকার ও নায়লা নাজনীন।

আরশাদ সুমন

জর্জিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বইয়ের হাটের সাহিত্য-বিষয়ক ওয়ার্কশপে আলোচনারত ডঃ আজফার হোসেন ও অংশগ্রহণকারীরা। জর্জিয়া টেক-এর বাংলাদেশি ছাত্র সমিতি ওয়ার্কশপ আয়োজনে সহায়তা করে।

আরশাদ সুমন

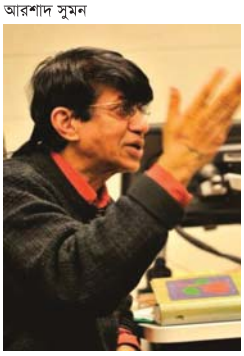

আরশাদ সুমন

আরশাদ সুমন

(ওপরে, বাঁয়ে) কাজী নজরুল ইসলাম-এর ওপর বইয়ের হাটের সাহিত্য ওয়ার্কশপ-এ বক্তৃতারত অধ্যাপক আজফার হোসেন। (ওপরে, ডানে) ওয়ার্কশপে আলোচনারত অংশগ্রহণকারী (বাঁ থেকে:) খালেদ হায়দার, নিশি জাফর, নাহিদ হায়দার ও সৈয়দ নাসিম জাফর। (নিচে) সারাদিনব্যাপী ওয়ার্কশপে মধ্যাহ্ন বিরতির সময় অংশগ্রহণকারীদের সাথে বইয়ের হাটের পরিচালক রিটন খানে (সর্বডানে) এবং অধ্যাপক আজফার হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়)।

অন্য বর্ণ বা হরফে মন্তব্য করা ছেড়ে দিলেন।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য হলো বইয়ের হাট শুধুমাত্র বাংলা বই আদান-প্রদানের ছাড়াও ভিন্ন কিছু করার প্রয়াস পায়।

এতক্ষণ নিজের সম্পৃক্ততার কথাই বললাম; এখন বইয়ের হাটের কিছু কর্মকাণ্ডের কথা বলি। তখনও গ্রুপে বই দেওয়া-নেওয়াই প্রধান কাজ। ২০১৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে একুশে বইমেলায় বইয়ের হাটের কিছু সদস্য নিয়ে পরিচালকদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে একত্র হওয়ার চেষ্টা করি। অনেকেই আসবেন জানালেও, শেষে আগ্রহীদের উপস্থিতির সংখ্যা নগণ্য। তবে যে কয়জন বন্ধু এসেছিলেন প্রাণ খুলে মত বিনিময় হয়েছে; প্রত্যেকের চোখ-মুখে বইয়ের হাটের ভালোবাসার উচ্ছ্বাস ঠিকরে পড়ছিল। মিলনটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঘাসে বসে সামান্য কফি পানে উদ্‌যাপিত হলেও, একটি বার্তা নিয়ে এলো– এখন আমাদের ইন্টারনেটের বায়বীয় জগৎ থেকে বেরিয়ে বাস্তব জগতে কিছু করতে হবে।

এই ভাবনাটি বাস্তবায়ন করতে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ নিতেই প্রায় দেড়-দু'বছর অপেক্ষা করতে হয়। মাঝে আমরা একটি সাহিত্য-মনোভাবাপন্ন সংগঠনের সাথে মিলে কাজ করতে গিয়ে সেখানে সময় ব্যয় করে ফেলি। তবে সেই সময়ে কিছুই যে হয়নি এমন নয়– লেখক স্বত্ব নেই এমন প্রচুর বইয়ের ই-পাব করা হয়েছে; শিশু-কিশোরদের কথা ভেবে 'শিশু -কিশোর ডট অরগ' নামে একটি ওয়েবসাইট করা হয়েছে, সেখানে প্রচুর বাংলা শিশু-সাহিত্যের সাথে ভিন্ন ভাষার শিশু-সাহিত্যের বঙ্গানুবাদও আছে; 'ই-বাংলাসাহিত্য ডট কম' নামে ক্লাসিক বাংলা-সাহিত্যের ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের সুপণ্ডিত অধ্যাপক ড. আজফার হোসেনের বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকার বইয়ের হাট-এর ব্যানারে নেওয়া হয়েছে। ২০১৬ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে সাংবাদিক, প্রবন্ধকার ও কবি জ্যোতির্ময় দত্ত এক বৈঠকী-আলাপে বইয়ের হাটকে ভালোবেসে বলেন – 'কিচ্ছু না জেনে কম্পিউটারে দু'চারটি বোতাম টিপলেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাচলী; রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী; কত অখ্যাত লোকের লেখা; যেসব বই শুধু দূরে থেকে বাঁশি শুনেছি, নাম জেনেছি; তারা এখন আমার ইঙ্গিতে শরীর পাচ্ছেন। এই যুগের সূচনায় আমি যে আছি তাতে সৌভাগ্যবান মনে করি। ...'

আমাদের সফলতার মুকুটে এটি একটি মূল্যবান পালক বলে বইয়ের হাট সশ্রদ্ধচিত্তে মনে করে।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা বইমেলা – বইয়ের হাটের জন্য একটি পয়মন্ত

কাল। ওয়েবজিন 'গল্পপাঠ' সহযোগী 'গুরুচন্ডা৯'-কে নিয়ে নির্বাচিত গল্পসংকলন ১ম ও ২য় খণ্ড বের করে। গল্পসংকলনের ২য় খণ্ডটি বইয়ের হাটের পরিচালকদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। অনলাইনে বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার মতো কাজে অবদান রাখায় বইয়ের হাটকে এই সম্মাননায় ভূষিত করা হয় এবং মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বইয়ের হাটকে আমন্ত্রণ জানান হয়। বইয়ের হাটের পক্ষ থেকে রিটন খান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সাহিত্যিক পরিবার থেকেও বইয়ের হাট সম্মানিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় কবি ও কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় বইয়ের হাটের কর্মকাণ্ড এবং বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসায় মুগ্ধ হন এবং বইয়ের হাটকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশ ব্যতিত অন্যান্য কিছু বইয়ের বৈদ্যুতিন সংস্করণের অনুমতি প্রদান করেন।

২০১৮ সালের ৭ই জানুয়ারি বুদ্ধদেব বসুর কন্যা মিনাক্ষী দত্ত বইয়ের হাটকে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সারির দৈনিক 'আজকাল'-এর মাধ্যমে অভিনন্দন জানান। তিনি বইয়ের হাটের জন্মপূর্ব ইতিহাস সবিস্তারে প্রকাশ করেন, বইয়ের হাটের সংগ্রহকে বিশ্ববিখ্যাত বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সাথে তুলনা করেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতা বিশ্ববাসীর জন্য মূল্যবান ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে উন্মুক্ত করার কাজে নিয়োজিত 'মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ'-এর সাথে প্রথম থেকেই বইয়ের হাট যুক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক বইয়ের সরবরাহ, স্ক্যান করার মতো কঠিন কাজগুলো করে গেছে। তাঁদের বিভিন্ন লেখা, সাক্ষাৎকার এবং মুক্তিযুদ্ধের বইগুলো বইয়ের হাটের সদস্যদের সাথে ভাগাভাগি করে বইয়ের হাট মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে।

এভাবে বইয়ের হাট তার নিজের ছন্দে চলতে থাকল, একসময় দেখলাম অনেক স্বনামধন্য লেখক/কবি/নাট্যকার/প্রাবন্ধিক/অন-লাইন ব্লগার/চলচ্চিত্র পরিচালক/বিভিন্ন সাহিত্য-সংগঠক/ প্রকাশক/প্রচ্ছদ শিল্পীর পদচারণা; এদের অনেকেই গ্রুপে সক্রিয়, অনেকে আবার নিষ্ক্রিয়। সক্রিয়রা মাঝে মাঝে তাঁদের পোস্ট, মতামত দিয়ে আমাদের প্রভূত সমৃদ্ধ করেছেন, আমাদের ভুল-ভ্রান্তি দেখিয়েছেন এবং মানুষের হৃদদ্বারে বাংলা সাহিত্যকে পৌঁছানোর সহজ-সঠিক পথটি বাৎলে দিয়েছেন।

বইয়ের হাট ২০১৮ সালের ২৪শে মার্চে আটলান্টার জর্জিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মের ওপর 'কাজী নজরুল ইসলামের শিল্পসৃষ্টি: বৈচিত্র্য ও আন্তর্জাতিকতা' শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠান করে, সহযোগিতায় ছিল জর্জিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন। সমস্ত দিন প্রাণচঞ্চল কর্মশালার প্রাণপুরুষ ছিলেন মিশিগান লিবারেল স্টাডিজ ও ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডিজের অধ্যাপক ড. আজফার হোসেন। সকাল-বিকেল দু'ভাগে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালাটির উৎকর্ষ-ঠিক রাখতে মোট দশজনের অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। আমেরিকার বিভিন্ন বাংলা পত্র-পত্রিকায় কর্মশালার খবরটি প্রচারিত হয়। সেই বিবেচনায় একে একে কর্মশালার ভিডিও, পাঠ্য-প্রবন্ধ সবার জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে ।

চলছে বইয়ের হাট, দিনরাত ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে ৭ দিন। মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত এই স্থানটি বহু মানুষের বাঁচার প্রেরণা, নিজেকে জানা -বোঝার পীঠস্থান, জ্ঞানার্জনের পাঠশালা, মুক্তালোচনার আনন্দ-নিকেতন।

২০১৮ সনের মার্চ মাসেই পশ্চিমবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিনের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র আতিথেয়তা গ্রহণ করে বইয়ের হাটকে সম্মানিত করেন। দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে তিনি সাহিত্য, ভারত-বিভাজন, দু'বাংলার সাহিত্যিক সম্পর্ক, নিজের লেখা এবং পাঠক সম্পর্কে অনেক কথাই আলোচনা করেন। বইয়ের হাটের লেখক যশোপ্রার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন:

'...উপদেশ দেওয়ার অধিকার তো আমার কিছু নেই, আমার যেটা মনে হয় যে, লেখাটা একটা সাধনার জায়গা। একজন লেখককে নিজেকে তৈরী করতে হয়, প্রচুর পড়তে হয়, বারবার লিখতে হয়। আগে যখন আমরা প্রথম বয়সে একটা লেখা কতবার করে লিখেছি, লিখে প্রত্যাখ্যাত হয়েছি, লেখা ফেরত এসেছে, আবার লিখেছি দাঁতে দাঁত চেঁপে। এই সমস্ত করেই লেখক হয়।'

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বৌঠান কাদম্বরী দেবীর সম্পর্ক নিয়ে বাঙালি সমাজ এবং বাঙালি লেখক সমাজে আগ্রহ সবসময়ই ছিল; এ বিষয়ে বাদ-বিবাদের কোন রকম কমতি ছিল না, এখনও নেই। বইয়ের হাট আলোচ্য বিষয়ে সুমিত্রা দত্তের লেখা পাঠকপ্রিয় বই 'নতুন বৌঠান, রবীন্দ্রজীবন ও মননে' নিয়ে আলোচনার আয়োজন করে। বৈঠকে বইটির লেখক সুমিত্রা দত্তের মেয়ে শুভশ্রী নন্দী (রাই)– রবীন্দ্রনাথ, কাদম্বরী দেবী, উভয়ের সম্পর্ক, এ বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের মনোভাব এবং তাঁর মা অর্থাৎ লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন। বাংলা সাহিত্যের এমন গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় বইয়ের হাট সবসময় এগিয়ে আসতে আগ্রহী । আমাদের এসব আলোচনা আমরা ইন্টারনেটে তুলে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছি, আর অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক সাড়া পাচ্ছি।

বাংলা বইয়ের এই আধারের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রায় ৬০,০০০ (ষাট হাজার)-এর মতো বই আছে, গ্রুপের সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াসে আজ বইয়ের সংগ্রহ এই পরিমাণ। বেশির ভাগ বইয়ের লেখকস্বত্ব বা কপিরাইট আজ আর নেই, সংগ্রহের বিশাল একটি অংশ digital library of india থেকে পাওয়া। গ্রুপের সদস্য এমন অনেক লেখক তাঁর লেখা বই স্বপ্রণোদিত হয়েই গ্রুপে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, এমনও ঘটনা আছে যে, লেখক বাবা/মার বই তাঁর ছেলে-মেয়ে গ্রুপে বিনামূ সবার জন্য পাঠোপযোগী করেছেন। ইন্টারনেটে সহজলভ্য বিভিন্ন জায়গা থেকে বাকি বইগুলোর সংস্থান হয়েছে।

এ নিয়েই চলছে বইয়ের হাট, দিনরাত ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে ৭ দিন। মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত এই স্থানটি বহু মানুষের বাঁচার প্রেরণা, নিজেকে জানা -বোঝার পীঠস্থান, জ্ঞানার্জনের পাঠশালা, মুক্তালোচনার আনন্দ-নিকেতন। মননশীল বই যে মানুষকে মানবিক করে তোলে, তার লক্ষণীয় উদাহরণ আজ বইয়ের হাট। বাঙালির ইতিহাসে এমন মননশীল ক্ষেত্র আরো বহু আগেই প্রয়োজন ছিল, যা বহু দেরিতে হলেও শুরু হয়েছে, শুরু হয়ে এখনও সুস্থ-স্বাভাবিক-ছন্দময় গতিতেই বেগবান রয়েছে। বইয়ের হাটের শুরুটা ইন্টারনেটের বায়বীয় জগতে হলেও, এখন বায়বীয় ও কঠিন বাস্তব উভয়ক্ষেত্রেই সমান গতিতে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। এ সবই সম্ভব হয়েছে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বাংলা-সাহিত্যপ্রেমী বাঙালির ভালোবাসায় আর তাঁদের আস্থায়। আমাদের এমন ক্ষুদ্র প্রয়াস একদিন প্রতিটি বাঙালিকে মননশীলরূপে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবার আগে উচ্চারিত হবে কিনা, সেই উত্তর ভাবীকালের গহ্বরেই থাকল। ■